ফিরাস আল খতিব

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি

ইসলামের হারানো ইতিহাস

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি
ইসলামের হারানো ইতিহাস

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি

ইসলামের হারানো ইতিহাস

ফিরাস আল খতিব

অনুবাদ

আলী আহমাদ মাবরুর

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি

ফিরাস আল খতিব

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

প্রকাশনায়

প্রচ্ছদ প্রকাশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৭৮১-১৭২০২৬, ০১৩১৫-৩৭৩০২৫

prossodprokashon@gmail.com

fb/prossodprokashon

www.prossodprokashon.com

১ম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৯; **২য় মুদ্রণ** : জানুয়ারি, ২০২০;

৩য় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০২১;

পরিমার্জিত ৪র্থ সংস্করণ : মে, ২০২১;

৫ম মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০২১

অনুবাদস্বত্ব : অনুবাদক

সম্পাদনা : ওয়াহিদ জামান, আবু সুফিয়ান

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

একমাত্র পরিবেশক : একাত্তর প্রকাশনী

প্রকাশনা ক্রম : ০২

হার্ডকভার মূল্য : ৩৬০

পেপারব্যাক মূল্য : ২৬০

LOST ISLAMIC HISTORY by Firas Alkhateeb

Translated by Ali Ahmad Mabrur

Published by Prossod Prokashon

ISBN: 978-984-94357-0-9

প্রকাশকের কথা

'মুসলমানরা ইতিহাসবিমুখ জাতি' এ কথাটা আমরা প্রায় সময় শুনে থাকি। কথাটা কতটুকু যথার্থ তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। মূলত উনবিংশ ও বিংশ শতকে ঔপনিবেশিকতার যাঁতাকলে পিষ্ট মুসলিম উম্মাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সবদিক দিয়েই পিছিয়ে পড়ে। সেই পিছিয়ে পড়ার উপসর্গ হিসেবে ইতিহাসবিমুখতাও মুসলিমদের ললাটলিখনে পরিণত হয়। নতুবা পূর্ববর্তীরা ইতিহাসের যে বিশাল ও বিশ্বস্ত উত্তরাধিকার আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তা অনন্য ও অসাধারণ।

ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে কাসির, তাবারি, ইবনে সাদ, ইবনে খালদুনসহ অসংখ্য প্রাচীন ঐতিহাসিক এবং তাদের উত্তরসূরিগণ ইসলামের ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংরক্ষণ করে বিশ্বস্ততার সাথে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করেছেন। তুলনামূলক আলোচনায় গেলে দেখা যাবে, অন্যান্য জাতির ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক ভিত পৌরণিক নানান মিথের ওপর। এমনকি পরবর্তী ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা নির্ণয়েরও কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম অন্যদের নেই। অথচ মুসলিম ইতিহাসের প্রারম্ভিকা থেকেই ইতিহাসচর্চার ভিত্তি বিধিবদ্ধ। ধর্মীয় প্রয়োজনে হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য ধর্মতাত্ত্বিকদের কঠোর নিয়ম-বিধি প্রণয়ন করতে হয়েছে, যেন কোনো মিথ্যা-বানোয়াট কথা হাদিসের সাথে মিশে না যায়। হাদিসচর্চার জন্য প্রণীত এ নীতি প্রভাবিত করেছে ইসলামের ইতিহাসচর্চাকেও। তাই ইসলামের ইতিহাস অন্যান্য জাতির ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশি বিশ্বস্ত ও বিশুদ্ধ। কিন্তু সেই ইতিহাসের উত্তরাধিকার বহন ঔপনিবেশিক যুগে এসে বাধাগ্রস্ত হয়। সামগ্রিকভাবে ইসলামের ইতিহাসচর্চাও এসময় তুলনামূলক পিছিয়ে পড়ে।

তারপরও মুসলিমদের ইতিহাসচর্চা যে একেবারেই থেমে গিয়েছিল তাও কিন্তু নয়। এ সময়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু তার খুব কমই বাংলায় ভাষান্তর হয়েছে। তারচেয়েও বড়ো কথা হলো, বাংলায় রচিত এবং ভিন ভাষা থেকে অনূদিত ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থগুলো তাত্ত্বিক ধরনের, যা গবেষকদের কাজে এলেও সাধারণ পাঠকদের কাছে অনেকক্ষেত্রেই তৃপ্তিদায়ক হয় না। আবার অন্যদিকে সে গ্রন্থগুলো আরবের ইতিহাস বা উপমহাদেশের ইতিহাস অথবা দূরপ্রাচ্যের ইতিহাস ইত্যাদি কোনো একটি খণ্ডচিত্রকে চিত্রিত করে রচিত। গবেষণাগ্রন্থ হওয়ায় বইগুলোর আকারও তুলনামূলক বিস্তৃত।

আমরা ইসলামের ইতিহাসের সামগ্রিক ও অখণ্ড চিত্রের মাঝারি আকারের একটি বই প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। পাশাপাশি বইটি যেন ফিকশন বইয়ের মতো পাঠক একটানে পড়ে ফেলতে পারেন, সেরকম গতিশীল ভাষাশৈলীর হয়– সেদিকও মাথায় ছিল। সবদিক বিবেচনায় ফিরাস আল খতিবের আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত *Lost Islamic History* বইটি আমাদের লক্ষ্যের সাথে মিলে যায়। তাই বইটি বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের কাছে উপস্থাপনের উদ্যোগ নিই।

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি-র ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ইসলামের ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত প্রায় সব জনপদের ইতিহাসের সাথে পাঠকের একটি সামগ্রিক সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে এ বইয়ে। পুরো পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত একটি জাতির প্রায় দেড়হাজার বছরের ইতিহাস মাত্র শ'তিনেক পৃষ্ঠায় খুঁটিনাটিসহ সংকুলান অসম্ভব। এ কারণে লেখক ইতিহাসগ্রন্থের সন-তারিখভিত্তিক বয়ানের গতানুগতিক পদ্ধতি এড়িয়ে ঘটনাপ্রবাহের মূল স্রোতকে স্পর্শ করেছেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ γ-এর জীবন, খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসনকাল, উপমহাদেশের ইতিহাস ইত্যাদি যেসকল অধ্যায় আমাদের কাছে মোটামুটি পরিচিত, সেগুলোর ক্ষেত্রে বইটিকে কিছুটা অপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সময়ের বিবরণ এবং আফ্রিকা, আমেরিকা কিংবা দূরপ্রাচ্যের মুসলমানদের অজানা ইতিহাস পাঠকদের চমৎকৃত করবে।

বইটির আরেকটি অসাধারণ দিক হলো, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের স্পর্শকাতর ও মতবিরোধপূর্ণ বিষয়াদির বর্ণনায় ভারসাম্য। লেখক সেক্ষেত্রে প্রধান মতগুলোকে অল্পকথায় সামনে এনে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন। ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল উদাহরণের পাশাপাশি তুলে এনেছেন বেদনাদায়ক উপাখ্যানও। তাই পাঠক যুগপৎ আনন্দ-বেদনায় সিক্ত হবেন। হীনম্মন্যতা দূরীকরণের পাশাপাশি পাবেন আত্মপর্যালোচনার সুযোগও।

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি (ইসলামের হারানো ইতিহাস) বইয়ের অনুবাদ প্রকাশের সাথে সাথে পাঠকনন্দিত হয়। এবার বইটির ৫ম মুদ্রণ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। আগের মুদ্রণে থেকে যাওয়া ত্রুটিগুলো যথাসাধ্য সংশোধন করা হলো এবারের সংস্করণে। তারপরও কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। তেমন কোনো কিছু পরিলক্ষিত হলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের সবিনয় অনুরোধ রইল পাঠকদের প্রতি। আপনাদের পরামর্শ, সংশোধনী ও দুআ আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের– যিনি আমাকে ইসলামের ইতিহাসের ওপর সাড়া জাগানো গ্রন্থ *Lost Islamic History*-র বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করার তাওফিক দিয়েছেন। এ বইটির কাজ করে আমি খুবই তৃপ্তি পেয়েছি। নিজেও অনেক সমৃদ্ধ হয়েছি। বইটির লেখক ফিরাস আল খতিব কাজটি করতে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। অত্যন্ত স্বার্থকভাবে তিনি বিগত প্রায় দেড় হাজার বছরের ইসলামের ইতিহাসকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

আমি মনে করি, বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের ইতিহাসের বই, বিশেষ করে মুসলিম ইতিহাসের বই বেশি বেশি পড়া দরকার। কেননা, ইতিহাস আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে এবং সাহস দেবে। এর মাধ্যমে সমসাময়িক সংকটগুলোকে আমরা সহজে বুঝতে পারব, নিজেদের করণীয়টাও নির্ধারণ করতে পারব। ইসলাম ও মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পড়ার সবচেয়ে বড়ো উপকারিতা হলো, এই ধরনের সাহিত্য পড়ে আমরা নিজেদের মনের দৈন্যতা আর হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারি। আর সর্বোপরি ইতিহাসপাঠ বর্তমান পরিস্থিতিকে অতীতের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে নতুন করে মূল্যায়ন করার সুযোগও সৃষ্টি করে দেয়।

বইটি নিয়ে কাজ করতে আমার ভালো লেগেছে। আশা করছি, পাঠকরাও পড়ে তৃপ্ত হবেন। কেননা, বইটির ভাষাশৈলী সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল। লেখক জটিল বিষয়গুলোও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। অযাচিতভাবে কোনো বিতর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেননি। *লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি* মুসলিমদের অনেক ইতিবাচক ইতিহাস যেমন স্মরণ করিয়ে দেবে, তেমনি জানাবে অনেক কষ্ট, অপমান আর বঞ্চনার ইতিহাসও। একটি জাতি কীভাবে অগ্রসর হয়, আবার সেখান থেকে কীভাবে পশ্চাদপদতায় পড়ে যায়, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাঠকের সামনে আসবে। জীবন্ত সেই বর্ণনাগুলোর সাথে আজকের চারপাশের ঘটনাবলিকেও পাঠক সংযোগ করতে পারবেন।

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি (ইসলামের হারানো ইতিহাস) সহজ-সরল ইতিহাসের বই হলেও একটি ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য বইটিকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এখানে ইতিহাসের বর্ণনা নিছক গল্প আকারে লিখে যাওয়া হয়নি; বরং ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনার পাশাপাশি লেখক নিজ দায়িত্ববোধ থেকে ঘটনার নির্মোহ পর্যালোচনাও করেছেন। সে পর্যালোচনা সবক্ষেত্রেই পাঠককে মেনে নিতে হবে তা নয়, তবে এ বিষয়টা বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। পাঠক বইটির পাঠে শুধু ইতিহাস জানবেন বা তথ্যগুলো সম্পর্কে অবগত হবেন তা নয়; বরং পাতায় পাতায় পাবেন চিন্তার খোরাকও ।

মূল বইয়ের লেখা অসাধারণ। অনুবাদ কতটা ভালো করতে পেরেছি জানি না; তবে চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের বইকে প্রাণবন্তভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা রীতিমতো একটি চ্যালেঞ্জ। সম্মানিত পাঠকশ্রেণি বইটির পাঠে যদি তৃপ্ত হন, উপকৃত হন– তাহলেই আমার প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে।

আমি প্রচ্ছদ প্রকাশনের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ। পুরো টিমটিকেই আমার কাছে ভালো লেগেছে। সহজ-সরল ও সৎ চিন্তাধারার কিছু মানুষের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা আমার জন্য খুবই তৃপ্তিদায়ক, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা তাদের সামনে চলার পথকে আরও সফল ও সুন্দর করে দিন।

আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও আমার আপনজনদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। সময়ে-অসময়ে তাদের সমর্থন ও প্রেরণা আমাকে অনুবাদ ও লেখালিখির কঠিন কাজটি অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে যাচ্ছে।

আমি সাহিত্য নিয়ে কাজ শুরু করেছি খুব বেশি দিন নয়। এই স্বল্প সময়েই যারা আমাকে চিনেছেন, ভালোবেসেছেন, পাশে থেকেছেন, সমর্থন জুগিয়েছেন, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনারা আমার জন্য দুআ করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল নেক প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করে নিন। আমিন।

আলী আহমাদ মাবরুর
উত্তরা, ঢাকা।

আমার জীবনের সবচে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ
আমার মা মুহতারিমা সানা
আমার স্ত্রী হাদিল এবং
আমার বোন হুদাকে ...

– ফিরাস আল খতিব

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

"যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে পথ চলে,
আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের রাস্তায় পরিচালিত করেন।"

– রাসূল মুহাম্মাদ γ

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা

এ বইটি রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে পাঠককে ধারণা দেওয়া। বিশেষ করে সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলামের পুনর্প্রবর্তনের পর থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তার ইতিহাস একনজরে নিয়ে আসাই হলো এই গ্রন্থ রচনার অন্যতম লক্ষ্য। মুসলিম ইতিহাসের পাতায় পাতায় নানা ঘটনার সন্ধিক্ষণগুলো অনুধাবন করতে হলে জ্ঞানের গভীরতার প্রয়োজন। সব ধরনের পাঠকের জন্য তা সহজ নয়। তাই খুব একটা জটিলতায় না গিয়ে আমার ইচ্ছে হলো, ইসলামের ইতিহাসের ব্যাপারে সাধারণভাবে যে বর্ণনা বা উপাখ্যানগুলো প্রচলিত আছে, সেগুলো পাঠকের সামনে নিয়ে আসা।

খুব বিস্তারিতভাবে যারা বিষয়গুলো জানতে চান কিংবা যারা ইতিহাসের ছাত্র– এ বইটি তাদের জন্য নয়; বরং হালকা জানা-শোনা আছে এমন পাঠকের কাছে পৌঁছানোই আমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সে কারণে আমি চাই, এ বইটিকে যেন কেউ চূড়ান্ত তথ্যভান্ডার হিসেবে বিবেচনা না করেন; বরং বইটি যেন সম্মানিত পাঠকবৃন্দের মনে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করে, নতুন নতুন গবেষণার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করে– সেটাই হবে আমার ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

এটি যেহেতু ইতিহাসের একটি প্রাথমিক গ্রন্থ, তাই বইটিকে তথ্যবহুল গবেষণার পথে যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। এ বইটিতে যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তার বেশিরভাগই অন্যান্য গবেষকদের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল। সেসব গবেষক এবং তাদের সৃষ্টিশীল কাজের নামগুলো কৃতজ্ঞচিত্তে বইটির শেষাংশে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যাতে পাঠক সেগুলো থেকে আরও বেশি উপকৃত হতে পারেন।

আমি ২০১০ সালের শেষ দিকে যখন মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের ইসলামের ইতিহাস পড়ানো আরম্ভ করি, ঠিক তখন থেকে *লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি* নামক এই বই রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে আমার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এতদিন পর্যন্ত মুসলিম সভ্যতার প্রাথমিক

কিছু তথ্যাদির বাইরে আর কিছুই সেভাবে জানত না। তাদের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতা সম্পর্কে এবং ডার্ক এইজ (অন্ধকার যুগ) পরবর্তী রেনেসাঁর মাধ্যমে ইউরোপের জাগরণ প্রসঙ্গে অনেক তথ্য থাকলেও মুসলিম সভ্যতা নিয়ে বলতে গেলে তেমন কিছুই ছিল না। পশ্চিমা সভ্যতার বাইরে অন্যান্য আদি সভ্যতা প্রসঙ্গেও ছিল না তেমন কোনো তথ্য। সেখানে ১৪০০ বছরের বিস্তৃত ইসলামি ইতিহাসের কিছুই উল্লেখ নেই। ইসলামিক হিস্ট্রি বলতে যে অধ্যায় বইগুলোতে ছিল, সেখানে হযরত মুহাম্মাদ γ-এর ওপর অর্ধেক পৃষ্ঠার একটি রচনা আর অটোম্যান শাসনের ওপর আরও অর্ধেক পৃষ্ঠার একটি বিবরণ ছাড়া আর কোনো কিছুই স্থান পায়নি।

ইসলামের ইতিহাসের ওপর আমার ক্লাসগুলো তাই এই বিশাল শূন্যতা পূরণের একটা মোক্ষম সুযোগ হয়ে ওঠে। আমি ছাত্রদের মুসলিম সভ্যতার সেসব সত্য ঘটনাগুলো নিয়ে পাঠদান করতে শুরু করি, যেগুলো ইতিপূর্বে তারা আর কোথাও শোনেনি। শুধু ইউরোপের ইতিহাসকেই এতদিন এ ছাত্রছাত্রীর সামনে বিশ্বের ইতিহাস হিসেবে পরিচিত করানো হয়েছিল। আমি তার বিকল্প হিসেবে মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস এবং বর্তমান সময়ে এসে মানুষের এই উন্নতির পেছনে মুসলিম সভ্যতা ও অন্যান্য সভ্যতার অবদান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, আমি এ প্রচেষ্টায় অভূতপূর্ব সমর্থন ও সাড়া পেয়েছিলাম। আমার ক্লাসগুলোতে যে ছাত্রছাত্রীরা আসত, তাদের অনেকেই ছিল অভিবাসী– যারা বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে এসে আমেরিকায় অভিবাসিত হয়েছে। তারাও আমার লেকচারগুলো শুনে মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসের সাথে নিজেদের একাত্ম করতে পারত। কারণ, তাদের কাছে জন লক কিংবা নেপোলিয়নের চেয়ে আবু হানিফা বা ইউসুফ বিন তাশফিনের নাম অনেক বেশি আপন মনে হতো।

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি নামের এ বইটি মূলত আমার টিচিং নোটগুলোর পরিমার্জিত সমষ্টি। যেহেতু মাধ্যমিক স্কুলে পড়ানোর মতো ইসলামের ইতিহাসের ওপরে লেখা কোনো বই তখনও ছিল না, তাই সে শূন্যতা পূরণের জন্য আমার যে প্রচেষ্টা, তারই পরিণতি হলো এ বইটি। আমার ক্লাসে আসার সুযোগ পাননি কিংবা যারা এরই মধ্যে সেই বয়সটি পার হয়ে এসেছেন, অথচ নিজেদের স্কুলজীবনে পড়ার সময় ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা পাননি, তারাও এ বই থেকে উপকৃত হতে পারবেন– এটা আমার মনের সুপ্ত বাসনা।

২০১০ সালে লেখার কাজ শুরু করি। আর বইটি প্রকাশিত হলো ২০১৪ সালে। এই দীর্ঘ সময়ে আমি নিজের শিকড়কে আরও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেছি, ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছি। তাই ২০১৭ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ করতে এসে ইসলামি চিন্তা ও দর্শনের পথপরিক্রমা বিষয়ে নতুন একটি অধ্যায়ও সংযোজন করেছি।

মুসলিম সভ্যতার একজন ধারক হিসেবে আমি মনে করি– ইসলামের আইন, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অল্প কয়েক পৃষ্ঠায় আলোচনা করা সমীচীন হয়নি। তারপরও আমি সন্তুষ্ট এজন্য যে, প্রথম সংস্করণে এতটুকু আলোচনাও ছিল না। নতুন এই অধ্যায়টুকু সংযোজন করতে পারার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শায়খ আমিন খোলওয়াদিয়া এবং দারুল কাসিমের অন্য সব শিক্ষকের প্রতি, তাদের সহযোগিতা ছাড়া ইসলামের ঐতিহ্যের ব্যাপারে আমার ধারণা পরিষ্কার হতো না।

ফিরাস আল খতিব

প্রথম অধ্যায়

ইসলামপূর্ব আরব

হিজাজের শুষ্ক ও পার্বত্য প্রাকৃতিক অঞ্চলটি পরিবেশগতভাবে ছিল রুক্ষ। সেখানে ছিল না তেমন একটা প্রাণের উচ্ছলতা। আরব উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হিজায নামের এ স্থানটিকে দুটো বিশেষণে সংজ্ঞায়িত করা যায়– শুষ্ক এবং উত্তপ্ত। বিশেষ করে, গ্রীষ্মকালে এখানকার তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়। এখান থেকে যত পূর্বে যাওয়া যায় শুধু বালু আর বালু; কোথাও নেই এতটুকু সবুজ। এমনকি স্থায়ী কোনো অবকাঠামো, বাড়ি-ঘর কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু ভীষণরকম এই শুষ্ক আর রুক্ষ এলাকা থেকে ৭ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে নতুন এক আন্দোলন, নতুন ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূচনা হয়। এমন এক মানুষের জন্ম এখানে হয়, যিনি শুধু আরব উপদ্বীপ নয়, বরং গোটা পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথকে আমূল পালটে দেন।

ভৌগোলিক অবস্থান

আরব উপদ্বীপ এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় বিশ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। বিশাল এই এলাকাটি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিকভাবে এই তিন মহাদেশের সাথেই সংযুক্ত হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও আরবের বাইরের লোকেরা সব সময় একে অগ্রাহ্য করত। সেই আদিকাল থেকে মিশরীয়রা অভিযান চালানোর জন্য আরবের মুরুভূমির তুলনায় বেশি পছন্দ করত উর্বর ক্রিসেন্ট এবং নুবিয়াকে।

আলেকজান্ডার দি গ্রেট প্রায় ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ভারত ও পারস্যে অভিযান চালানোর সময় এই এলাকার পাশ দিয়েই গেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব বিশের দশকে রোমান অধিপতি ইয়েমেনের ভেতর দিয়ে এসে এই অঞ্চলে আগ্রাসন চালান। কিন্তু প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে তিনি এ এলাকার সাথে খাপ খাওয়াতে পারেননি। ফলে আরব উপদ্বীপকে তিনি সাম্রাজ্যের আওতায় নিতে সমর্থ হননি।

তবে আরব উপদ্বীপকে অগ্রাহ্য করার দায় শুধু আরবের বহিরাগতদের ওপরে দিলেও হবে না। এই এলাকার শুষ্ক জলবায়ু মোটেও অতিথিপরায়ণ নয়। যে বেদুইন-যাযাবর গোষ্ঠীর এখানে আজন্ম বসবাস, তারাও ভীষণ কষ্ট করেই জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো। উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কিছু জায়গায় শরৎকালে সামান্য মৌসুমী বৃষ্টিপাত হতো। তবে এতটাই সামান্য যে, উষ্ণ আবহাওয়ায় তা শুকিয়ে যেত নিমিষেই। তা ছাড়া আরবের বিস্তৃত শুষ্ক মরুভূমিতে পড়ত না এ বৃষ্টির কোনো প্রভাব। অন্যদিকে, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় যতটুকু বৃষ্টি হতো তাও উত্তরাঞ্চলীয় মরুভূমিকে ভেজাতে পারত না। ফলে গোটা এলাকা বছরের পুরোটা সময় জুড়ে প্রচণ্ড শুষ্ক ও উত্তপ্ত থেকে যেত। স্থলভূমিতে কিছু নদী আছে বটে, যাকে স্থানীয়ভাবে 'ওয়াদি' বলা হয়, তবে সেগুলোর রূপ বা কাঠামো আদৌ নদীর মতো নয়। মেঘ জমলে বা বৃষ্টি হলে এসব নদীতে সামান্য প্রবাহের সৃষ্টি হতো, যার কারণে মৌসুমী কিছু ফলমূল উৎপাদনে কিছুটা সুবিধা হতো– এর বেশি কিছু নয়। বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলে এ নদীগুলো আবার পরিণত হতো শুকনো পথে। পানির উৎস হিসেবে তখন আর এগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। এর চেয়ে বরং মরূদ্যানগুলো ছিল বেশি কার্যকর। মরুভূমিতে যে ছোটো ছোটো সম্প্রদায়গুলো বসবাস করত বা যে মুসাফিরেরা চলাচল করত, তারা মরূদ্যানের কাছে এসে বিরতি নিত। তাই বলে মরূদ্যানগুলো আবার এতটা অনুকূলও ছিল না যে, তাকে কেন্দ্র করে বড়ো পরিসরে কোনো সমাজ বা সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে।

আরবের অধিবাসী

একটি সভ্যতা মূলত সেই এলাকার পরিবেশকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে; আরব সভ্যতাও এর ব্যতিক্রম নয়। আরবদের জীবনে যা কিছু ছিল, তার ভিত্তিই ছিল রুক্ষ পরিবেশ আর শুষ্ক জলবায়ু। যেহেতু মরুভূমিকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গড়ে ওঠা কঠিন, তাই আরবের মানুষেরা সর্বদা উর্বর জমির সন্ধান করে বেড়াত। আমরা যদি 'আরব' শব্দটি নিয়ে পর্যালোচনা করি এবং এই শব্দের একেবারে শিকড়ের দিকে যাই, তাহলে যে অর্থটি দাঁড়াবে তা হলো– 'যাযাবর'।

তারা গ্রীষ্মকালে মরূদ্যান বা কূপগুলোর আশেপাশে বাস করত, যেন এগুলোর ওপর তারা নির্ভর করতে পারে এবং ন্যূনতম পানির দেখা পেতে পারে। কয়েক মাস গরমের তীব্র উত্তাপ সহ্য করার পর তারা দক্ষিণে, অর্থাৎ ইয়েমেনের দিকে অগ্রসর হতো। ইয়েমেন অঞ্চলে শরতে

বৃষ্টি হতো এবং সেখানকার মাটি তুলনামূলক কিছুটা উর্বরও ছিল। শীতকাল পর্যন্ত আরবরা তাঁবু খাটিয়ে সেখানে অস্থায়ীভাবে বাস করত। শরতের বৃষ্টির পর এলাকা একটু সিক্ত হওয়ায় আরবদের গৃহপালিত মেষ, ভেড়া, দুম্বা বা ছাগলগুলো সেখানে একটু স্বস্তি নিয়ে চলাফেরা করতে পারত। তারপর আবার যখন বৃষ্টিপাত থেমে যেত এবং শুরু হতো প্রচণ্ড গরম, তখন আরবরা পুনরায় মরূদ্যান ও কূপগুলোর কাছে ফিরে আসত। এভাবেই তারা বছরের একেক সময় একেক স্থানে কাটাত। আরবদের কাছে এই যাযাবর জীবন ছিল স্বাভাবিক। কারণ, অনাদিকাল থেকে তারা এভাবেই জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। এখনও আরবের মরুভূমিগুলোতে যে বেদুইনরা বসবাস করছে, তারাও সেই প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারা অনুসরণ করে যাচ্ছে।

ইসলামপূর্ব আরবে অতিথিপরায়ণতা ছিল খুবই অনন্য সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য। যখনই কোনো অতিথি কোনো আরবের গৃহে পৌঁছাত, এর পরবর্তী তিন দিন অতিথিকে সব ধরনের সহযোগিতা ও নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বও ছিল সে আরবের। এমনকি যার ঘরে অতিথি আশ্রয় নিত, সে কখনও অতিথিকে প্রশ্ন করত না যে, তিনি এখানে কেন এসেছেন বা কত দিন থাকবেন। ইসলামি যুগে রাসূল γ এই ঐতিহ্যকে আরও উৎসাহ দেন এবং বলেন, "একজন অতিথির কমপক্ষে তিন দিন মেহমানদারি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।"

মরুভূমি এমন এক স্থান, যেখানে একাকী বসবাস করা যায় না। মরুভূমিতে বসবাসরত আরবদের জন্য এত বেশি হুমকি দৃশ্যমান ছিল যে, ঐকবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বেঁচে থাকা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না। বিশেষত দুর্ভিক্ষ ও গরমের তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য আত্মীয়দের ওপর নির্ভর করাই ছিল প্রথম পছন্দ। পরিবারগুলো একে অপরের সাথে সম্পদ ও আবাসন সুবিধা ভাগাভাগি করে নিত। তখন একাকী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার ধারণা ছিল না বললেই চলে।

তৎকালীন আরব সমাজে পরিবার এবং গোত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতো। পরিবার ও গোত্রগুলো একসাথে বসবাস ও সফর করত, যা 'কবিলা' নামে পরিচিত ছিল। ইসলামপূর্ব দুনিয়ায় গোত্র পরিচয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারলে নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যেত। অন্যথায় এই সুবিধাগুলো পাওয়ার দ্বিতীয় কোনো উপায় ছিল না। যেকোনো গোত্র তাদের স্বগোত্রীয় কাউকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে ফেলত। তাই ইসলামপূর্ব আরবে গোত্রগুলোর মাঝে বিবাদ ও যুদ্ধ ছিল নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা। ভূমির আধিপত্য ও পশুর পাল নিয়ে গোত্রে গোত্রে সংঘাত লেগেই থাকত। অনেক সময় এসব যুদ্ধ ও সংঘাত বছরের পর বছর স্থায়ী হতো। সুতরাং তৎকালীন আরবদের সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হতো– হয় মানুষের বিরুদ্ধে নতুবা প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

এ ধরনের যাযাবর জীবনে কোনো গোত্রের অভ্যন্তরে সৃষ্টিশীল কিছুর প্রকাশ ঘটা ছিল রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার। প্রাচীন মিশরীয় বা গ্রিক সভ্যতায় যে ধরনের ভাস্কর্য বা চিত্রকলার নিদর্শন আমরা দেখি, সেরকম নান্দনিক কিছু সৃষ্টি করার মতো সময় বা সম্পদ কোনোটাই আরবদের ছিল না। তারপরও নান্দনিকতা এবং অনুপম সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের সহজাত যে আকর্ষণ, মরুভূমির শুষ্ক বালুতে তা যে পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছিল এমন নয়; বরং তা ভিন্ন এক রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। আর তা হলো– ভাষাশৈলী।

আরবদের অন্য কোনো স্থাপত্য না থাকলেও এক অনন্য সম্পদ ছিল এবং আছে, আর তা হলো অসাধারণ একটি ভাষা। এতটা শক্তিশালী বা সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি পাওয়া কঠিন। আরবরা শব্দ ও বাক্যকে এত নান্দনিকভাবে ব্যবহার করতে পারত যে, কোনো একটি সাধারণ চিন্তাধারাও অসাধারণ হয়ে উঠত। ধীরে ধীরে কবিতাই হয়ে ওঠে আরব জাতিগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড়ো শিল্পকর্ম। যুদ্ধ বা সংঘাত নিয়ে কিংবা নিজের গোত্রের প্রশংসা করে আরব কবিরা অনায়াসে দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলতে পারত। কবিতা সুন্দর হলে সে কবিতা আর কবির সম্মানে হতো অনেক আনন্দ আয়োজন। দেখা যেত, একটা কবিতা মানোত্তীর্ণ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ব্যস, তা মানুষের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে। হয়তো মূল কবি মারাও গেছেন, কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম সে কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছে। ইসলামপূর্ব আরবে এ ধরনের সাতটি কবিতা ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে, যেগুলো 'মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত। মুয়াল্লাকাত শব্দের অর্থ হলো ঝুলানো। যেহেতু এই কবিতাগুলো কাবার দেওয়ালে বা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে অথবা সদর দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হতো, তাই এগুলোকে মুয়াল্লাকাত হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সাহিত্যে এতটা অগ্রসর হওয়ার পরও আরব সমাজে লেখালিখির প্রচলন তেমন একটা ছিল না। যদিও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আরবে অল্প কিছু লেখার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। আরবরা লেখার চেয়ে মুখস্থ করতেই ছিল বেশি আগ্রহী। তাদের স্মৃতিশক্তিও ছিল প্রখর। একেকজন আরব হাজার দেড় হাজার কবিতা অনায়াসে মুখস্থ রাখতে পারত। যেগুলো তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে একইভাবে শিখিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। ৭ম শতাব্দীতে যখন আরবে ইসলাম আবির্ভূত হলো, তখন সেখানে মুখস্থশক্তির ভিন্ন এক গুরুত্ব ও আবহ সৃষ্টি হয়।

ইসলামপূর্ব আরবের মানুষ বহুখোদা বা একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেই প্রাচীনকালে হযরত ইবরাহিম ν এবং তাঁর সন্তান ইসমাইল ν মিলে এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য মক্কায় কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন। কাবা হলো একটি আয়তকার ঘর, যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন প্রথম মানব আদম ν। আর এই কাবা থেকেই হযরত ইসমাইল ν আরবদের এক আল্লাহর দাওয়াত দিতে শুরু করেন।

কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ইসমাইল ν-এর সেই অমীয় বার্তা বিকৃত হতে শুরু করে। মানুষ আবার এক আল্লাহর ইবাদত থেকে সরে এসে পাথর ও কাঠের মূর্তি বানিয়ে পূজা করতে শুরু করে। এরপর তারা আরও কিছু প্রভু বানিয়ে নেয়। নবি মুহাম্মাদ γ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। তবে এটাও ঠিক, ইবরাহিম ও ইসমাইল ν আরবদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা আরবদের ভেতর থেকে পুরোপুরি কখনও হারিয়ে যায়নি। আরবদের মনে এই দুই নবির ব্যাপারে আলাদা শ্রদ্ধাবোধ ছিল সব সময়ই।

তারা হযরত ইবরাহিম ও ইসমাইল ν-এর প্রভুকে মানত এবং তাকে আরবিতে 'আল্লাহ' বলেই ডাকত। কিন্তু তারা এ-ও মনে করত যে, আল্লাহ ছাড়াও আরও অনেক প্রভু আছে– যাদের উপাসনা করা যায়। সেই প্রভুদের বিভিন্ন মূর্তির আকৃতি দিয়ে তারা পূজা করত। বহু ঈশ্বরবাদী এই চিন্তাধারা ছিল ইবরাহিম ও ইসমাইল ν-এর প্রচারিত আদর্শের পুরোপুরি বিপরীত। ধারণা করা হয়, উত্তরের সুমেরীয় সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে আরবে এই বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মের প্রচলন হয়।

আরব উপদ্বীপে বিচ্ছিন্নভাবে ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের কিছু লোকও বসবাস করত। তাদের সাথে মূলধারার আরবদের ধর্মবিশ্বাসের এতটুকু মিল ছিল যে, তারাও ইবরাহিম ও ইসমাইল ν-কে সম্মান করত। আরবদের মধ্যে যারা তখনও এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করত, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কখনও বহু ঈশ্বরবাদীর সাথে মিলত না। ফলে তারা নিজেদের মতো করে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করত।

আরবের প্রতিবেশী

যদিও তৎকালীন অন্যান্য সভ্যতা থেকে অনেক দূরে মরুভূমির গভীরে আরবদের বসবাস, তারপরও আরবরা কিন্তু কখনও তাদের প্রতিবেশী দেশ বা জাতিগুলোর থেকে খুব একটা বিচ্ছিন্ন ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকেই আরব উপদ্বীপের উত্তরদিকের সীমান্ত ঘেঁষে রোমানরা শক্তিশালী অবস্থায় ছিল। সিরিয়া এলাকায় অনেকগুলো ইহুদি বিদ্রোহকে শক্ত হাতে দমন করার পর গোটা অঞ্চলে রোমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বেদুইন আরবরাও জানত, উত্তরের দিকে খুব অর্থশালী একটি জাতি আছে, যাদের সাথে ব্যাবসা করা যায়। ব্যবসায়ীরা দক্ষিণের ইয়েমেন থেকে উত্তরে সিরিয়ার দিকে সফর করত। ইতালি ও ভারতবর্ষের মতো দূরের দেশ থেকেও আরবে পণ্য আদান-প্রদান হতো। আর রোমানরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন উর্বর জমি নিয়েই ছিল বেশ সন্তুষ্ট। তাই তারা এই ব্যবসায়ীদের চলাচলে বা ব্যাবসায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত না।

আরবের উত্তর-পূর্বে ছিল ইরানীয় মালভূমি। ৩য় শতাব্দীতে সাসানি সভ্যতার যখন উত্থান হয়, তারপর থেকে রোমান আর পারসিয়ানদের মধ্যে শতাব্দীকাল ধরে যুদ্ধ বিরাজমান ছিল। আরবদের ওপরও এই যুদ্ধের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। কারণ, দুই প্রভাবশালী প্রতিবেশী সব সময়ই নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরবদের গোত্রগুলোকে (বিশেষ করে যারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করত) নিজেদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করত। বড়ো দুই পরাশক্তির মধ্যকার এই সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে দুটি ছোটো আরবগোত্রীয় জোট ক্লায়েন্ট স্ট্যাটের ভূমিকা পালন করত। ক্লায়েন্ট স্ট্যাট হলো এমন রাষ্ট্র– যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারচেয়ে বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধীনে থাকে। গাসসান নামক ক্লায়েন্ট স্ট্যাটটি গঠিত হয় বর্তমান জর্ডান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনকে নিয়ে। তারা রোমানদের আজ্ঞাভাজন হয়ে কাজ করত। দ্বিতীয় ক্লায়েন্ট স্ট্যাটটি হলো লাখম– যারা মেসোপটমিয়ার দক্ষিণ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত এবং পারসিয়ানদের সহযোগিতা করত। এই দুই আরব রাষ্ট্র তাদের ছায়া-মনিব রাষ্ট্রের আস্থাভাজন ছিল এবং শত্রুর মোকাবিলায় নিজেদের ভূখণ্ডকে নানা ধরনের অস্ত্র ও সরঞ্জামে ভরে রাখত।

৭ম শতাব্দীর শুরুতে এসে পারসিয়ান ও রোমান দুপক্ষই যেন শতাব্দীকাল ধরে চলে আসা যুদ্ধ-বিগ্রহের সংকটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, গাসসান ও লাখমও এভাবে প্রক্সি হয়ে কাজ করতে আর আগ্রহী ছিল না। আর অন্যান্য আরব গোষ্ঠীও এ দুই পরাশক্তির লড়াই আর ফাঁদে পড়ে নিজেদের জীবনকে দুর্বিষহ করতে চাইছিল না। তারা বরং দুই বড়ো রাজ্যের সাথে যুদ্ধ বা সংঘাতের পথ পরিহার করে ব্যাবসা বাড়িয়ে অর্থনৈতিকভাবে ফায়দা হাসিল করতেই বেশি আগ্রহী ছিল।

আরবের দক্ষিণে ছিল শক্তিশালী আকসুম রাজ্য– যা তখন আবিসিনিয়া এবং বর্তমানে ইথিওপিয়া নামে পরিচিত। আবিসিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের উপরস্থ এই রাজ্যটি বিভিন্ন আফ্রিকান জাতিগোষ্ঠীর বাণিজ্য এবং ভারত মহাসাগরে যাওয়ার পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বাণিজ্য এলাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করায় আকসুম রাজ্যের ব্যাপারে আরব বণিকরা বরাবরই আগ্রহী ছিল। রোমের মতো আকসুমও ছিল খ্রিষ্টান রাজ্য। ইয়েমেনের ভেতর দিয়ে বাণিজ্য যাত্রার পথগুলো যাওয়ায় পারস্য এবং আকসুম উভয়ই এ পথের যাত্রীদের নানাভাবে হয়রানি করত।

৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভিকায় এসে যখন বিশ্বায়নের একটা বাতাস আরবে লাগে, তখন আরবরা আস্তে আস্তে আরব উপদ্বীপের বাইরের বিভিন্ন রাজ্যের ঘটনাবলি জানতে শুরু করে এবং সেগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেহেতু আরব তখন আকসুম, পারস্য আর রোমান সাম্রাজ্যের মাঝখানে, তাই তাদের বিশ্ব রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কৌশল এবং প্রতিপক্ষের চালবাজি সম্পর্কে সচেতন না হয়ে কোনো উপায়ও ছিল না। তবে ভৌগোলিকভাবে এতটা স্পর্শকাতর স্থানে অবস্থান করার পরও আরবরা তাদের চারপাশের বিশাল বিস্তীর্ণ মরুভূমির কারণে ছিল অনেকটাই নিরাপদ।

সেসময় আরবরা নিজেদের জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপের অধিবাসী হিসেবে পরিচয় দিত। কারণ, তারা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দার মতোই জীবনযাপন করত। তবে এই বিচ্ছিন্নতা এক দিক দিয়ে তাদের উপকারই করেছে। আরবের শুষ্ক পরিবেশ আর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আশেপাশের পরাশক্তিরা আরবে কখনও আগ্রাসন চালানোর বা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করার সাহস পায়নি। ফলে সেই আদিকাল থেকে চলে আসা আরবদের জীবনযাপনও কোনো পরাশক্তির রাজনীতি ও যুদ্ধের কারণে প্রভাবিত হয়নি।

এই ধরনের সুরক্ষিত পরিবেশে ৭ম শতাব্দীর শুরুর দিকে এমন একটি আন্দোলনের সূচনা হয়, যা প্রাথমিকভাবে আশেপাশের সাম্রাজ্যগুলোকে এবং পরবর্তী সময়ে গোটা পৃথিবীকেই নাড়িয়ে দেয়। এ আন্দোলন আরবদের ভাগ্যের স্থায়ী পরিবর্তন করে দেয়। আরবরা তাদের ছন্নছাড়া আর যাযাবর জীবনযাপন থেকে এমন একটি জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়, যেখানে তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যকে গড়ে নিতে পারে। আরবের স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি সবকিছু মিলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেখান থেকে ইসলাম একটি অনন্য সাধারণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সেই সাথে মানবেতিহাসের যেকোনো ধর্ম, আন্দোলন কিংবা সাম্রাজ্য বিস্তারের তুলনায় অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী জীবনদর্শনে পরিণত হয়।

ইসলামকে অবলম্বন করেই মরুভূমিতে ডুবে থাকা আরবরা প্বার্শবতী সাম্রাজ্য পারস্য ও রোমান জয় করে। ভিন্ন চিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য মানুষকে একই ছায়াতলে নিয়ে আসে এবং প্রতিষ্ঠা করে বিশাল এক সাম্রাজ্য; যা স্পেন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যেখানে আরবরা ৭ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ মাত্র এক শতক আগেও নিষ্প্রাণ ও প্রভাবহীন একটি জাতি ছিল, সেখানে ৮ম শতাব্দীতে এসে আরব থেকে সভ্যতা ও ক্ষমতার যে উত্থান হয়, তার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। আর এসব সম্ভব হয়েছিল আরবের ভূখণ্ডে একজন মানুষের জন্ম হয়েছিল বলে, যিনি একটি বৈপ্লবিক বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, আরবকে নতুন এক সম্ভাবনার দিগন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দেখিয়েছিলেন মুক্তির দিশা। আর তিনিই হলেন মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ γ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূল γ-এর জীবন

নবি হযরত মুহাম্মাদ γ ৫৭০ সনে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে তাঁর জন্ম হয়। কুরাইশরাই ছিল তখনকার মক্কার নিয়ন্ত্রক। মক্কা ছিল সেসময় গোটা আরবের ব্যাবসা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু। লোহিত সাগর থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে, উত্তর-দক্ষিণ বাণিজ্য রুটের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে মক্কার অবস্থান হওয়ায় উত্তরের রোমান এবং দক্ষিণের ইয়েমেনের সাথে মক্কার মানুষের বেশ ভালো যোগাযোগ ছিল।

যদিও রোমান বা ইয়েমেনের সংস্কৃতি থেকে মক্কা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মক্কার চারপাশে হাজার হাজার কিলোমিটার জুড়ে মরুভূমি থাকায় বিদেশি কোনো পরাশক্তি কখনও এর ওপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেনি। আর সে সুযোগে মক্কা একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ে বেড়ে

ওঠে। বিষয়টা খুবই অদ্ভুত। কেননা, মক্কা একসাথে যেমন আন্তর্জাতিকভাবে অনেক দেশের সাথে যুক্ত ছিল, ঠিক তেমনি এটা অনেকটা বিচ্ছিন্নও ছিল। তবে ধর্মের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, মক্কা ছিল গোটা আরবের মূল আকর্ষণের জায়গা। কারণ, মক্কায় ছিল কাবা; যাকে তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচনা করে গোটা আরব থেকে মানুষজন মক্কায় আসত। তাই মক্কা একদিকে যেমন বাইজেন্টাইন এবং পারস্যের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, আবার একইসাথে তা গোটা আরবের জনমানুষকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করত। আর ইসলাম যখন এখানে পুনরায় আবির্ভূত হয়, তখন এ দুটো বাস্তবতাই স্বাভাবিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে চলে আসে।

প্রাথমিক জীবন

মুহাম্মাদ γ-এর প্রাথমিক জীবন ছিল সংগ্রামমুখর– কষ্টে পরিপূর্ণ। মক্কার উত্তরে ইয়াসরিবে একটি বাণিজ্য যাত্রায় গিয়ে পিতা আবদুল্লাহ তাঁর জন্মের আগেই মারা যান। আর মা আমিনা মারা যান যখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর। এরপর থেকে তিনি দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে লালিত-পালিত হন। দুই বছর পর দাদাও মারা যান। মুহাম্মাদ γ-এর দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব। কুরাইশের মতো সম্ভ্রান্ত একটি বংশে জন্ম নেওয়ার পরও মুহাম্মাদ γ খুব বিত্ত ও স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে বড়ো হননি। তিনি ছিলেন এতিম এবং জন্ম নিয়েছিলেন বনু হাশিমে। কুরাইশদের মধ্যে বনু হাশিমকে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অর্থাৎ তিনি শাসকবংশীয় ছিলেন না। ফলে হযরত মুহাম্মাদ γ কখনও অভিজাত হিসেবে গণ্য হননি। ছোটোবেলা থেকে তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে বেশ কয়েকবার সিরিয়ায় বাণিজ্যযাত্রায় যান এবং আরবদের ঐতিহ্যবাহী যাযাবর জীবনযাত্রার সাথে অভ্যস্ত হন।

ব্যবসায়িক লেনদেনে অত্যন্ত সৎ ও স্বচ্ছ হওয়ায় তিনি খুব অল্প বয়সেই আস সাদিক (সত্যবাদী) এবং আল আমিন (বিশ্বস্ত) হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সে কারণে কুরাইশরাও তাঁকে সম্মান করত এবং তাঁর কাছে আমানত রাখত। মুহাম্মাদ γ-এর বয়স যখন ২০ বছর, তখনই তিনি দক্ষ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পান। তিনি খাদিজা নামে একজন সম্পদশালী বিধবার অধীনে কাজ করতেন। খুব কম সময়ে নিজের সততা ও আমানতদারিতার জন্য তিনি খাদিজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। মুহাম্মাদ γ-এর বয়স যখন ২৫ বছর, তখন খাদিজা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং তিনিও তা গ্রহণ করেন। যদিও বয়সে তিনি খাদিজার তুলনায় ছিলেন বেশ ছোটো।

সেসময় মক্কায় মূর্তি ও বহু ঈশ্বর পূজা প্রচলিত থাকলেও মুহাম্মাদ γ কখনও কুরাইশদের এইসব ধর্মীয় আচারাদিতে অংশ নেননি। তখনও অল্প কিছু আরবদের মনে হযরত ইবরাহিম ও ইসমাইল ν-এর এক আল্লাহর দাসত্বের শিক্ষা জাগরুক ছিল। তারা কুরাইশদের প্রচলিত পাথর বা কাঠের মূর্তিপূজাকে কখনও মানতে পারত না। তাদের বলা হতো হানিফ। মুহাম্মাদ γ ছিলেন তাদেরই একজন।

সমাজের এই বহু ঈশ্বরের অর্চনা বা মূর্তিপূজায় গা না ভাসিয়ে মুহাম্মাদ γ নির্জনতাকে বেছে নেন। তিনি হেরা নামক একটি পাহাড়ের গুহায় ধ্যান করতে বেশি পছন্দ করতেন। পাহাড়টি ছিল মক্কা থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে। সেই গুহার ভেতরে তিনি নীরবে বসে থাকতেন এবং তৎকালীন মক্কার সমাজব্যবস্থা, যাবতীয় অন্যায়-অনাচার ও অগ্রহণযোগ্য ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন।

প্রথম ওহির বার্তা

ইসলামের ইতিহাস অনুযায়ী– ৬১০ সালের কোনো একদিন, মুহাম্মাদ γ অন্য সব দিনের মতো সেদিনও হেরা গুহার ধ্যানরত ছিলেন। সেসময় তার সাথে এমন কিছু ঘটে, যা আগে কখনও ঘটেনি। সে গুহায় একজন ফেরেশতা এলেন এবং বললেন, ‘পড়ুন’। মুহাম্মাদ γ বললেন, ‘আমি তো পড়তে পারি না’। মক্কার আরও অনেকের মতোই তিনিও ছিলেন নিরক্ষর। ফেরেশতা আবারও বললেন, ‘পড়ুন’। মুহাম্মাদ γ আবারও তাঁর অপারগতার কথা জানালেন। তৃতীয় বারও সেই ফেরেশতা বললেন, ‘পড়ুন’। মুহাম্মাদ γ পুনরায় জবাব দিলেন, ‘আমি পড়তে পারি না’। তখন ফেরেশতা আল-কুরআনের সেই আয়াতগুলো পড়ে শোনালেন– যা ওহি হিসেবে আল্লাহর পক্ষ হতে মুহাম্মাদ γ-এর ওপর নাযিল হয়েছিল :

> “পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন,
> যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে।
> পড়ুন সেই পালনকর্তার নামে যিনি পরম দয়ালু,
> যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,
> এমন সব শিক্ষা মানুষকে দিয়েছেন যা সে জানত না।
> *(সূরা আলাক : ১-৫)*

মুহাম্মাদ γ ফেরেশতার সাথে সাথে এই আয়াতগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। ফেরেশতা তখন তাঁর পরিচয় দিলেন, তাঁর নাম জিবরিল। তিনি জানালেন, তাকে সেই আল্লাহ পাঠিয়েছেন, যিনি সারা বিশ্বজগতের মালিক। একই সাথে ফেরেশতা মুহাম্মাদ γ-কে এটাও জানালেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। এই ঘটনার পর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনো রকমে মুহাম্মাদ γ বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর স্ত্রী খাদিজা ι তাকে সান্ত্বনা

দিলেন এবং বোঝালেন, গুহাতে যা ঘটেছে বলে মুহাম্মাদ γ বলছেন, তিনি তার সবই বিশ্বাস করেছেন। খাদিজা ı তখন তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে ঘটনাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন, যিনি খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জানতেন। তিনিও সাথে সাথে ঘটনাটি বিশ্বাস করলেন এবং মুসা ও ঈসা ν-এর মতো মুহাম্মাদ γ-ও যে আল্লাহর একজন নবি, তা মেনে নিলেন। স্ত্রী খাদিজা ı ও ওয়ারাকা বিন নওফেল থেকে এভাবে সান্ত্বনা ও সমর্থন পাওয়ার মাধ্যমে মুহাম্মাদ γ-এর নবুওয়তি মিশনের সূচনা হলো এবং শুরু হলো তাঁর নববি পথচলা।

প্রথম যে মানুষটি মুহাম্মাদ γ-এর নবুওয়াতের কথা জানলেন ও মানলেন এবং সাথে সাথেই ঈমানও আনলেন, তিনি হলেন হযরত খাদিজা ı। খাদিজা ı ঈমান আনার পরই রাসূল γ তাঁর পরিচিত ও নিকটাত্মীয় সকলকে এই পথে আহ্বান করতে শুরু করলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকর, চাচাতো ভাই আলী এবং পালকপুত্র যায়েদ– যারা সবাই তাকে প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করতেন, তারা সকলেই তাৎক্ষণিকভাবে ঈমান আনেন এবং মুহাম্মাদ γ-কে নবি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তারা আবার তাদের কাছের মানুষদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এভাবে ঈমানদারদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

“প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ, যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে। সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে! কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে।” *(সূরা হুমাজাহ : ১-৪)*

প্রথমদিকে এই দাওয়াতি কাজটি হতো গোপনে। মক্কায় তখন বহু ঈশ্বরবাদের প্রচলন, মূল জনগোষ্ঠীর প্রায় সবাই তখন মূর্তিপূজায় ব্যস্ত। সেরকম একটি সমাজে এক আল্লাহর দাওয়াতি কাজ করাটা ছিল নিঃসন্দেহে বিরাট এক হুমকি। এ কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগের বেশ কয়েক বছর, মুসলিমরা গোপনে প্রচার কার্যক্রম চালায়। নতুন এই বিশ্বাসের নাম হলো ইসলাম। আর যারা তা গ্রহণ করেন তাদের বলা হয় মুসলিম। ইসলাম মানে– আল্লাহ ও তাঁর ইচ্ছার নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা।

একদিকে ওহি নাযিল চলমান, অন্যদিকে ইসলামের মৌলিক ধারণাগুলো পাকাপোক্ত হতে শুরু করল এবং তা বিভিন্ন স্থানীয় সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচার করা হচ্ছিল। এক আল্লাহতে বিশ্বাসই ছিল ইসলামের মূলমন্ত্র– যা আরবের তৎকালীন ধর্মবিশ্বাস থেকে ছিল একেবারেই আলাদা। রাসূল মুহাম্মাদ γ প্রচার করেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। আর তার বিপরীতে মক্কার মানুষজন যাদের উপাসনা করে, তারা নিছক পাথরের বা কাঠের মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা কারও উপকার করতে পারে না।

যে ওহি নাযিল হচ্ছিল, সেখানে কিয়ামত দিবস প্রসঙ্গেও অনেক কথা আসছিল, মানুষকে সতর্কও করা হচ্ছিল। ওহিতে বলা হয়, কিয়ামতের পর আসবে শেষ বিচারের দিন, যে দিনে সবাইকে পুনরায় জাগ্রত করা হবে, আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে, যেখানে প্রত্যেককে তাদের কাজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করবে এবং ভালো কাজ করবে, সেদিন তাদের পুরস্কার হিসেবে জান্নাত দেওয়া হবে। আর যারা এমনটা করবে না, তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে– যেখানে তারা অনন্তকাল ধরে যন্ত্রণা সহ্য করবে।

কিন্তু ইসলাম এমন কোনো ধর্ম নয়, যেখানে কেবল মৃত্যুপরবর্তী জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়, তাতে মক্কার বিদ্যমান সব অন্যায়-অবিচারকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়। মক্কায় অর্থনৈতিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে অনেকগুলো সামাজিক অভিজাত শ্রেণির জন্ম হয়েছিল। এই অভিজাত শ্রেণি বিভিন্ন বণিকদলে বিনিয়োগ করত, যাতে ওই বণিকদের ব্যাবসা থেকে আরও অর্থ উপার্জন করতে পারে। অন্যদিকে, দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের জন্য সমাজে কোনো জায়গা ছিল না। আর দারিদ্রের সূচনা হতো একেবারে শুরু থেকেই, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নীচু ও দরিদ্র গোত্রে জন্ম নিত।

কুরআন এ ধরনের সামাজিক বৈষম্যকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং ঘোষণা দেয়, মানুষে মানুষে এ ধরনের ভেদাভেদ সামাজিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থি এবং এগুলোর কারণে পরকালেও শাস্তি পেতে হবে। আরবের সমাজে এই ধরনের বাস্তবতা অনেককাল ধরেই চলে আসছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ γ ইসলাম প্রচার শুরু করার পর প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি শুধু মানুষের ধর্মবিশ্বাস পালটাতে আসেননি; বরং এর পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়েও এসেছেন।

প্রাথমিক যুগের আয়াতগুলোতে এ সকল বিষয়াদির বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল। মক্কায় নাযিল হওয়া আয়াতসমূহের বেশিরভাগ কুরআনের শেষদিকে বিন্যস্ত হয়েছে, সেগুলো আকারে খুব দীর্ঘ নয়, তবে এর বক্তব্য নির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভেদী। ক্রমবর্ধমান মুসলিমদের জন্য এই আয়াতসমষ্টি ছিল খুবই প্রেরণাদায়ক, যদিও প্রকাশ্যে তখনও সেগুলো প্রচার করা হয়নি। যখনই মুসলিমরা কয়েকজন একত্রিত হতেন, তারা সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত নিয়ে আলোচনা করতেন এবং একে অন্যকে শেখাতেন। অন্যদিকে, অবিশ্বাসীদের কাছে তারা ইসলাম গ্রহণ এবং নতুন এই ধর্মের কথা চেপে যেতেন। কারণ, তারা সকলেই জানতেন যে তারা যা বলছেন তা মক্কার বিদ্যমান সমাজকাঠামোর জন্য হুমকি। মক্কার কুরাইশ গোত্র সব ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও গোত্রগত সুবিধাদি ভোগ করত। তাই সমাজে নতুন কোনো বিপ্লব চালুর সম্ভাবনাকে তারা মোটেও ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করেনি।

যদি মুহাম্মাদ γ সমাজে কোনো ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসার কথা না-ও বলতেন, তবুও তিনি যে বিশ্বাসের কথা প্রচার করছিলেন, তা বহু ঈশ্বরবাদীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের জন্য হুমকি ছিল। কাবাঘরের কারণে গোটা আরবের মানুষের কাছে মক্কা ছিল ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দু। বছরে অন্তত একবার আরবের মানুষ মক্কায় আসত এবং সেখানে রাখা মূর্তির উপাসনা করত। আর এই কার্যক্রমকে কেন্দ্র করেই কুরাইশদের বিরাট ব্যাবসা পরিচালিত হতো। তীর্থযাত্রার কারণে ব্যাবসাটা ছিল খুবই রমরমা। কারণ, একই সময় একই স্থানে অনেক স্থানের মানুষ যখন একত্রিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বাজার পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। আর সেরকম একটি প্রেক্ষাপটে মক্কা গোটা আরবের জন্য একই সঙ্গে একটি বিশাল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আর এই ব্যাবসার মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে কুরাইশরা বিপুল পরিমাণ মুনাফা পেত।

প্রকারান্তরে হযরত মুহাম্মাদ γ-এর ধর্মবিশ্বাস ছিল, সকল মূর্তিকে অস্বীকার করে এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা। তার এই বিশ্বাস অনুযায়ী যদি কাবাঘরে মূর্তি না রাখা হয়, তাহলে তো এই কেন্দ্রিক তীর্থযাত্রা এমনকি ব্যাবসাও বন্ধ হয়ে যাবে। আর সে পরিস্থিতি কুরাইশরা কখনও মেনে নিতে পারবে না। হযরত মুহাম্মাদ γ এবং তাঁর সাহাবিরাও এই বাস্তবতা ভালোভাবেই জানতেন। তাই তারা গোত্রপতিদের সামনে প্রাথমিক অবস্থায় নতুন ধর্মের দাওয়াত দেননি। কারণ, মুসলিমদের সংখ্যা ও ক্ষমতা তখনও সেই অবস্থায় পৌঁছেনি যে, তারা প্রকাশ্যে গোত্রগুলোর সাথে কোনো সংঘাতে জড়াতে পারবে। তা ছাড়া শুরুর দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন তৎকালীন প্রচলিত ধারণায় নীচু গোত্রের। ক্রীতদাস আর চাকরেরাই প্রথমদিকে ইসলামের ছায়াতলে আসে। আল্লাহ তায়ালার কাছে সব মানুষই সমান– ইসলামের এই নীতিতে স্বাভাবিকভাবে তারাই আগে আকৃষ্ট হয়। ইসলামের এই সাম্যের নীতি সত্যিই অসাধারণ, যা ঘোষণা করে– কোনো মানুষকে তার সম্পদ বা সামাজিক অবস্থানের বিচারে মূল্যায়ন করা যাবে না।

অত্যাচার ও নিপীড়নের সূচনা

ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, তা আর কুরাইশদের কাছে আড়াল করে রাখা সম্ভব হলো না। প্রথম দিকে মুসলিমরা নির্জন কোনো জায়গায় বা শহরের বাইরের কোনো স্থানে একত্রে তিলাওয়াত ও ইবাদত করত। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের দেখে ফেলার আশঙ্কা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। ঘটলও তা-ই। মুসলিমরা একদিন এভাবে সামষ্টিক ইবাদত করছিল, আর মূর্তিপূজারিদের একটি দল তা দেখেও ফেলল। তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা অবশ্য ততটা ভয়ংকর ছিল না। তারা সে যাত্রায় মুসলিমদের আর তাদের ইবাদতকে উপহাস করেই চলে গেল।

প্রথমদিকে কুরাইশরা বিষয়টিকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। তারা মুসলিমদের কার্যক্রমকে এক ধরনের পরিহাস হিসেবেই বিবেচনা করছিল, যতক্ষণ না তারা বুঝে উঠতে পারছিল, মুসলিমদের এই নতুন ধর্মবিশ্বাস তাদের জন্য কতটা ভয়ংকর হয়ে ওঠতে পারে। এক আল্লাহতে বিশ্বাস, সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের যে বার্তাগুলো মুসলিমরা লালন করছিল, তার প্রতিটাই কুরাইশদের জন্য মারাত্মক ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছিল। তাই কুরাইশদের নেতৃত্ব পর্যায়ের অনেকেই ভেবে নিল, নতুন এই ধর্ম বা সামাজিক আন্দোলন থেকে যদি রেহাই পেতে হয় তাহলে এর মূল নেতা মুহাম্মাদের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে।

আরব্য সমাজে তখন কিছু নিয়মকানুন ও বাধ্যবাধকতা ছিল। মুহাম্মাদ γ এতিম এবং তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বের জিম্মায় ছিলেন। আর আবু তালিব ছিলেন কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা। আবু তালিব নিজে ইসলাম গ্রহণ করেননি, কিন্তু আরব্য সমাজের নৈতিকতা আর দায়িত্ববোধের যতটুকু জ্ঞান তার ছিল, সে আলোকে নিজের ভাতিজার নিরাপত্তা দেওয়াকে তিনি কর্তব্য বলেই মনে করতেন। আর শতাব্দী ধরে চলে আসা আরবীয় সামাজিক রীতিতে এটা সিদ্ধ ছিল যে, মুহাম্মাদ γ-কে যদি হত্যা করা হয়, তাহলে তাঁর গোত্র সে খুনিকে বের করে তাকে হত্যা করতে পারবে বা যুদ্ধ ঘোষণাও করতে পারবে। আর তেমনটা হলে মক্কায় গৃহযুদ্ধ লেগে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। তাই মুহাম্মাদ γ-এর ক্ষতি করাটা খুব সহজ ছিল না। তবে তিনি যে নিরাপত্তার সুযোগটা পেতেন, তার অনুসারীদের অনেকেই কিন্তু সেটা পেতেন না।

মুসলিম হয়েছে এমন অনেকেরই বলার মতো কোনো গোত্র-পরিচয় ছিল না। তাই গোত্রের কাছ থেকে যে নিরাপত্তা গোত্র সদস্যরা পায়, তাদের তা পাওয়ার অবস্থাও ছিল না। এই ঘাটতির সুযোগ নিয়ে কুরাইশরা তাদের হুমকি দেওয়া এবং তাদের ওপর নিপীড়ন চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের ধারণা ছিল, যদি এই মানুষগুলোর ওপর ভালোভাবে নির্যাতন চালানো যায়, তাহলে হয়তো নতুন করে আর কেউ ইসলাম গ্রহণের সাহস করবে না। তারপর মুসলিমদের হয়রানি করা শুরু হলো। তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। অন্যদিকে, ব্যক্তিগতভাবে হযরত মুহাম্মাদ γ কিছুটা নিরাপত্তা সুবিধা পেলেও তাঁর হাতে তখন এমন কোনো ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি তার অনুসারীদের এসব হয়রানি থেকে রক্ষা করবেন।

মক্কার বাইরে যেন নতুন এই ধর্মের বার্তা না ছড়ায়, কুরাইশরা সেটা নিশ্চিত করতে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করল। মুসলিমদের একটি দল নির্যাতনের মুখে আবিসিনিয়ায় চলে গেল, যাকে ইসলামের পরিভাষায় 'হিজরত' বলা হয়। তখন আবিসিনিয়ার রাজা ছিলেন একজন

খ্রিষ্টান। তিনি মুসলিমদের আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই খবর পেয়ে কুরাইশরাও তাদের প্রতিনিধিদের আবিসিনিয়াতে পাঠাল। কুরাইশদের উদ্দেশ্য ছিল, তাদের প্রতিনিধি আবিসিনিয়ার রাজাকে প্রভাবিত করবে এবং তাতে তিনি মুসলিমদের আশ্রয় না দিয়ে মক্কায় ফেরত পাঠাবে; আর কুরাইশরা আবার তাদের ওপর নির্যাতন শুরু করবে। কিন্তু যখন আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান রাজা নাজ্জাশি হযরত মুহাম্মাদ γ-এর চাচাতো ভাই ও ঘনিষ্ঠ সাহাবি জাফর η-এর কাছ থেকে কুরআনের সেই আয়াতগুলো শুনলেন, যেখানে খ্রিষ্টানদের যিশুখ্রিষ্ট অর্থাৎ মুসলিমদের ঈসা নবি ও তাঁর মা মারইয়ামকে নিয়ে বলা হয়েছে। তিনি মুসলিমদের প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং তাদের ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন। তাই কুরাইশ প্রতিনিধি দলকে খালি হাতে ফিরতে হলো।

অন্যদিকে, মুসলিমরা যদিও দূরবর্তী কোনো দেশে যেতে বা পালিয়ে আশ্রয় নেওয়ার তেমন একটা সুযোগ পাচ্ছিল না, তারপরও মক্কার বাইরে ইসলামের ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। প্রতি বছর আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ তীর্থযাত্রায় মক্কায় আসত। যদি তারা কেউ মুহাম্মাদ γ-এর অমিয় বাণী শুনে ফেলে আর দেখে যে কুরাইশরা কীভাবে এর প্রসার ও বিস্তৃতি বন্ধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তাহলে গোটা আরবে কুরাইশদের যে ভাবমূর্তি তা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হবে। আবার এভাবেও বলা যায়, এসব বহিরাগতরা যদি মুহাম্মাদ γ-এর কথা ও দাওয়াতে বিশ্বাস করে তাকে নবি হিসেবে মেনে নেয় এবং নিজেদের এলাকায় ফিরে যায়, তাহলে মক্কার বাইরেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে এবং কুরাইশরা তা প্রতিহত করতে পারবে না।

এ সকল বাস্তবতা কুরাইশদের চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করল। ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ রাসূল γ-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির ৭ বছরের মাথায় কুরাইশরা বনু হাশিম গোত্রকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ, মুসলিমদের বিরাট অংশই ছিল এই গোত্রের। বয়কটের ফলে বনু হাশিম গোত্রের সদস্যদের সাথে সব ধরনের লেনদেন ও বিয়ে-শাদি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। অধিকন্তু তাদের মক্কার বাইরে নির্জন এক উপত্যকায় নির্বাসনে পাঠানো হলো। ফলে মুসলিমরা মারাত্মক ধরনের মানবিক সংকটে পড়ে যায়। তাদের ক্ষুধা, সামাজিক বয়কট এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়। এমনকি আবু তালিবসহ বনু হাশিম গোত্রের যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির শিকার হলো। বনু হাশিম গোত্রের বাইরে যে গুটিকয়েক প্রভাবশালী মুসলিম ছিলেন যেমন আবু বকর, উমর, উসমান η− তারা তাদের সর্বাত্মক সামর্থ্য দিয়ে মুসলিমদের সাহায্য করার চেষ্টা করলেন, বয়কটের বিধানগুলোকে শিথিল করার চেষ্টা করলেন।

ধীরে ধীরে বয়কটের প্রভাব গোটা আরব সমাজেই পড়তে লাগল। দেখা গেল শুধু বনু হাশিম নয়, অন্যান্য গোত্রগুলোও এই বয়কটে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তা ছাড়া মুহাম্মাদ γ-কে দাওয়াতি কাজ থেকে বিরত রাখার এত সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনো না কোনোভাবে তা চলছিলই। তাই বাধ্য হয়েই বছর তিনেক পর এই দুর্বিষহ পরিস্থিতির অবসান ঘটানো হলো। কুরাইশদের এতসব প্রতিবন্ধকতার পরও দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে।

বয়কটের ফলে বরং দুটো প্রতিক্রিয়া ঘটল। এ বয়কট তরুণ ও যুবক মুসলিমদের মানসিক দৃঢ়তাকে আরও বাড়িয়ে দিলো। আর অন্যদিকে বনু হাশিম গোত্রের একতা আরও বৃদ্ধি পেল। তাই এই গোত্রের যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারা তাদের স্বগোত্রীয় ভাইদের কষ্ট দেখে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলো এবং অকুণ্ঠচিত্তে নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে মজলুম মানুষগুলোর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলো। ফলে ইসলামের প্রতি অনুগত থাকার যে ধারণা, সেটা তো প্রতিষ্ঠিত হলোই; তার পাশাপাশি গোত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি নতুন করে প্রমাণিত হলো।

বয়কটের অন্য কোনো প্রভাব যে পড়েনি তা নয়। বছরের পর বছর খাদ্যাভাবে এবং আবাসহীন থাকতে থাকতে মুসলিমরা শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হয়তো এই নিপীড়নের প্রভাবেই রাসূল γ-এর স্ত্রী খাদিজা ι ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম মানুষ এবং কুরাইশদের সকল নিপীড়ন-নির্যাতনের মুখে রাসূল γ-এর সব সময় পাশে থাকা মহিয়সী ব্যক্তিত্ব। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি রাসূল γ-কে মানসিক যে সমর্থন দিয়ে গেছেন, তা সেসময় সকল প্রতিকূলতার মাঝে টিকে থাকতে রাসূল γ-এর জন্য অপরিহার্য ছিল। তাঁর চলে যাওয়া ছিল নবিজি γ-এর অপূরণীয় এক ক্ষতি। খাদিজা ι-এর মৃত্যুর কিছুদিন পর রাসূল γ-এর চাচা আবু তালিবও মারা যান। আবু তালিবই এত দিন নবিজি γ-কে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবু তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, শত অত্যাচারের মুখেও তার ভাতিজা মুহাম্মাদ γ এবং বনু হাশিমের অন্যান্য মুসলিমদের সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন। তার মৃত্যুতে রাসূল γ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যও এই মৃত্যু নিঃসন্দেহে বিরাট এক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উল্লেখযোগ্য আর কোনো গোত্রপ্রধান পাশে না থাকায় মুহাম্মাদ γ এবং তাঁর সাথিরা ভীষণ রকম নিরাপত্তাহীনতায় পড়েন। আর এই সুযোগে কুরাইশ নেতারাও মুসলিমদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যদিও নবিজি কখনও নিজের জন্মভূমিকে ছেড়ে যেতে চাননি, মক্কার

প্রতি তাঁর ভালোবাসাও ছিল অফুরান। তবুও পরিস্থিতির কারণে তিনি অন্য কোনো নিরাপদ শহর খুঁজতে শুরু করেন– যেখানে তাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা হবে কিংবা যেখানে তিনি একটু স্বস্তির সাথে দ্বীন প্রচারের কাজ করতে পারবেন।

তাঁর পছন্দের প্রথম বিকল্প স্থান ছিল তায়েফ– যা সাকিফ নামক গোত্র নিয়ন্ত্রণ করত। তায়েফ ছিল মক্কা থেকে ৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে। তায়েফে গিয়ে নবিজি γ সেখানকার কর্তৃত্বপরায়ণ তিন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা নবিজিকে ফিরিয়ে দেয় এবং নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করে। অধিকন্তু তিনি যখন মক্কায় ফেরার পথে রওনা হলেন, তখন তারা নবিজির ওপর আক্রমণ করতে একটি গ্রুপকে লেলিয়ে দেয়; তারা তাকে পাথর মারে এবং জঘন্যভাবে গালমন্দ করে। তাদের পাথরের আঘাতে রাসূল সা. রক্তাক্ত হয়ে পড়েন।

ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তাঁর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে ফেরেশতা জিবরাইল ν নবিজির কাছে অনুমতি চান, যেহেতু তায়েফের লোকেরা রাসূল γ-কে আঘাত করেছে, তাই তিনি চাইলে তায়েফের দুই প্রান্তের পাহাড়কে এক করে গোটা শহরকে পিষ্ট করে দেওয়া হবে। কিন্তু নবি γ জিবরাইলকে তা করতে সম্মতি দেননি। বরং তিনি আশা প্রকাশ করেন, নিশ্চয়ই তায়েফের পরবর্তী প্রজন্ম ইসলামের ছায়াতলে আসবে। পরবর্তীতে ভারতীয় মুসলিমরা নবিজির এই আচরণের আধ্যাত্মিক প্রভাবে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

পরিবার ও প্রতিবেশী গোত্রসমূহ কারও কাছ থেকে সমর্থন না পেয়ে এবং সাহাবিদের ওপর দিনের পর দিন অবর্ণনীয় অত্যাচার দেখতে দেখতে রাসূল γ একসময় উপলব্ধি করলেন, ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর তখনই এরকম একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ চলে এলো, মক্কা থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উত্তরের শহর ইয়াসরিব থেকে। ইয়াসরিবে সেসময় নেতৃস্থানীয় দুই গোত্র ছিল আওস ও খাযরাজ। এই দুই গোত্র নানা বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই দ্বন্দ্ব ও ফ্যাসাদে লিপ্ত ছিল। তা ৬১০-এর দশকে এসে মারাত্মক আকার ধারণ করে। তাদের এই সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল ইয়াসরিবে বসবাসরত ইহুদিরা। ইয়াসরিবে এরই মধ্যে একজন আমানতদার ও সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে নবিজি γ-এর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

৬২০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াসরিবের বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি মক্কায় এসে রাসূল γ-এর সাথে দেখা করেন এবং তাকে ইয়াসরিবে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। নবিজি γ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সঙ্গীদেরও হিজরতের পরামর্শ দেন। কারণ, তাঁরা সেখানে অন্তত কুরাইশদের নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে ইয়াসরিবে হিজরত করেন। আর সবার পরে রাসূল γ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকর η-কে সাথে নিয়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কুরাইশরা খবর পেয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তিনি সেই ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে হেফাজত করে হিজরত সম্পন্ন করতে সক্ষম হন।

রাসূল γ ইয়াসরিবে (যা পরবর্তী সময়ে মদিনা মুনাওয়ারাহ তথা মদিনা হিসেবে পরিচিত হয়) কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তার দেখা পান এবং কুরাইশদের নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে যথাযথভাবে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ পান।

মদিনা

রাসূল γ-এর মক্কা ছেড়ে মদিনায় যাওয়ার এই ঘটনাকে বলা হয় হিজরত। ইসলামের ইতিহাসে হিজরত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হিজরতের দিন থেকেই ইসলামিক ক্যালেন্ডারের দিন গণনা শুরু হয়। হিজরতের পর থেকে ইসলাম আর কোনো একঘরে সম্প্রদায় বা মুহাম্মাদ γ নিজেও আর সামাজিক সংকট হিসেবে বিবেচিত হননি।

এরপর মুসলিমরা মদিনাকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার এবং রাসূল γ-কে সেই রাষ্ট্রের প্রধান বানানোর জন্য কাজ শুরু করে। মদিনার ১০ বছরে রাসূল γ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা শত শত বছর পরে এসে আজও মুসলিম নীতিমালা, সামাজিক আইন-কানুন এবং অর্থনৈতিক বিধি-বিধান প্রণয়নে প্রভাব রেখে যাচ্ছে।

তবে মদিনার জীবন যে চ্যালেঞ্জ মুক্ত ছিল তা কিন্তু নয়। এর মধ্যে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সমন্বয়। মুহাজির হলেন তারাই, যারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছেন। আর আনসার হলেন মদিনার স্থানীয় লোকজন। মুহাজিররা নির্দিষ্ট বা একক কোনো গোত্রের সদস্য ছিলেন না। কারণ, মক্কার কোনো গোত্রই সম্পূর্ণ এককভাবে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাই মুহাজিররা ছিলেন বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের সমষ্টি। অন্যদিকে, আনসারদের অধিকাংশই ছিলেন হয় আওস না হয় খাযরাজ গোত্রের। তারা আগে থেকেই মদিনায় প্রভাবশালী ছিলেন এবং তাদের নিজেদের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্ব-সংঘাতও বিদ্যমান ছিল।

আবার এমনও কিছু মানুষ সেই সমাজে ছিল, যারা এসব কোনো গোত্রেরই সদস্য নয়। তারা এসেছিল আফ্রিকা, পারস্য কিংবা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থেকে। তারা যে আচার-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিল সেগুলো নিয়ে অনেক মুসলিমদের আপত্তি ছিল। রাসূল γ অবশ্য শুরুতেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, ইসলাম আসার পর ইতিপূর্বে চালু থাকা গোত্র বা জাতিগোষ্ঠীর প্রতি অনুগত থাকার সকল ধারণাই বাতিল হয়ে যাবে; বরং সকলকে এখন থেকে এক উম্মাহর ধারণায় আস্থা রাখতে হবে।

রাসূল γ বলতেন, কোন মুসলিম কোন গোত্র থেকে এসেছে বা কে কুরাইশ অথবা কে আউস, কে খাযরাজ বা কে ইহুদি, তা এখন আর বিবেচনাধীন নয়। বরং যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন তাদের পরিচয় হবে একটাই, তা হলো মুসলিম। আর এই পরিচয়ের ওপরই ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। পূর্বের বংশ পরিচয় এখানে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

মদিনায় মুহাম্মাদ γ নতুন যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধি-বিধান প্রণয়ন করলেন, তা ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই সনদে বলা হয়, মুহাম্মাদ γ-এর অধীনে মদিনা ইসলামি আইনের ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে। গোটা উম্মাহ একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর মুহাম্মাদ γ হবেন মদিনার অধিপতি। এর আগে আরবে অন্যায্য পদ্ধতিতে যেভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার রীতি জারি ছিল, তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে এবং সে স্থলে ইসলামের আলোকে ন্যায্য প্রক্রিয়া চালু হবে।

ইহুদিরা এক ধরনের বিশ্বাস লালন করে। তাদের কাছে তাদের ধর্ম আর মুসলিমদের কাছে তাদের ধর্ম হেফাজতে থাকবে। এই নীতিমালা সবার জন্য একইভাবে প্রযোজ্য থাকবে। কিন্তু কেউ যদি অপরাধ করে কিংবা বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়, তাহলে সে তার নিজের জন্য এবং পরিবারের জন্য ক্ষতি ডেকে আনবে। −মদিনা সনদের ধারা

এই সনদে মদিনার ইহুদিদের তাদের ধর্মপালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তবে এই শর্তে যে, হযরত মুহাম্মাদ γ-কে মদিনার নেতা হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং কুরাইশ বা অন্য কোনো শত্রু মদিনায় আক্রমণ করলে, তাদেরও মুসলিমদের সাথে মিলে মদিনাকে রক্ষা করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মদিনায় রাসূল γ রাজনৈতিক যে স্বতন্ত্র মডেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আজ অবধি সকল মুসলিম সরকারের কাছে মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে মদিনা রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যেভাবে সম্মান ও নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে, তার দ্বিতীয় কোনো নজির বিশ্বের ইতিহাসে আজ অবধি দেখা যায় না।

মদিনায় মুসলিম সম্প্রদায় যেমন ক্রমাগত বড়ো ও শক্তিশালী হচ্ছিল, সেই আলোকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির ধরনও বিবর্তিত হচ্ছিল। মদিনায় নাযিল হওয়া আয়াতগুলোর আকার ছিল মাক্কি আয়াতের তুলনায় দীর্ঘ। আয়াতের বিষয়বস্তুতেও ভিন্নতা ছিল। এই আয়াতগুলোতে ইবাদতের বিশদ ধরন উপস্থাপিত হয়। পাশাপাশি কর বিধান, উত্তরাধিকার এবং মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। একটি মুসলিম সমাজ কীভাবে পরিচালিত হবে− মদিনার সূরাগুলোতে সেই প্রসঙ্গে বেশি নির্দেশনা পাওয়া যায়। কুরআনে সব ইস্যুই বিস্তারিত আসত, তারপরও কোথাও যদি আরও বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিত, তখন রাসূল γ নিজেই সে বিষয়ে আলোচনা করতেন। হযরত মুহাম্মাদ γ যে কথাগুলো বলেছেন বা কাজগুলো করেছেন তা 'হাদিস' নামে পরিচিত। হাদিস ইসলামি শরিয়ত ও আইনের অন্যতম উৎস।

আল্লাহর বাণী তথা আল কুরআনের পরই শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে এই হাদিস বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু এমনও নয় যে, শুধু আইন আর সামাজিক বিধান নিয়ে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হতো। মদিনায় এমন অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়, যেখানে পূর্ববতী নবিদের বিশেষ করে হযরত নূহ, ইবরাহিম, মুসা, দাউদ ও ঈসা ν-এর নানা কাহিনি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এই আলোচনার মাধ্যমে সকলের কাছে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ γ হলেন শেষ নবি আর তাঁর প্রচারিত বাণী পূর্ববর্তী অন্যান্য নবিগণের বার্তারই প্রতিধ্বনি। তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছেন, তা একেবারে নতুন কিছু নয়।

পূর্ববর্তী নবি-রাসূলদের ঘটনা সম্বলিত আয়াতের অনেকগুলোই নাযিল হয় মদিনায় বসবাসরত ইহুদিদের উদ্দেশ্য করে। বাহ্যিকভাবে তাদের চিন্তাধারার সাথে মুসলিমদের অনেক মিল ছিল। উভয় সম্প্রদায়ই ছিল একেশ্বরবাদী। তারা একই ব্যক্তিদের নবি হিসেবে মানে। আর মুহাম্মাদ γ-এর মাদানি জীবনের প্রথম দিনগুলোতে উভয় সম্প্রদায় একই কেবলা জেরুসালেমের দিকে মুখ করে ইবাদত করত। এসব সাদৃশ্য দেখে মদিনার অনেক ইহুদিও ইসলাম গ্রহণ করে।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে মেসিয়াহ নামক এক ব্যক্তির কথা আগে থেকেই বলা ছিল। যে ইহুদিরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের কাছে মুহাম্মাদ γ সেই প্রত্যাশিত মেসিয়াহ। কিন্তু এর বাইরে আরও অনেক ইহুদি ছিল, যারা মুহাম্মাদ γ-কে কখনও মেনে নেয়নি। ইহুদিদের ধর্মবিশ্বাস এমন যে, তারা শুধু নিজেদেরকেই স্রষ্টার বাছাইকৃত জনগোষ্ঠী হিসেবে মনে করে। তাই মুহাম্মাদ γ 'সকল মানুষ সমান' তথা সাম্য ও সমতার যে বার্তা প্রচার করছিলেন, তা ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গির পুরোপুরি বিপরীত। যদিও কেউ কেউ মুহাম্মাদ γ-কে নবি হিসেবে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু তিনি হিব্রুভাষী না হওয়ায় কট্টরপন্থি ইহুদিরা তাকে সহজভাবে কখনও গ্রহণ করতে পারেনি। ইহুদিদের নিজেদের স্রষ্টার পছন্দসই গোষ্ঠী বিবেচনা করা আর ইসলামের সাম্যের বার্তা সার্বিকভাবে ইহুদি ও মুসলিমদের মধ্যে স্থায়ী উত্তেজনা ও বিভাজন তৈরি করে দেয়।

যুদ্ধ

হযরত মুহাম্মাদ γ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পরও কুরাইশদের শত্রুতার অবসান হয়ে যায়নি। মুহাজিররা তখনও কুরাইশদের অত্যাচারের ঘা সহ্য করে যাচ্ছিলেন, আর আনসাররা সেই কুরাইশদের শায়েস্তা করার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন; কেননা, তারা তাদেরই দ্বীনি ভাই মুহাজিরদের এতটা কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল γ তখনও পর্যন্ত মুসলিমদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেননি। আরবের মাটিতে যুদ্ধ মানেই অনেক বড়ো কিছু, অনেক ক্ষয়-ক্ষতি। কারণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে সেখানে প্রতিশোধ আর রক্তের হোলি খেলার ঐতিহ্য জারি ছিল। অন্যদিকে, কুরআন সব সময়ই মানুষের জীবনকে হেফাজত করার কথা বলে, অন্যায্যতা থেকে দূরে থাকার তাগিদ দেয়। তাই মুসলিমরা কুরাইশদের সাথে সামরিক অভিযান করার ব্যাপারে সব সময়ই দ্বিধায় ছিল। যদিও এই কুরাইশরা তাদের ওপর বছরের পর বছর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে।

কিন্তু মদিনায় আসার কিছুদিন পরই পরিস্থিতি পালটে যায়। রাসূল γ সকলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া নতুন আয়াতটি শুনিয়ে দেন। যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> "কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাদের অনুমতি দেওয়া হলো; কেননা, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম, যাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে– আমাদের রব আল্লাহ।" *(সূরা হজ : ৩৯-৪০)*

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলিমরা বুঝতে পারে, যুদ্ধকে শুধু অনুমোদনই করা হয়নি; বরং মুসলিমরা যখন নির্যাতিত হয়, তখন যুদ্ধকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। তারা এটাও বুঝতে পারে যে, ইসলাম কেবল কয়েকটি বিশ্বাসের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানও। ইসলামে জীবনের সকল দিক বিশেষ করে ধর্মীয় আচারাদি থেকে শুরু করে বৈদেশিক সম্পর্ক এবং ধর্মতত্ত্বসহ সব ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মুসলিমরা ইতিপূর্বে আসা অন্য সকল কুরআনিক নির্দেশনা মানার ব্যাপারে যেমনটা তৎপর ছিল, ঠিক তেমনি যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশনার ব্যাপারেও তৎপর হয়ে উঠল এবং এ আদেশ পালন করার মতো সুযোগের জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করতে লাগল।

অবশেষে সেই সুযোগটি হলো ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে, যখন মুসলিমরা প্রায় ৩০০ জন সদস্যের একটি ছোটো বাহিনী তৈরি করল। এর মধ্যে কুরাইশদের একটি বণিক দল মদিনার পাশ দিয়ে বাণিজ্যে গিয়েছিল। মুসলিমরা তাদের বাধা দিয়েছে এরকম একটি খবর পেয়ে সেই বণিক দলকে সুরক্ষার জন্য কুরাইশরা বিরাট এক বাহিনী মদিনায় পাঠিয়ে দিলো। এরই প্রেক্ষিতে বেজে উঠল রণদামামা। প্রথম যুদ্ধটি হলো বদরের প্রান্তরে, যা মদিনা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

মুসলিমরা এই প্রথম তাদের প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার সুযোগ পেল। যদিও মুসলিমদের সংখ্যা কুরাইশদের তুলনায় অনেক কম ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ γ-এর চাচা হামজা η-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সমর কৌশলে তারা কুরাইশদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। বদরের যুদ্ধ ছিল মদিনায় বিকশিত হওয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিরাট এক মাইলফলক। এই যুদ্ধের কারণেই মুসলিমরা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ পায়। অন্যদিকে, গোটা আরব জাহানে কুরাইশদের ভাবমূর্তি অনেকটাই ক্ষুণ্ন হয়ে যায়।

কুরাইশরা এই অপমানকর অধ্যায়কে এমনি এমনি ছেড়ে দিতে মোটেও রাজি ছিল না। তাই তারা পরের বছর আরও বড়ো এক বাহিনী সমবেত করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মদিনাকে এমনভাবে হেনস্তা করা, যাতে মুহাম্মাদ γ-এর গড়ে ওঠা ভাবমূর্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর অনুসারীদের রক্ষা করতে অক্ষম। কুরাইশ বাহিনী মদিনার কয়েক কিলোমিটার উত্তরে ওহুদ নামক একটি পাহাড়ের কাছে সমবেত হয়, যাতে তারা স্থানীয় কৃষক ও সাধারণ মানুষকে হয়রানি করতে পারে।

মদিনা সনদ অনুযায়ী মদিনা এবং এর অধিবাসীদের যেকোনো নির্যাতন ও হয়রানি থেকে মুক্ত করা রাসূল γ-এর দায়িত্ব ছিল। তাই তিনিও কুরাইশদের মোকাবিলায় বাহিনী গঠন করলেন। যদিও তাঁর সাথে মদিনার কয়েকটি সম্প্রদায় একমত ছিল না। তারা চাইছিল যে, ওখানকার স্থানীয়রা তাদের মতো করে কুরাইশদের মোকাবিলা করুক। বরং মুসলিমরা সেনাবাহিনী নিয়ে শহরের ভেতরে অবস্থান করুক– যাতে শহরটিকে রক্ষা করা যায়। এদের সাথে আবার আরও দুটি ইহুদি গোত্রও যোগ দেয়, যারা শহরের বাইরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত বড়ো আকৃতির সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করতে রাজি ছিল না। তাই হযরত মুহাম্মাদ γ প্রত্যাশার চেয়ে ছোটো বাহিনী নিয়েই ওহুদের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হন।

এই যুদ্ধে মুসলিমরা বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মুখে পড়ে যায়। যুদ্ধে কুরাইশ সমরনেতা খালিদ বিন ওয়ালিদের (যিনি পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের পক্ষে অসংখ্য যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে বিজয় নিশ্চিত করেন) অনবদ্য নৈপুন্যে মুসলিমরা ওহুদের ময়দান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। বদর যুদ্ধের বীর হামজা η এ যুদ্ধে শহিদ হন এবং কুরাইশরা তার লাশকে ক্ষত-বিক্ষত করে। মুহাম্মাদ

γ-ও যুদ্ধের এক পর্যায়ে আহত হন। মুসলিমদের এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলতে পারায় কুরাইশরা ধরে নেয়, তারা মুসলিমদের পরাজিত করতে পেরেছে। মুহাম্মাদ γ-এর ভাবমূর্তি ও সুনামকেও নষ্ট করা গেছে। তাই তারা আনন্দের সাথে যুদ্ধের ময়দান থেকে মক্কায় ফিরে যায়।

কুরাইশরা যেমনটা ভেবেছিল, ওহুদ যুদ্ধের বিপর্যয়ের পর ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কিংবা মদিনায় রাসূল γ-এর নেতৃত্ব খর্ব হয়ে যাবে– ঘটনা কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। উলটো এই যুদ্ধ মদিনায় বসবাসরত মুসলিম এবং ইহুদি গোত্রগুলোর মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা তৈরি করে। বিশেষত, যে ইহুদি গোত্রগুলো ওহুদ যুদ্ধের সময় মদিনা সনদের চুক্তিগুলো লঙ্ঘন করেছিল এবং মদিনাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে যায়নি, তারা বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে, পরিস্থিতি যে দিকে চলে গেছে সেখানে যুদ্ধের ময়দানে কুরাইশ বা মুসলিম কেউই অপরকে পুরোপুরি হারাতে পারবে না। সে কারণে কুরাইশ ও মুসলিম উভয়েই আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করল। তারা নিজেদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ে অপর সম্প্রদায়গুলোর সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করছিল।

কুরাইশরা মদিনায় বসবাসরত ইহুদিদের নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করল। তখনও বেশ কিছু ইহুদি সম্প্রদায় অবশিষ্ট ছিল যারা মুহাম্মাদ γ-কে নেতা হিসেবে মেনে নেয়নি। এই গোত্রগুলোর সহযোগিতা নিয়ে পঞ্চম হিজরিতে কুরাইশরা মদিনার উত্তর দিকের একটি অংশে অবস্থান নিল। তারা মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কুরায়জার সমর্থন চাইল। বনু কুরাইজার অবস্থান ছিল মদিনার দক্ষিণে। বনু কুরাইজা কুরাইশদের সাথে যোগ দিলো।

তাদের ধারণা ছিল, এ যাত্রায় তারা মুসলিমদের পরাজিত করবে এবং মুহাম্মাদ γ-এর নেতৃত্বকে আজীবনের জন্য বিনষ্ট করতে পারবে। কিন্তু মক্কার কুরাইশ আর মদিনার ইহুদি সম্প্রদায়গুলোর এই যৌথ পরিকল্পনা সফল হলো না। পারস্য থেকে আসা সালমান ফারসি η নামক একজন অভিবাসী সাহাবির পরামর্শে রাসূল γ মদিনার চারপাশে কুরাইশদের অবস্থানকে ঘিরে পরিখা খনন করার নির্দেশ দিলেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে কুরাইশরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তবে এ যুদ্ধের পরিণতিতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পড়ে বনু কুরাইজা গোত্র। তারা মদিনা সনদ লঙ্ঘন করায় চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাদের শাস্তি পেতে হয়। বনু কুরাইজাকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়, যেখানে ফায়সালা হয়– গোত্রের যেসব পুরুষ সদস্য কুরাইশদের সাথে মিলে মদিনার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে তাদের মৃত্যুদণ্ড আর অবশিষ্ট নারী ও শিশুকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, মদিনায় মুহাম্মাদ γ ইহুদিদের সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি এটা প্রতিষ্ঠিত করেন যে, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বসবাসের ক্ষেত্রে ইসলামি আইন কোনো বাধা দেয় না। সে অনুযায়ী মদিনায় এত দিন ধরে ইহুদি গোত্রগুলো শান্তিপূর্ণভাবেই বসবাস করছে। কিন্তু যখনই তারা পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি লঙ্ঘন করল, শহরের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিলো, তখনই তাদের শাস্তি প্রদান করা হলো; তার আগে নয়। রাসূল γ-এর গোটা জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। বনু কুরাইজা মদিনা সনদ লঙ্ঘন করে ভেতর থেকে মদিনাকে কঠিন নিরাপত্তা সংকটে ফেলে দিয়েছিল। এ সমস্যাকে রাসূল γ যেভাবে মোকাবিলা করলেন, তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিমদের সাথে অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিয়েছে।

বিজয়

মদিনায় নিজের অবস্থান সুসংহত ও সুদৃঢ় হওয়ার পর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে রাসূল γ প্রায় দেড় হাজার সাথিসহ ওমরা করতে রওনা হলেন। তারা দুই টুকরো ইহরামের কাপড় গায়ে জড়িয়ে বের হয়েছিলেন। তাদের কাছে আত্মরক্ষায় সামান্য তরবারি ছাড়া কোনো অস্ত্রও ছিল না। তাদের মধ্যে যুদ্ধের মানসিকতাই ছিল না। তাই তারা যুদ্ধের সাজ বা বর্ম কিছুই সঙ্গে নেননি। মুহাম্মাদ γ শুধু চাইছিলেন কাবাতে গিয়ে ওমরা সম্পন্ন করতে। কিন্তু তিনি সংবাদ পেলেন কুরাইশরা তাকে বাধা দিতে প্রস্তুতি নিয়েছে। তাই তিনি সোজা পথে না গিয়ে মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক একটি স্থানে পৌঁছলেন এবং তাঁবু স্থাপন করলেন। তিনি কুরাইশদের সাথে সংঘাত এড়িয়ে মক্কায় প্রবেশের জন্য সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মক্কার লোকেরা মুসলিমদের এই কার্যক্রমকে প্রাথমিকভাবে স্পর্ধা হিসেবেই বিবেচনা করছিল। কারণ, মাত্র ছয় বছর আগে এই মুসলিমরাই মক্কা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর আজ তারা ফিরে এসে শহরে প্রবেশ করতে চাইছে। কিন্তু কুরাইশরা বুঝতেও পারছিল না, তারা কী করবে। যদি তারা মুহাম্মাদ γ এবং তাঁর সঙ্গীদের মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দেয়, তাহলে আরবের অন্য গোত্রদের কাছে তারা ছোটো হয়ে যাবে। সবাই বলবে, অস্ত্রহীন একটি বাহিনীকেও কুরাইশরা নিয়ন্ত্রণ করতে বা দমাতে পারল না।

অন্যদিকে, ঐতিহাসিকভাবে কুরাইশদের দায়িত্ব ছিল, যদি কেউ মক্কায় এসে হজ-ওমরা করতে চায়, তাহলে তারা তাকে সহযোগিতা করবে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদ γ-এর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। তারা বলল, মুহাম্মাদ γ এবং তাঁর সঙ্গীরা যেন ওমরা করতে পারে, সে লক্ষ্যে তারা তিন দিনের জন্য শহর খালি করে দেবে; তবে এ বছর নয়, পরের বছর। তাই এ বছর মুহাম্মাদ γ-কে তাঁর

সাথিদের নিয়ে ওমরা না করেই ফিরে যেতে হবে। এই মর্মে হুদায়বিয়ায় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। পরবর্তী দশ বছর মক্কা ও মদিনা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হবে না বলে একমত হলো। কয়েকজন সাহাবি অবশ্য হুদায়বিয়ার এই চুক্তিতে মোটেও খুশি ছিলেন না। তারা তৎক্ষনাৎ মক্কায় প্রবেশ করে কুরাইশদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে আগ্রহী ছিলেন।

কিন্তু এই চুক্তিটি প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ γ-কে সংঘাত ও যুদ্ধ থেকে মুক্ত করেছিল। তাই তিনি নিশ্চিন্তে মদিনার বাইরেও ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে মনোযোগ দিতে পারলেন। বাইরের আগ্রাসন ও আভ্যন্তরীণ প্রতারণার আর কোনো সম্ভাবনা না থাকায় নবিজি মুহাম্মাদ γ আরবের বিভিন্ন জায়গায় এমনকি বাইজেন্টাইন এবং পারস্যেও দূত প্রেরণ করে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ শুরু করলেন। আরবের স্থানীয় গোত্রগুলো বিশেষ করে বেদুইনরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে লাগল। এমনকি মক্কা থেকেও লোকজন এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরপরই কুরাইশদের প্রধান দুই সেনাপতি ও সামরিক বিশেষজ্ঞ খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আস মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। চুক্তির কারণে মুসলিমরা মক্কায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছিল না ঠিকই, কিন্তু গোটা আরবে এমনকি আরবের বাইরেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছিল। এই বাস্তবতা মক্কার অধিবাসীদের চরমভাবে হতাশ করে তোলে। কারণ, তারা তখনও আশা করেছিল যে, তারা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারবে।

অধিকন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিটিও পুরোপুরি মানা হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরের দুই বছরের মাথায় কুরাইশদের ঘনিষ্ঠ এক গোত্র, মুসলিমদের সহযোগী এক গোত্রের ওপর মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থানে হামলা চালায়। দশ বছরের জন্য শান্তি রক্ষার কথা থাকলেও চুক্তিটি এভাবেই লঙ্ঘন করা হয়। কুরাইশরা যেহেতু চুক্তি লঙ্ঘন করল, এবার মুহাম্মাদ γ আর সময় নিলেন না। তিনি মক্কায় অভিযান চালানোর উদ্দেশ্য নিয়েই সকল মুসলিমদের একত্রিত হতে নির্দেশ দিলেন।

গোটা মুসলিম বাহিনী সমবেত হলো এবং রাসূল γ-এর চূড়ান্ত নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এবার মক্কার লোকেরাও জানত– মুসলিমরা এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে যে, তাদের আর পরাজিত করা সম্ভব নয়। এবার শুধু মক্কা আর কুরাইশ ছিল একদিকে, আর মুসলিমসহ গোটা আরবের প্রায় সব গোত্র ছিল অপরদিকে। আরবের ইতিহাসে এ ধরনের মেরুকরণ আগে কখনও দেখা যায়নি। নিরুপায় হয়ে কুরাইশরা কয়েক দফা সমঝোতার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। অবশেষে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ১০ হাজারের বেশি জনশক্তি নিয়ে মুহাম্মাদ γ মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন।

কুরাইশরা বিচ্ছিন্ন কিছু প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও তা তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারল না। মোটামুটি রক্তপাত ছাড়াই মুসলিমরা বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করল। নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরে আসার উচ্ছ্বাস তখনই পূর্ণরূপে অনুভূত হলো, যখন সবাই উপলব্ধি করলেন যে, এই দিনটিতেই মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইসলাম জয়ী হলো; মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্য লাভ করল বিজয়।

কাবাঘরে এত দিন যে শত শত মূর্তি রাখা হয়েছিল, সেগুলো সব ধ্বংস করা হলো। পুরো স্থানটিকে মুসলিমদের ইবাদতের জন্য, এক আল্লাহর শানে পবিত্র করা হলো। মক্কার লোকেরা এমনকি কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য নেতারাও তখন বুঝতে পারল যে, তারা এতদিন যে মূর্তিগুলোর পূজা করেছে, তারা মূলত মাটির বানানো পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। তখন তারা দলে দলে মুহাম্মাদ γ-এর কাছে এসে বাইয়াত নিল; ইসলাম গ্রহণ করল।

যে মানুষটিকে তারা একসময় তাড়া করেছিল, জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছিল, অসংখ্যবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল যার সাথে অবশেষে তাঁর নেতৃত্বকেই তারা চূড়ান্তভাবে মেনে নিল। অন্যদিকে, মুহাম্মাদ γ এত বড়ো বিজয়ের পরও ছিলেন একদম নিরুত্তাপ। তাঁর ভেতরে সামান্য পরিমাণ আগ্রাসী ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব সেদিন ছিল না। মক্কার কোনো মানুষের কোনো ক্ষতি করা হয়নি। বরং মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে যে গোত্রগুলো ভয়াবহ উৎপীড়ন চালিয়েছিল, তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। নবিজি মুহাম্মাদ γ আরও একবার প্রমাণ করলেন, তাঁর নবুওয়াত আসলে নতুন এক যুগের, নতুন এক দর্শনের সূচনা করেছে। ইসলামপূর্ব যে অন্ধকার যুগ ছিল– যাকে জাহিলিয়াত বলা হয়, তাকে তিনি তাঁর অনুপম নেতৃত্বে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হলেন।

যদি আলোচিত এই কয়েক বছরের নবিজি γ-এর জীবনের ঘটনা পরিক্রমাকে আমরা বিবেচনায় নিই, তাহলে মক্কা বিজয়কে ঐতিহাসিক এবং অনন্যসাধারণ বলেই মানতে হবে। মাত্র ৮ বছর আগে যে শহর থেকে তিনি রাতের আঁধারে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই মক্কা শহরেই তিনি হাজার হাজার মানুষ আর অনুসারী নিয়ে বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন। মক্কায় তিনি প্রাথমিক জীবনে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তারপর একটা সময়ে তিনি বহু ঈশ্বর ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। তারপর দূরের এক জনপদে গিয়ে বসত গড়লেন। এরপর পুনরায় নিজ শহরে ফিরে এলেন বিজয়ীর বেশে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, তিনি যেভাবে যত দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্ষমতা অর্জন করলেন, গোত্রগুলোর পুরোনো বিবাদের মীমাংসা করলেন, সকলকে ইসলামের ছায়ায় একত্রিত করলেন, তা নিঃসন্দেহে অলৌকিক এবং তাঁর নবুওয়াতের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। সেসময়ের মুসলিমরা, যাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণের পর বর্বর নির্যাতন সহ্য করেছেন তারা এবং অন্যদিকে যারা মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলেন তারা– উভয়েই অনুভব করছিলেন, ইসলাম আসলে ভিন্ন

একটা ব্যাপার। ইসলামে এমন কিছু প্রাণচঞ্চল সজীবতা আছে, এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা আর কোথাও নেই। ইসলামকে যেন আল্লাহ তায়ালা নিজেই পরিচালনা করেন এবং নিরাপত্তা দেন।

মুসলিমরা বিশেষ একটি দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। আর তা হলো, পৃথিবীর সব জায়গায় ইসলামের সুমহান বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আর বিশেষ এই দায়িত্ববোধটি মুসলিমদের ভেতরে ভিন্ন একধরনের মানসিকতা তৈরি করে, যার নজির পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে আরও অনেকবার দেখা যায়।

নবুওয়াতের সমাপ্তি

মক্কা বিজয়ের সময় মুহাম্মাদ γ-এর বয়স ছিল আনুমানিক ৬০ বছর। তখনও কুরআনের আয়াত নাযিল চলমান ছিল, রাসূল γ-ও মুসলিমদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর তার ওপর ভিত্তি করে ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ কাঠামোতে আবির্ভূত হচ্ছিল। এত দিন যা ছিল কথায় ও আদেশে এখন তা পুরোপুরি বাস্তবে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে ইসলামি সরকারের পূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছিল, যার ওপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক কাঠামো ও নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। নিছক গোত্রকেন্দ্রিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে ওহিভিত্তিক বিধি-বিধানের আলোকে সবাই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করে।

এই প্রসঙ্গে বিদায় হজের ভাষণে মুহাম্মাদ γ বলেন, "তোমরা সবাই আদম থেকে এসেছ, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি সে, যে প্রকৃত অর্থে ধার্মিক। কোনো আরব অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নয়, যদি না সে তার তুলনায় তাকওয়াবান হয়।" নবি মুহাম্মাদ γ-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তাগুলো ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক একটি দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায়, যার ওপর ভিত্তি করে গোটা আরব জুড়ে একক মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইতিহাসে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। আরবের সব গোত্র কখনও এভাবে একত্রিত হয়নি। এমনকি বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের আওতায় থাকা কিছু গোত্রও ইসলামকে বরণ করে নেয়। দুই সাম্রাজ্যের অধিপতিরা ইসলামের এই বিকাশ নিয়ে অবগত ছিলেন এবং ভেতরে ভেতরে তারা বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যেও ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল γ আবারও মদিনায় ফিরে যান। কারণ, আট বছর আগে যখন আওস ও খাযরাজ গোত্র তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তখন তিনি মদিনা থেকেই মুসলিম উম্মাহকে পরিচালনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবার তিনি মুসলিমদের এমনভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা শুরু করলেন, যাতে তাঁর ইন্তেকালের পরও মুসলিমরা একক উম্মাহ হিসেবে টিকে থাকতে পারে।

তাই একজন ঈমানদারের দায়িত্ব-কর্তব্য কী, কীভাবে কুরআন ও এর বিভিন্ন নির্দেশনাকে সংরক্ষণ করা যায়– এই বিষয়ে মুসলিমদের প্রশিক্ষিত করতে থাকেন। ৬৩২ সালে তিনি সর্বশেষ হজ করার জন্য মক্কায় যান। এসময় তিনি হাজার হাজার মুসলিমদের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ দেন।

সমবেত সবাই, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান যার যা-ই থাকুক না কেন, সবার পরিধানে সামান্য দুই টুকরো কাপড়ের একটি পোশাক। আর এর মাধ্যমে ইসলামের সাম্য ও সমতার অনন্য আদর্শই যেন প্রতিষ্ঠিত হলো। রাসূল γ তাঁর অনুসারীদের আবারও সব ধরনের নিপীড়ন থেকে দূরে থাকার আদেশ দিলেন, নারীদের সাথে শ্রদ্ধা ও মমতা নিয়ে ব্যবহার করতে বললেন। সেই সাথে পুরোনো সব গোত্রীয় বিভেদ থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন, যা আরব জাতি ও সভ্যতাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পশ্চাৎপদ অবস্থানে রেখেছিল। এই ভাষণটি ছিল তাঁর নবুওয়াতের সকল বার্তার নির্যাস; এর প্রতিটি বাণীতেই ছিল বিপ্লবের ঘ্রাণ। সাহাবিরা অনুধাবন করলেন, বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের নতুন নির্দেশনা তাদের সামনে। যার ভিত্তি হবে আল্লাহর দেওয়া আইন, আর রাসূল γ-এর রেখে যাওয়া আদর্শ।

শেষবারের মত হজ সম্পন্ন করে রাসূল γ আবারও মদিনায় ফিরে গেলেন, যেখানে তিনি ইসলামি সাম্রাজ্যের শক্ত ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন। প্রশিক্ষিত সাহাবিদের ইয়েমেনসহ আরবের বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হলো, যাতে তাঁরা ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেন। আর রাসূল γ-এর উপস্থিতিতে মদিনা হয়ে উঠল জ্ঞানচর্চার নিবিড় এক কেন্দ্র, যা থেকে গোটা দুনিয়াতে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এমনকি রাসূল γ-এর অনুপস্থিতিতেও এই কাজে কোনো সমস্যা হবে না।

অন্যদিকে, উত্তরে বাইজেন্টাইনকে জয় করার জন্য প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এক শক্তিশালী বাহিনীও প্রস্তুত করা হলো। এই প্রক্রিয়াগুলো থেকে ইসলামের যুদ্ধনীতি প্রণীত হয়, যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দীকাল ধরে মুসলিমদের উজ্জীবিত করে রেখেছে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো মুহাম্মাদ γ-কে আল্লাহ তাঁর একজন বার্তাবাহক হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি মানুষকে আল্লাহর বাণীসমূহ পৌঁছে দিতে পারেন। গোটা মানবজাতির জন্য রাসূল γ হলেন উত্তম আদর্শ, যিনি কুরআনের আলোকেই জীবনযাপন করে গেছেন। ২৩ বছর ধরে রিসালাতের দায়িত্ব পালন শেষে তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ হলো। কুরআনের সকল আয়াত তখন হাড়ে, চামড়ায়, পাতায় লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, অনেক সাহাবি তখন গোটা কুরআন মুখস্থ করে ফেলেছেন।

যেহেতু আদিকাল থেকেই আরবরা দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ রাখতে পারদর্শী, সে কারণে কুরআন মুখস্থ করতে সাহাবিদের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। আর এভাবেই প্রকৃতিগতভাবে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থটি সংরক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। অন্যদিকে, রাসূল γ-এর কথা ও কাজকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং এগুলো লোকমুখে তত দিনে আরবের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এর পরপরই কুরআনের সেই চূড়ান্ত আয়াতটি নাযিল হয়–

> "...আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।..."
> *(সূরা মায়িদা : ৩)*

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মের প্রথমদিকে নবি γ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি প্রচণ্ড জ্বর ও মাথাব্যাথায় আক্রান্ত হন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী এবং চাচা আব্বাস η-এর সহযোগিতায় চলাচল করতেন। যখন তিনি মসজিদে ইমামতি করার মতো শারীরিক সক্ষমতাও হারিয়ে ফেললেন, তখন ঘনিষ্ঠ সহচর আবু বকর γ-কে নামাজে ইমামতি করার দায়িত্ব দিলেন।

রাসূল γ জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁর স্ত্রী আয়িশা ι-এর ঘরেই অতিবাহিত করেন, যা ছিল মসজিদে নববির একেবারে সন্নিকটে। তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে মুসলিমরা কীভাবে জামাতে নামাজ আদায় করছে, সেই দৃশ্যও তিনি ঘর থেকে দেখতে পান। নামাজে তাঁর এই অনুপস্থিতির বিষয়টি সাহাবিদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক ছিল। বিশেষ করে, যারা এত দিন তাঁর দুঃসময়ে সব সময় তাঁর পাশে থেকেছেন, যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করেছেন, একসাথে মক্কা বিজয় করেছেন, তাদের জন্য এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া অনেক কঠিন ছিল। কারণ, তাঁরা গোটা জীবনটাই রাসূল γ-এর নেতৃত্ব ও পরামর্শের আলোকে পার করেছেন। তাই রাসূল γ-এর মুখ থেকে অনবরত মৃত্যুর কথা শোনায় এবং নামাজে জামাতের ইমামতিতে তাঁর অপারগতা সাহাবাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল।

রাসূল γ-এর শেষ দিনগুলো কাটে তাঁর স্ত্রী আয়িশা ι-এর সান্নিধ্যে। রাসূল γ স্ত্রীর কোলে মাথা রেখেই বিশ্রাম নিতেন। পরিবারের সদস্যরা এবং সাহাবিরা তখনও আশাবাদী ছিলেন যে, হয়তো তিনি পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু ইসলামের মৌলিক একটি বিষয় হলো, একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যকে স্বীকার করে নেওয়া।

আল্লাহর রাসূল γ সব সময়ই শিক্ষা দিয়েছেন, কেবল আল্লাহই অবিনশ্বর, তা ছাড়া অন্য সব সৃষ্টি, সব প্রাণী, মানুষ সবাইকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সাহাবিরা মানসিকভাবে শক্তও হচ্ছিলেন। কারণ, রাসূল γ-এর অনুপস্থিতিতে ইসলামকে একইভাবে টিকিয়ে রাখতে হবে। তারপরও যে মানুষটি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন, বহু ঈশ্বর পূজার অসারতা থেকে বের করে এক আল্লাহর আনুগত্য করতে শিখিয়েছেন, গোত্রগত বিবাদের অবসান ঘটিয়েছেন, তাঁর অনুপস্থিতি তাঁরা কল্পনাও করতেও পারছিলেন না।

তারপরও সকলকে শোকের পাথারে ভাসিয়ে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন, স্ত্রী আয়িশা ι-এর কোলে মাথা রেখে রাসূল γ ইন্তেকাল করেন। আর এর মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগের এবং ২৩ বছরের নবুওয়তি জীবনের সমাপ্তি ঘটল।

তৃতীয় অধ্যায়

খুলাফায়ে রাশিদিন

রাসূল γ-এর ওফাতের ঘটনায় শোকে ও আবেগে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা মদিনা। নবিজির অনুপস্থিতি মুসলিমদের জন্য বড়োই দুর্বিষহ হয়ে দেখা দিলো। অনেকে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, তিনি আর জীবিত নেই। কিন্তু একইসঙ্গে নবিজির ইন্তেকাল মদিনার পরবর্তী নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জটিকেও সামনে নিয়ে এলো।

এত দিন নবি মুহাম্মাদ γ নিজেই রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সরাসরি সংযোগ থাকায় মুসলিমরা ওহির নির্দেশনা ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। এখন আর এই যোগাযোগ করার কোনো মাধ্যম না

থাকায় মুসলিমরা কীভাবে নির্দেশনা পাবে সে প্রশ্ন দেখা দিলো। আগামী দিনগুলোতে মুসলিমদের নেতৃত্ব দেবেন কে? এটাই হয়ে গেল সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ γ-এর দাফন কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগেই আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সমবেত হয়ে পরবর্তী নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করল। কাকে নেতৃত্ব দিলে গোটা মুসলিম উম্মাহকে একত্রিত রাখা যাবে এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর কার নিয়ন্ত্রণ বেশি কার্যকর হবে, সেই ইস্যুতে মতপার্থক্য দেখা দিলো। কেউ কেউ আবার দুটি ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও মত দিলেন, যার একটি চালাবে মুহাজির আর অন্যটি আনসাররা। আলোচনার শেষ পর্যায়ে, উমর ফারুক η আবু বকর η-কে মদিনা রাষ্ট্রের পরবর্তী নেতা হিসেবে নির্বাচন করার প্রস্তাব করলেন।

আবু বকর η পুরুষদের মাঝে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূল γ-এর মদিনায় হিজরতের পথের একমাত্র সঙ্গী ছিলেন। রাসূল γ যখন জীবন সায়াহ্নে আর নামাজে ইমামতি করাতে পারছিলেন না, তখন তিনিই আবু বকর η-কে ইমামতি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি আবু বকর সিদ্দিক η-এর যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন বা তাঁর বিকল্প হিসেবে সামনে আসতে পারেন।

আবু বকর সিদ্দিক η

আবু বকর η ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে খলিফাতুল রাসূল বা রাসূলের উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সংক্ষেপে এই পদবিকে 'খলিফা' বলা হয়। খলিফা মানে কোনো নবি নয়। ইসলাম আগেই চূড়ান্ত করে দিয়েছে, হযরত মুহাম্মাদ γ সর্বশেষ নবি এবং তারপরে আর কোনো নবি আসবেন না। যেভাবে রাসূল γ ইতিপূর্বে মদিনাকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, সেই চেতনাকে ধারণ করে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে যাওয়াই ছিল খলিফার দায়িত্ব। তাই খলিফাকে এতটুকু যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে যাতে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, আবার একইসঙ্গে মুহাম্মাদ γ-এর রেখে যাওয়া ইসলামকে এর মৌলিক চেতনায় সমুন্নত রাখতে পারেন এবং মানুষকে ইসলাম অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। আবু বকর η এই দায়িত্ব সফলভাবে সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তী সকল খলিফার জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান।

হযরত মুহাম্মাদ γ-এর প্রদর্শিত রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি আবু বকর η বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য জয় করার জন্য আরবের দক্ষিণে সিরিয়ার কাছাকাছি এলাকায় বাহিনী প্রেরণ করেন। এর আগেও রাসূল γ বর্তমান থাকাকালে বাইজেন্টাইনের সাথে মুসলিমদের কয়েকবার ছোটোখাটো যুদ্ধ হয়েছিল। তাই আবু বকর η-এর সিরিয়াতে বাহিনী প্রেরণের এই ঘটনা সকলকেই ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের পরও মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধ বা স্থগিত হবে না।

অন্যদিকে, মদিনার পূর্বদিকের মরুভূমি থেকে কিছু বেদুইন গোত্র– যারা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা নতুন করে বিদ্রোহের ডাক দিলো। তাদের যুক্তি ছিল খুবই সাদামাটা। আমরা মুহাম্মাদ γ.-এর কাছে শপথ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। এখন যেহেতু মুহাম্মাদ আর জীবিত নেই, তাই সেই শপথেরও কোনো গুরুত্ব নেই। তা ছাড়া আবু বকর η-এর বিরুদ্ধে এই গোত্রগুলোর বিদ্রোহকে ঐতিহাসিকরা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে, যেহেতু আরবরা কখনও কোনো সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা দেখতে অভ্যস্ত ছিল না, তাই মুহাম্মাদ γ-এর ওফাতের পর মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব যত সহজে বদল হলো এবং রাষ্ট্রীয় সব কার্যক্রম যেভাবে স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগল, এটা তারা মেনে নিতে পারেনি।

শতাব্দীকাল ধরে এইসব বেদুইন গোত্রগুলো নিজেদের স্বাধীনতা অনুযায়ী চলাচল করত। কোনো সরকারকে তারা মানত না। কাউকে কর দিতেও তারা অভ্যস্ত ছিল না। তারা হয়তো পরিস্থিতির চাপে পড়ে মুহাম্মাদ γ-এর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে এসব কাজ শুরু করেছিল, কিন্তু আদতে তারা কখনও আবু বকর সিদ্দিক η-এর নেতৃত্বে একই প্রক্রিয়ায় চলতে রাজি ছিল না। তারা যে নিয়মতান্ত্রিক কোনো পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়াতে প্রস্তুত নয়, তা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন এসব গোত্র থেকে অনেকেই নিজেদের নবি হিসেবে দাবি করতে শুরু করে। যার মধ্যে একজন বেশ নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। তার নাম ছিল মুসায়লামা। ইতিহাস এই ব্যক্তিকে 'মুসায়লামাতুল কাজ্জাব' বা মিথ্যাবাদী মুসায়লামা হিসেবে অভিহিত করে।

“কখনও কোনো শিশু, নারী ও বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। গাছের কোনো ক্ষতি করবে না। গাছে আগুন জ্বালিয়ে দেবে না। বরং যে গাছগুলো ফলবতী সেগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হবে। শত্রুপক্ষের পশুপালকে হত্যা করো না। তোমাদের খাদ্য মজুত রেখ। তোমাদের আশেপাশে হয়তো অনেক দরবেশ বা সাধু সন্ন্যাসী দেখতে পাবে, তাদের ক্ষতি না করে বরং ছেড়ে দেবে। তাদেরকে তাদের মতোই থাকতে দাও।”

আবু বকর সিদ্দিক η-এর সামরিক নির্দেশনা– যা তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে দিয়েছিলেন।

এসব গোত্রগুলো যাকাত দিতে অস্বীকার করায় তারা প্রকারান্তরে ইসলামের একটি মৌলিক ভিত্তিকেই অস্বীকার করেছিল। ফলে আবু বকর η ঘোষণা করলেন, তারা আর ইসলামের ছায়াতলে নেই; বরং ইসলামের জন্য তারা এখন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি কোনো সম্প্রদায় ইসলামের কিছু বিধানকে পছন্দ করে এবং কিছু বিধানকে অস্বীকার করে; কেউ যদি নিজেকে নবি হিসেবে দাবি করে তাহলে ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট হবে। আর এভাবেই মুসলিমদের মধ্যে শত শত দল ও উপদলের সৃষ্টি হবে।

বিষয়টা খলিফা আবু বকর η যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন। সেই সাথে তিনি এও ভেবেছিলেন যে, কুরআনে কারিমে এমন অসংখ্য নবির কাহিনি বর্ণিত আছে, যেখানে সেই নবিদের জাতি নবির অনুপস্থিতিতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য খোদার ইবাদত শুরু করেছিল। আল্লাহ ওইসব জাতির ওপর গজব নাযিল করেছিলেন। আর প্রতিটি ধার্মিক মানুষেরও সচেতনভাবে চেষ্টা করা উচিত, যাতে সকল উপায়ে গোমরাহির পথকে রুদ্ধ করা যায়। এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আবু বকর η এসব বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ η-কে সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য অভিযানে পাঠালেন। সমরনেতা হিসেবে খালিদ বিন ওয়ালিদ η-এর গোটা আরব জাহানে বেশ বিখ্যাত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে ও পরে কোনো যুদ্ধেই তিনি কখনও পরাজিত হননি। মরুভূমির যুদ্ধে তার পরিণত সমর-কৌশল আর অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনার অনুপম দক্ষতা তাকে সেনাপতি হিসেবে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। তাই সামরিক অভিযানে তার কোনো বিকল্প ভাবার তেমন অবকাশ ছিল না।

মদিনাকে বিদ্রোহীদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ η দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন, যেখানে আরও কিছু বিদ্রোহী গ্রুপের বসবাস ছিল। মুসায়লামার বাহিনী মুসলিম বাহিনীর কাছে সংখ্যায় ও যোগ্যতায় ছিল খুবই সীমিত। মুসলিম বাহিনী সহজেই মুসায়লামার অনুসারীদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে মুসায়ালমা নিহত হয়। এরপর খলিফার নির্দেশনায় সামরিক বাহিনী আরবের বিভিন্ন স্থানে একইভাবে অভিযান চালাতে লাগলেন। তারা বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে ইসলামের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। যারা মানলেন, তারা অক্ষতই থাকলেন। কিন্তু যারা বিদ্রোহ অব্যাহত রাখল, মুসলিমরা যুদ্ধের ময়দানেই তাদের শায়েস্তা করতে লাগল। ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মুরতাদদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। গোটা আরব আবার এক হয়ে শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইসলাম এভাবে তার প্রথম রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জকে সফলতার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হলো। নবির ওফাতের পরও ইসলাম এবং ইসলামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে টিকে থাকবে তা নতুন করে প্রমাণিত হলো।

মুরতাদদের বিরুদ্ধে এই লড়াই ভবিষ্যৎ মুসলিম বিশ্বের জন্য বিরাট একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। প্রথম যা প্রমাণিত হলো, তা হলো ইসলামের আধ্যাত্মিক একতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে কোনো ধরনের বিচ্যুতি বা নবুওয়াতের কোনো মিথ্যা দাবিকে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিভিন্ন জাতি ইতিপূর্বে যখনই আল্লাহর ইবাদত থেকে সরে গিয়ে অন্য কিছুর উপাসনায় মত্ত হয়েছে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সঠিক পথে আনার জন্য আবার নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই। মুহাম্মাদ γ-এর পরে যেহেতু আর কোনো নবি আসবেন না, তাই বিচ্যুত জনগোষ্ঠীকে সঠিক পথে নিয়ে আসার বা ভুল সংশোধন করিয়ে দেওয়ার বিষয়টি পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মতো করে আর হবে না। নবি মুহাম্মাদ γ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইসলামের যথার্থতা নিয়ে কোনো সংকটের মুখোমুখিও হতে হয়নি। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ η তার সামরিক অভিযান দিয়ে এটাই প্রমাণ করলেন, মুসলিম রাষ্ট্র এখনও ইসলামের ঐশ্বরিক সৌন্দর্যকে রক্ষা করার জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের রাজনৈতিক একতা বেশ কিছু সময়ের জন্য নিশ্চিত হলো। আরবের অবস্থান ছিল বাইজেন্টাইন ও সাসানি নামক দুই মহাশক্তিধর সাম্রাজ্যের মাঝখানে। তাই যদি আরবকে সঠিকভাবে টিকে থাকতে হয়, তাহলে নিজেদের মধ্যে একতা ধরে রাখার কোনো বিকল্প নেই। মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই বার্তা দেয়, মুসলিম রাষ্ট্র সব মিলিয়ে একটাই। আর সেই রাষ্ট্রের নেতাও একজনই। আর তিনিই হলেন খলিফা।

তৃতীয় কারণ এবং সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বার্তাটি এই লড়াই থেকে এলো তা হলো– একটি কেন্দ্রশাসিত সরকারের রূপরেখা চূড়ান্ত হওয়া। আরব গোত্রগুলোর কাছে শত শত কিলোমিটার দূরের একটি প্রশাসনকে কেন্দ্র হিসেবে মানা এবং তার নির্দেশ অনুসরণ করার এই প্রক্রিয়াটি ছিল একেবারেই অপরিচিত। মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই এটাও নিশ্চিত করল যে, আগামী দিনে ইসলামের যে ইতিহাস লেখা হবে সেখানে গোত্রভিত্তিক বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা লালন করার সুযোগ নেই। আরবরা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল আর এসব বিদ্রোহ দমনাভিযানের মধ্য দিয়ে তাদের সরকার এবং সরকারের নীতি গোটা পৃথিবীকে সেই ইঙ্গিতই দিয়ে দিলো।

শুধু যে ইসলামি রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন এজন্যই নয়, বরং খলিফা হিসেবে আবু বকর η-এর সময়টা ঐতিহাসিকভাবেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, তাঁর আমলেই তিনি আল কুরআনকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেন। রাসূল γ-এর সময় থেকেই বেশ কিছু সাহাবিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যারা কুরআনের নতুন আয়াত নাযিল হলেই তা লিখে রাখতেন। তবে এইসব লেখাকে তখন বই আকারে সংকলিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বরং এগুলো বিক্ষিপ্তভাবে মদিনার নানা জায়গায় নানাজনের কাছে সংগ্রহে ছিল। আরব সমাজ ছিল কথ্য ভাষা কেন্দ্রিক একটি সমাজ। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সেখানে লিখতে ও পড়তে জানত। তাই তাদের কাছে প্রথমদিকে কুরআন লিখে রাখার বিষয়টা মুখস্থ করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। খলিফা আবু বকর η-এর খিলাফতের সময় উমর η সর্বপ্রথম প্রস্তাব দিলেন, যাতে সকলের কাছে থাকা লিখিত সবগুলো অংশ সংগ্রহ করা হয়, তারপর নির্ভরযোগ্য হাফেজ সাহাবিদের দিয়ে তার যথার্থতা পরীক্ষা করা হয় এবং তারপর যেন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তা সংরক্ষণ করা হয়। কারণ, হাফেজ সাহাবিরা যদি কোনোভাবে কোনো আয়াত ভুলে যান কিংবা যাদের কাছে লিখিত কোনো চিরকুট আছে, তারা যদি তা হারিয়েও ফেলেন তারপরও নির্ভরযোগ্য একটি জায়গায় যেন গোটা কুরআন সংরক্ষিত থাকে। যেহেতু রাসূল γ এই কাজটি করেননি, তাই উদ্যোগটি শুরু করার ব্যাপারে প্রথমদিকে খলিফা আবু বকর η একটু ইতস্তত করলেও পরে তিনি এই পরিকল্পনার সাথে একমত হন। আর এর পরপরই মদিনার বিভিন্ন স্থান থেকে কুরআনের লিখিত অংশগুলো সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে যায়।

আবু বকর η-এর খিলাফতকাল ছিল দুই বছর। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খলিফা হিসেবে দায়িত্ব নেন আর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। এই দুই বছরের মধ্যেই তিনি ইসলামি রাষ্ট্রটিকে একতাবদ্ধ রেখে আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হন। রাসূল γ-এর রেখে যাওয়া আদর্শকে সমুন্নত রাখেন এবং উত্তরে শক্তিশালী সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অনেকটাই অগ্রসর হন। তাঁর এই খিলাফত ছিল পরবর্তী সকল খলিফার জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত। সর্বশেষ যে উত্তম দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তা হলো, পরবর্তী খলিফা মনোনয়ন। তাঁর গোত্র বা পরিবারের কাউকে তিনি বাছাই করেননি। আবু বকর η উমর ইবনুল খাত্তাব η-কে তাঁর উত্তরসুরি হিসেবে পছন্দ করেন, যিনি এই কাজের জন্য সেই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন।

উমর ফারুক η

আবু বকর η-এর মতো উমর η-ও প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি হিজরতের অনেক আগে সরাসরি রাসূল γ-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদিনা রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং সকল যুদ্ধে নবিজির ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনে যোগ্যতার ব্যাপারে কারও মধ্যেই কোনো দ্বিমত ছিল না। তাই খলিফা আবু বকর η-এর উত্তরসূরি হিসেবে যখন তাঁর নাম এলো, তখন কেউই কোনো আপত্তি করল না। দায়িত্ব হস্তান্তর, গ্রহণ এবং উত্তরসূরি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উমর ফারুক η-এর ক্ষেত্রে যে স্থিতিশীলতা দেখা গিয়েছিল, তা পরবর্তী সময়ের ইসলামের ইতিহাসে তেমন একটা দেখা যায়নি।

খলিফা আবু বকর η-এর মতো হযরত উমর η-কে অবশ্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কিংবা ইসলামের একতা ধরে রাখা নিয়ে প্রাথমিকভাবে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়নি। সমগ্র আরবই তাঁর নেতৃত্বে একতাবদ্ধ ছিল। মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সফল সামরিক অভিযান শেষ হওয়ার পর গোটা মুসলিম রাষ্ট্রে এতটা আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল যে তারা উত্তরের পরাশক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সামরিক অভিযান চালানোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। তা ছাড়া শতাব্দীকাল ধরে আরবরা যেভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত ছিল তাও তখন আর পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। গোত্রে গোত্রে বিবাদ আর যুদ্ধ করেই আরবরা সময় পার করত। কিন্তু এখন সকল গোত্রই ইসলামের ছায়াতলে চলে আসায় পরস্পরের মধ্যে বিবাদের চেয়ে ভ্রাতৃত্ববোধই হয়ে উঠল শক্তিশালী। রাসূল γ অসংখ্য ভাষণে সমগ্র মুসলিমদের এক উম্মাহ হিসেবে আখ্যায়িত করে গেছেন। তাই বর্তমানে মুসলিমরা যেভাবে নিজেদের মধ্যকার লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকে, তা মেনে নেওয়া অনেক সময় কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

যাহোক, নিজেদের মধ্যকার বিভাজনকে দূরে রাখতে এবং বাইজেন্টাইন ও সাসানি সাম্রাজ্যের সীমানায় বসবাসরত নওমুসলিম গোত্রগুলোকে নিরাপত্তা দেওয়ার স্বার্থে মুসলিম সেনাবাহিনী উত্তরের দিকে অগ্রসর হলো।

আবু বকর η-এর খিলাফতের শেষ দিকে সাসানি নিয়ন্ত্রিত মেসোপটমিয়াতে মুসলিমদের ছোটোখাটো অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর উমর η দায়িত্বে এসে সেই কৌশলই অব্যাহত রাখলেন। প্রথম দিকে হয়তো উমর η এবং তাঁর সঙ্গীরাও ভাবেননি যে, এসব খুচরা অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটবে অবিস্মরণীয় ও বিশাল এক বিজয়ের মধ্য দিয়েই। এর আগে, ৬০৩ থেকে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৫ বছর বাইজেন্টাইন ও সাসানিরা দীর্ঘমেয়াদি এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তাই দুই পরাশক্তিই ততদিনে সামরিকভাবে হয়ে পড়েছিল দুর্বল। সে কারণে মুসলিম সেনাবাহিনী তাদের সীমান্তে প্রায়শই অভিযান চালালেও শক্ত প্রতিরোধ করার মতো সক্ষমতা তাদের ছিল না। মেসোপটমিয়া ও সিরিয়ার উর্বর জমিও তখন মুসলিমদের হাতে পরাস্ত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। শুধু দরকার ছিল সুশৃঙ্খল একটি সামরিক অভিযানের।

মুসলিমদের এই সামরিক অভিযান প্রকৃতপক্ষে ছিল নতুন ধরনের যুদ্ধ। কারণ, এতদিন দুই পরাশক্তি ধ্বংসের যে খেলা চালিয়েছিল, মুসলিম সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে পুরোই বিপরীত এক বার্তা নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয়। মুসলিমরা রাসূল γ-এর নির্দেশিত ন্যায়বিচার ও সামাজিক সহাবস্থানের আহ্বান বুকে নিয়েই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এর আগে, এসব এলাকায় যখন আবু বকর η প্রথম সেনাবাহিনী পাঠান, তখন তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন– যেন নারী, শিশু ও বৃদ্ধের কোনো ক্ষতি না করা হয়, কোনো উপাসনালয় গুঁড়িয়ে না দেওয়া হয়, সাধু-সন্ন্যাসীদের আঘাত না করা হয় কিংবা ফসলের ক্ষতি সাধন না করা হয়। এসব নিন্দনীয় কাজগুলো যে শুধু পরাশক্তিরাই যুদ্ধের সময় করত তা নয়; বরং ইসলামপূর্ব যুগে আরবরাও যুদ্ধ বলতে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমকেই বুঝত। কিন্তু নবি মুহাম্মাদ γ-এর কর্মসূচি ও পদক্ষেপ শুরু থেকেই ছিল আলাদা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল নিয়মকানুন প্রণয়নের ক্ষেত্রেই তিনি ইতিবাচকতার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। আর তাঁর যুদ্ধনীতিতেও ছিল এর ছাপ।

সিরিয়া ও মেসোপটমিয়াতে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে একই সাথে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়। মুরতাদের বিরুদ্ধে অসাধারণ জয়লাভ করায় সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ η-এর নেতৃত্বেই পারস্যে নতুন অভিযান পরিচালনা করা হয়। অন্যদিকে, কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের ছেলে ইয়াজিদ η-এর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনীকে পাঠানো হয় সিরিয়া। ইয়াজিদ η বেশ সহজেই বর্তমান গাজার কাছাকাছি এলাকায় বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীর একটি অংশকে পরাজিত করেন। বাইজেন্টাইন বাহিনীও বুঝতে পারে, এই পরাজয় কেবল যুদ্ধের পরাজয় নয়, বরং এর মাধ্যমে একটি নতুন বাহিনীর ষোলো আনা জয় করে নেওয়ার অভিযাত্রা শুরু হলো। তাই মুসলিমরা আরও অগ্রসর হওয়ার আগেই বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার গোটা সাম্রাজ্য থেকে সৈন্য এনে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে জড়ো করতে শুরু করেন।

মুসলিম রাষ্ট্রনায়কও বাইজেন্টাইন রাজার এই পদক্ষেপের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ η-কে বাইজেন্টাইনের দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। খালিদ η তখন ছিলেন ইরাকে। আর তিনি সফলও হচ্ছিলেন। তারপরও তিনি খলিফার আদেশ পেয়ে কালবিলম্ব না করে ঊষর মরুভূমি পাড়ি দিয়ে দ্রুত বেগে বাইজেন্টাইন এলাকায় অবস্থানরত মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিলেন। জেরুসালেম থেকে ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে আজনাদাইন এলাকায় মুসলিম বাহিনীর সাথে বাইজেন্টাইনের মূল বাহিনীর যুদ্ধ হয়। বাইজেন্টাইন সম্রাটের ভাই নিজে সরাসরি তার সেনাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও মুসলিমরা ঐতিহাসিক সেই যুদ্ধে বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ সিরিয়াতে তখনও অল্প কিছু সংখ্যক যে বাইজেন্টাইন সেনা মোতায়েন ছিল, তারা এই পরাজয়ের খবর পেয়েই পিছু হটে; তারা জেরুসালেম, কায়েসারা ও গাজায় গিয়ে অবস্থান নেয়। বাইজেন্টাইনরা বাকি এলাকা এভাবে ছেড়ে দেওয়ায় মুসলিমরা সহজেই ফিলিস্তিনের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়।

খালিদ η-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম সেনাবাহিনী এরপর আরও উত্তরে এগিয়ে যায় এবং দামেস্ক অধিকার করে নেয়। ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মুসলিমদের হাতে দামেস্ক বিজিত হয়। শহরটি জয় করার পরই স্থানীয় অধিবাসীদের আতঙ্কমুক্ত করার জন্য মুসলিমরা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে খলিফা উমর η প্রতিশ্রুতি দেন, শহরের অধিবাসীদের জীবন, সম্পত্তি এবং ধর্ম পালনের অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করা হবে। তারা যতক্ষণ মুসলিম সরকারকে জিযিয়া পরিশোধ করবে, ততক্ষণ তাদের কোনো ধরনের হয়রানি করা হবে না। এর মাধ্যমে মুসলিমরা আরেকটি বার্তাও সকলকে জানিয়ে দেয়, তা হলো– তাদের যুদ্ধ শুধু বাইজেন্টাইন প্রশাসন ও সেনাদের বিরুদ্ধে; সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়। মুসলিমদের এই ঘোষণার ফলে সিরিয়ার জনগণের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা কমে যায়। শুধু কিছু বেদুইন গোত্র সিরিয়ার একটি অংশ তখনও দখল করে রেখেছিল।

দামেস্ক হাতছাড়া হওয়ার পর বাইজেন্টাইনরা আরও সেনা জমায়েত করার চেষ্টা করে, যেন মুসলিমরা নতুন করে আর কোনো শহর জয় করতে না পারে এবং দ্রুত পরাজিত করে তাদের মরুভূমির দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া যায়। খালিদ বিন ওয়ালিদ η নিজেও বুঝতে পারছিলেন যে, তার হাতে থাকা সৈন্য দিয়ে বাইজেন্টাইনের এই বিশাল সংখ্যক সেনাদের মোকাবিলা করা যাবে না। তাই তিনি দক্ষিণে মোতায়েনকৃত সব সেনাকে প্রত্যাহার করে তার সাথে এসে যোগ দিতে বলেন। ইয়ারমুকের ময়দানে হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। ৬৩৬ সালের গ্রীষ্মে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইয়ারমুকের ময়দানটি বর্তমান পৃথিবীর মানচিত্র অনুযায়ী জর্ডান ও সিরিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি একটি স্থানে অবস্থিত। বাইজেন্টাইনরা নিজেদের সবটুকু নিয়ে যুদ্ধে আসায় তাদের সেনা সংখ্যা যেমন বেশি ছিল, তেমনি তারা ছিল উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু তাদের নেতৃত্বে অনেক দ্বন্দ্ব থাকায় তারা মনোবলের দিক থেকে ছিল দুর্বল। মুসলিম

সেনাবাহিনী তাদের ওপর পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। বাইজেন্টাইনরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। নতুন করে কোনো ধরনের সামরিক অভিযান চালানোর মতো সক্ষমতা তাদের আর ছিল না। সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হন। কারণ, তার কাছে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো আর্থিক সামর্থ্য বা সেনা মজুদ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। সিরিয়ার সবগুলো শহর তখন একে একে মুসলিমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। দামেস্ক জয় করার পর খালিদ η সেখানকার নাগরিকদের মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য যে অসাধারণ চুক্তি করেছিলেন, এই শহরগুলোর বাসিন্দাদের সাথেও একই ধরনের চুক্তি করা হয়। ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গোটা সিরিয়া মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। এরপর মুসলিম বাহিনী মিশরের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে কিছু সংখ্যক বাইজেন্টাইনের অবস্থান ছিল। মুসলিম সেনারা মিশর জয় করে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে। এভাবে বাইজেন্টাইন পরাশক্তির প্রধান দুটি কেন্দ্র মুসলিমদের হাতে চলে আসে। যা বিশ্বের সর্বত্র মুসলিমদের সামরিক সক্ষমতার জানান দেয়।

এভাবে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সিরিয়া বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক অঞ্চল থেকে ক্রমবর্ধমান ইসলামি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। মুসলিমরা অবশ্য এই বিজয়ে খুব বিস্মিত হয়নি। কারণ, তারা বিশ্বাস করত, যতক্ষণ তারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এবং রাসূল γ প্রদর্শিত বিধানের ওপর অটল থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহ নিশ্চিতভাবে তাদের সাহায্য করবেন। বদর থেকে শুরু করে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনায় তারা এটাই প্রমাণ পেয়েছিলেন। আল্লাহর সাহায্য পেলে তারা যেকোনো প্রতিবন্ধকতাই অতিক্রম করার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। অন্যদিকে, সিরিয়াকে হারিয়ে ফেলাটা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের পতনের চূড়ান্ত ধাপ। এই পরাশক্তি এবং তাদের সেনারা আর কখনও পবিত্র শহর জেরুসালেমের ওপর দিয়ে দম্ভ ভরে চলাচল করতে পারবে না– এটাও তারা উপলব্ধি করেছিল। এই উর্বর এলাকার উপকারিতা ভোগ করার আশাও তারা হারিয়ে ফেলেছিল। অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের কথা যদি বলি– এত বছরের বাইজেন্টাইন শাসনের যে অবসান ঘটেছে, তা মূলত তারা সেভাবে অনুভবই করতে পারেনি। কারণ, মুসলিমদের বিজয়ের পরও তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সেই অর্থে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, প্রভাবও পড়েনি। মুসলিমদের বিজয়ের পরও চার্চগুলো একইভাবে চালু থাকে, কৃষকরাও আগের মতোই কৃষিকাজ অব্যাহত রাখতে পারে। সিরিয়ার ভূমিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন বণিকরা আগে যেমন ব্যাবসায়িক যাত্রা পরিচালনা করত, সেই কার্যক্রমও আগের মতোই অব্যাহত থাকে।

৭০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন রোমান সম্রাট জেরুসালেম থেকে ইহুদিদের নির্বাসিত করে। এরপর থেকে তারা নির্বাসনেই ছিল। ইহুদিরা আবার এই পবিত্র শহরে ফেরার সুযোগ পায় ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে, যখন মুসলিমরা এই শহরটি জয় করে।

বিজয়ের পর এই এলাকার জনপ্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে খলিফা উমর η নিজেই সরাসরি মদিনা থেকে সিরিয়া গমন করেন। এক্ষেত্রে তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ η-কে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেন। তার এ সিদ্ধান্তে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিল, এমনকি খালিদ নিজেও। খালিদ η-কে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পেছনে একটাই কারণ ছিল, তা হলো খলিফা উমর η মুসলিমদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, খালিদের সমর-দক্ষতার কারণে নয়; বরং আল্লাহর সাহায্যের কারণেই মুসলিমরা সকল যুদ্ধে জয় পেয়েছে। তাঁর আশঙ্কা ছিল, যদি মুসলিমরা এই যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব কেবল সেনাপতির ওপর দেয়, তাহলে আল্লাহর ওপর থেকে তাদের ভরসা কমে যেতে পারে। আবার প্রকারান্তরে, সেই সুদক্ষ সেনাপতিকে ছাড়াই যদি তারা যুদ্ধে জয় পায়, তাহলে আল্লাহর সাহায্যের ওপর তাদের আস্থা আবারও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে।

ঠিক একইভাবে যখন সাম্রাজ্যের নতুন এলাকার প্রশাসক নিয়োগ করার বিষয়টা এলো, হযরত উমর গভর্নর হিসেবে কুরাইশ বংশের প্রাক্তন নেতা আবু সুফিয়ানের ছেলে মুয়াবিয়া η-কে দায়িত্ব দিলেন। আমিরে মুয়াবিয়া η ছিলেন কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রের সন্তান। আর উমাইয়া গোত্রই ইসলামপূর্ব আরবে প্রশাসন পরিচালনা করত। তাই পুরোনো অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে মুয়াবিয়া η নিয়োগ পাওয়ার পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে সিরিয়াকে মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করে ফেলতে সক্ষম হন।

সিরিয়ায় থাকা অবস্থায় উমর η ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জেরুসালেমের হস্তান্তরের আয়োজনে শরিক হন। খ্রিষ্টান ধর্মযাজক সফরোনিয়াস এ সময় খলিফা উমর η-কে পুরো জেরুসালেম ঘুরে দেখান, সেসময়ে তিনি ছিলেন জেরুসালেমের গ্রিক চার্চগুলোর শীর্ষ নেতা। সিরিয়ার অন্যান্য শহরগুলো মুসলিমরা জয় করার পর যেরকম চুক্তি হয়েছিল, জেরুসালেমের স্থানীয় নেতাদের সাথেও মুসলিমরা একই ধরনের চুক্তি করেন। জেরুসালেম চুক্তিটি অবশ্য অন্য সব চুক্তি থেকে একটু ভিন্ন ছিল এ কারণে যে, মুসলিমরা এই পবিত্র ভূমি (জেরুসালেম) জয় করার পরই ইহুদিরা প্রায় ৫০০ বছর পরে আবারও সেখানে যাওয়ার ও ধর্মীয় নিদর্শনগুলো পরিদর্শন করার সুযোগ পায়। উল্লেখ্য, আল-কুরআনেও ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়েছে এবং এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে যে পবিত্র গ্রন্থ নাযিল হয়েছিল, সেগুলোকেও ইসলাম আসমানি কিতাব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যদিও গ্রন্থগুলো পরবর্তী সময়ে বিকৃত হয়ে যায়। যেহেতু বাইজেন্টাইন আমলে খ্রিষ্টানরা জেরুসালেম যাওয়ার সুযোগ পেত, আর মুসলিমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয়কেই আহলে কিতাব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তাই ইহুদিদের বঞ্চিত

করা এবং কেবল খ্রিষ্টানদের একতরফা সুযোগ দেওয়াটাকে মুসলিমরা সঠিক মনে করেনি। সকল ধর্মকে সমান সুযোগ দেওয়ার এই বিষয়টি রাসূল γ মদিনা সনদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আর উমর η কেবল সেই ধারাবাহিকতাই রক্ষা করেছেন।

জেরুসালেমে বসবাসরত খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের অধিকার যেমন তিনি নিশ্চিত করেছেন, ঠিক একইভাবে তাদের এই বার্তাও দিয়েছেন, এই শহর শুধু তাদের কাছেই পবিত্র নয়, বরং মুসলিমদের কাছেও একই রকম পবিত্র। ইসলামের ইতিহাসে রাসূল γ-এর মিরাজ যাত্রার ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেই রাতে রাসূল γ মক্কা থেকে সরাসরি জেরুসালেমে আসেন এবং পূর্বসূরি নবি সুলায়মান ν-এর নির্মিত গৃহটিতে নামাজ আদায় করে তারপর ঊর্ধ্বাকাশে গমন করেন। সে কারণে মুসলিমদের কাছেও জেরুসালেমের গুরুত্ব অনেক। এই উপলব্ধি থেকেই উমর η টেম্পল মাউন্ট পরিষ্কার করেন। হাজার হাজার বছর রোমান ও বাইজেন্টাইনরা এই স্থানটিকে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল। এই স্থানেই তিনি মসজিদুল আকসা প্রথম পুনর্নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি মুসলিমদের কাছে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

সিরিয়া বিজয়ের পর খলিফা উমর η এবার সাসানি সাম্রাজ্যের দিকে মনোযোগী হন। সাসানিদের সীমান্ত থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ η তার সব সৈন্য প্রত্যাহার করে সিরিয়ায় নিয়ে এসেছিলেন কয়েক বছর আগে। এরপর থেকে সাসানি নিয়ে মুসলিমরা আর কোনো তৎপরতা চালানোর সুযোগ পায়নি। নবিজি γ-এর আরেক পরীক্ষিত সাহাবি ও সমর বিশেষজ্ঞ সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস η-কে সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে মেসোপটমিয়াতে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন খলিফা উমর η। সাসানিদের হাতে ছিল অসংখ্য হাতি, যেগুলো দিয়ে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করত। আরবরা হাতি সেনাদের সাথে লড়াই করতে অভ্যস্ত ছিল না। তাই প্রথমদিকে তাদের একটু বেগ পেতে হয়। কিন্তু অবশেষে ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কাদিসিয়ার যুদ্ধে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস η-এর নেতৃত্বে মুসলিমরা পারস্য বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। মুসলিম বাহিনী এই যুদ্ধে প্রচুর যুদ্ধবন্দি এবং গনিমত অর্জন করেন। সেগুলোকে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী বিতরণ করার জন্য মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মুসলিমদের যদি গোটা ইরাকের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে তাদের সামনে সাসানি সাম্রাজ্যের রাজধানী জয় করার কোনো বিকল্প ছিল না। এই রাজধানী শহরটি তেমন সুরক্ষিতও ছিল না। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর মাঝামাঝি একটি সমতল এলাকায় প্রাচীন শহর ব্যবিলন থেকে ৬০ কিলোমিটার উত্তরে এই টেসিফন শহরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মুসলিম বাহিনী প্রায় দুই মাস শহরটি অবরোধ করে রাখে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এই শহরটি জয় করতে সক্ষম হয়। ফলে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে মুসলিমদের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাসানি সম্রাট এবং তার কর্মকর্তারা পারস্যের উঁচু এলাকায় পালিয়ে যান। মুসলিমদের এত বড়ো বিজয়ের পরও উমর η তাঁর সেনাবাহিনীকে আদেশ করেন, যেন তারা সাসানিদের ইরাকের বাইরে আর তাড়া করে না বেড়ায়। আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে আগে থেকেই মেসোপটমিয়ার উর্বর অঞ্চল পরিচিত ছিল। তাই এখানে তাদের সামরিক কৌশল নির্ধারণে বেগ পেতে হয়নি এবং তারা যুদ্ধে জয়ী হয়। কিন্তু ইরানের মালভূমি এলাকার ভূখণ্ডের ব্যাপারে তাদের তেমন একটা ধারণা ছিল না। তাই ইরানের ভেতরে সাসানিদের পেছনে অভিযানে গেলে মুসলিমরা সফল না-ও হতে পারে– খলিফা তা জানতেন। এ ছাড়া ইরানের ভেতরকার বেশির ভাগ মানুষই জাতিগতভাবে পারস্য ঘরানার। তাই সেখানে গেলে সাসানি এবং স্থানীয় জনগণ উভয় দিক থেকেই মুসলিমদের বাধা পাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

সাসানিদের একটি প্রতীক ছিল, যা তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের গর্বের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হতো। সাসানিকে যুদ্ধে হারানোর পর তা মুসলিমদের হাতে চলে আসে এবং সেটাকেও মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এটাকে পারসিকদের পরাজিত করার একটি নমুনা হিসেবে সংরক্ষণ করা যেত। কিন্তু তা না করে খলিফা উমর η প্রতীকটাকে ধ্বংস করে ফেলার আদেশ দেন। আর এর সাথে মূল্যবান যে রত্ন পাথর লাগানো ছিল, সেগুলোকে গরিব ও অসহায় মানুষদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়ার আদেশ করেন।

খলিফা হিসেবে হযরত উমর η-এর শাসনামল কেবল সামরিক সফলতার জন্যই স্মরণীয় নয়, বরং প্রশাসক হিসেবেও বিভিন্ন এলাকা যেভাবে তিনি পরিচালনা করেছেন, সেটাও সারা পৃথিবীর জন্য অনুকরণীয় হিসেবে থেকে যাবে। তাঁর অধীন বাহিনীর সফল সামরিক অভিযান এবং নতুন নতুন এলাকাকে ইসলামি সাম্রাজ্যের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনন্যসাধারণ যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হলো, এত বড়ো বিজয়ের পরও সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় খুব একটা পরিবর্তন তারা হতে দেননি। বাইজেন্টাইন ও সাসানি সাম্রাজ্য জয় করার পর সেখানকার সেনাবাহিনী এবং অভিজাত লোকেরা পালিয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের সামান্য পরিমাণও ক্ষতি হয়নি। এসব এলাকার মানুষের জীবনে মূলত বড়ো আকারের দুটি পরিবর্তন হয়েছিল।

প্রথমত, তারা আগে যাদের কর দিত, যুদ্ধ জয়ের পর তারা অন্য একটি শক্তিকে তথা মুসলিম প্রশাসনকে কর দিতে শুরু করে। বরঞ্চ আগে তাদের শোষণ করে অনেক উচ্চ হারে কর আদায় করা হতো, কিন্তু মুসলিমরা তাদের ওপর শরিয়ত অনুযায়ী ন্যূনতম একটি কর ধার্য করে দেয়। এরপর আবার সংগৃহীত সমস্ত করকে পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান ও হিসাবসহ মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো। পূর্ববর্তী শাসনের তুলনায় ধার্যকৃত করের পরিমাণ কম হওয়াটা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই স্বস্তিদায়ক, সেটা যেই সংগ্রহ করুক না কেন।

দ্বিতীয়ত, যে পরিবর্তন তাদের জীবনে আসে তা হলো, ইসলাম আসার পর অন্যান্য সম্প্রদায়কে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা স্রষ্টাকে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করত, তাদের সাথে গ্রিসের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টানদের অনেক ভিন্নতা ছিল। সিরিয়ায় বসবাসরত এই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষগুলো বাইজেন্টাইন আমলে প্রচণ্ডভাবে শোষিত হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম আসার পর তাদের আবার ধর্ম পালনের সুযোগ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। একইভাবে ইহুদিরাও কোণঠাসা অবস্থা থেকে মুক্তি পায় এবং তাদের আবার জেরুসালেম ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়। অন্যদিকে, পূর্ববর্তী সাসানি সাম্রাজ্যে নেসতোরিয়ান খ্রিষ্টানদেরও একঘরে করে রাখা হতো। কারণ, সাসানি প্রশাসকদের ধারণা ছিল, নেসতোরিয়ানরা গোপনে বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। ইসলাম এই নেসতোরিয়ানদেরও ধর্ম পালনের সুযোগ দেয়। নতুন নতুন স্থানগুলো ইসলাম জয় করে নেওয়ার পর সেখানে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে সকল ধরনের উত্তেজনার অবসান ঘটেছিল তেমনটা বলা না গেলেও এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, মুহাম্মাদ γ-এর সাম্য ও মানবাধিকারের বার্তা গোটা মধ্যপ্রাচ্যে সকল ধর্মের সহাবস্থানের একটি পরিস্থিতি তৈরি করে দেয়, যা এসব এলাকায় আগে কখনও ছিল না।

আবার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করলে বলতে হয়, এসব যুদ্ধের বিজয় সাদামাটা আরবদের হাতে অনেক অনেক সম্পদ আর প্রাচুর্য এনে দিলো। হাজার হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং নানারকমের রত্নভান্ডার বিভিন্ন এলাকা থেকে মদিনায় আসতে লাগল। সবচেয়ে বেশি এলো ইরাক জয়ের পর। ইসলামি আইন অনুযায়ী এসব যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত পণ্যের হকদার কোনো একক মুসলিম নয়; বরং গোটা মুসলিম উম্মাহ। তাই এধরনের পণ্য পেলেই সেগুলোকে সমানুপাতে মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হতো। তবে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেত নওমুসলিমরা, বিশেষ করে আরবের বাইরে বিভিন্ন এলাকার নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের এক্ষেত্রে বেশি সুবিধা দেওয়া হতো। মক্কা ও মদিনার অর্থনীতিও দারুণভাবে বিকশিত হয়েছিল। মদিনায় নতুন নতুন বাড়িঘর ও স্থাপনা নির্মিত হলো। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম তখনই একের পর এক যুদ্ধ জয়ের কারণে ইসলামি সরকারের রাজকোষে বিপুল পরিমাণ সম্পদ এসে যুক্ত হয়।

১০ বছরের খিলাফতের সময়ের মধ্যেই উমর η তরুণ ইসলামি রাষ্ট্রকে একটি সুদৃঢ় ক্ষমতাধর শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হলেন। ইসলামি সাম্রাজ্যের এই বিকাশ আরও সহজতর হলো সামাজিক স্থিতিশীলতার কারণে। আর এই দুটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই উমর ফারুক η একজন দক্ষ নেতার পাশাপাশি একজন যোগ্য প্রশাসক হিসেবেও পরিচিত হয়ে উঠলেন। তা ছাড়া এই অর্জনগুলোই তাকে ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম শাসক হিসেবেও বিবেচনা করে।

উমর ফারুক η-এর খিলাফতের সোনালী অধ্যায় আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে যায় ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে। এক পারস্য ক্রীতদাসের আক্রমণে খলিফা উমর η মদিনায় শাহাদাত বরণ করেন। এই ক্রীতদাসটির মনে ব্যক্তিগতভাবে খলিফা উমর η-এর ওপর ক্ষোভ ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্তেও হযরত উমর η তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য তিনি ৬ জন বিশিষ্ট সাহাবি নিয়ে একটি প্যানেল নির্বাচন করে যান। এই প্যানেল থেকেই পরবর্তী সময়ে উসমান ইবনে আফফান η তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তিনিও প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি। তিনি কুরাইশ বংশের অন্তর্গত উমাইয়া গোত্রের মানুষ ছিলেন। এই গোত্রটি ইসলামপূর্ব আরবেও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত। ইসলাম গ্রহণের আগে থেকেই উসমান η ছিলেন বেশ সম্পদশালী। উমর η দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সফল হওয়ায় উসমান η-ও তাঁর নীতিমালা অনুসরণ করে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইসলামের তৃতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

উসমান যিন-নুরাইন η

সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম নেওয়ায় খলিফা হিসেবে উসমান η যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতেন সেখানে তার একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব থেকে যেত। আগেই বলা হয়েছে, ইসলামপূর্ব যুগেও প্রশাসনিক কার্যক্রমে উমাইয়াদের অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। তাই উসমান η তাঁর দায়িত্ব পালনে সেই অভিজ্ঞতাগুলোও কাজে লাগাতেন। তাঁর চাচাতো ভাই মুয়াবিয়া η আগে থেকেই সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মুয়াবিয়া η তার দায়িত্ব পালনে অসামান্য সফলতা অর্জন করেন এবং সিরিয়াকে এরই মধ্যে ইসলামি সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডের অবয়বে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এই সফলতায় উৎসাহিত হয়ে উসমান η তাঁরই সৎ ভাই আবদুল্লাহ ইবনে সাদকে মিশরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। হয়তো তাঁর ধারণা ছিল, উমাইয়া বংশের এই প্রতিনিধি সিরিয়ার মতো মিশরেও দায়িত্ব পালনে একইভাবে সফল হবেন। তাঁর বংশীয় আরও কিছু ব্যক্তি নিয়োগ পায় ইরাকে, যারা পারস্যের ভেতরে প্রবেশ করে বেশ কিছু সামরিক অভিযান চালান এবং আস্তে আস্তে সাসানি সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট এলাকাগুলো জয় করতে থাকেন। ইসলামের ইতিহাসে তখনই প্রথম খলিফার বিরুদ্ধে আত্মীয়করণের কিছু অভিযোগ উঠে। যদিও তা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিকাশের পথে তখনও তেমন একটা অন্তরায় হয়ে ওঠেনি।

খলিফা উসমান η-এর সময়েই চীনে দূত পাঠানো হয় এবং সেখানকার শাসক তাং সাম্রাজ্যের সাথে মুসলিম খিলাফতের একটি চুক্তি সাধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

উমর η-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে উসমান η-ও সামরিক কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব দেন। ফলে তার সময়ে সর্বপ্রথম বাইজেন্টাইনদের সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য মুসলিমদের নৌবাহিনী গঠন করা হয়। সমুদ্রগামী এসব নৌযুদ্ধজাহাজ বানানোর জন্য সিরিয়া ও মিশরের মুসলিম প্রশাসন স্থানীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। খ্রিষ্টান কারিগররা ইতিপূর্বে বাইজেন্টাইনদের আদেশে এই কাজগুলো করত। এবার মুসলিম শাসকরা তাদের একই কাজ দেওয়ায় তারা বেশ উৎসাহী হয়ে কাজগুলো করে যাচ্ছিল। বিশেষ করে, কপটিক চার্চ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান সম্প্রদায় এই কাজে বেশি তৎপর ছিল। কারণ, মুসলিমরাই তাদের সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে, এর আগে বাইজেন্টাইন আমলে তারা মোটেও মূল্যায়ন পেত না। বাইজেন্টাইনদের তুলনায় মুসলিমদের কাছে বেশি সম্মান পাওয়ায় তারা মুসলিম খিলাফতের প্রতি অনেক বেশি সন্তুষ্ট ও অনুগত ছিল। এ কারণে সমাজে ছিল স্থিতিশীলতা এবং তারা নিজেরাই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে তৎপর ছিল। পরবর্তী সময়ে এটার সত্যতাও মেলে। কারণ, যখন বাইজেন্টাইনরা দু-একবার মুসলিম সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল, তখন নদীর পাড়ে বসবাসরত খ্রিষ্টানরাই তাদের শক্তভাবে প্রতিহত করেছে।

এভাবে সীমান্ত স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে সুরক্ষিত হওয়ায় মুসলিম সাম্রাজ্য অনেকটা স্বস্তিতে ছিল। ফলে তারা ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় নৌপথে নতুন অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিমরা এই পথ ধরেই সাইপ্রাস ও ক্রিট দখল করে একেবারে সিসিলি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্থলপথেও মুসলিমদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া η তাঁর বাহিনী নিয়ে আর্মেনিয়ায় অভিযান চালান এবং বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। বর্তমানে ভৌগোলিকভাবে সিরিয়া আর তুরস্কের যে অবস্থান, তার মাঝামাঝি ছিল আনাতোলিয়া মালভূমি। তখনকার সময়ে এখানে গ্রিক বংশোদ্ভূত মানুষজন বসবাস করত। ফলে এই এলাকাটি বাস্তবিক কারণেই বাইজেন্টাইন আর মুসলিমদের মধ্যে একটি বিভাজন রেখা হিসেবে কাজ করত। অন্যদিকে, পূর্বদিকে মুসলিমরা পারস্যের আরও ভেতরে অভিযান চালাতে সক্ষম হয়। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন খলিফা উসমান η-এর আরেক আত্মীয় আবদুল্লাহ ইবনে আমির। তবে ইরাকে যত সহজে মুসলিমরা জয় পেয়েছিল, সাসানি সাম্রাজ্যের বাকি অংশ জয় করা ততটা সহজ হয়নি, আর এই যুদ্ধটি বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল। কারণ, এই এলাকার সমাজটা ছিল আরও বেশি একতাবদ্ধ ও সাসানি প্রশাসনের প্রতি অনেক বেশি অনুগত। ফলে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অন্য সময়ের তুলনায় ছিল বেশি।

যাহোক, উমর η-এর সময়ে কাদিসিয়ার যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর সাসানিদের পতনভাগ্য মোটামুটি নির্ধারিতই হয়ে যায়। তাই সাম্রাজ্যের বাকি অংশের পরাজয় ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। ৬৪২ সালের যুদ্ধে যে পরিমাণ সেনা সাসানিরা সমবেত করেছিল, সম্রাট ইয়াজদিগার্দ সেই পরিমাণ সেনা আর কখনও জমায়েত করতে পারেননি। কাদিসিয়ার যুদ্ধের পরের ১০ বছরও সাসানিরা বহুবার ছোটোখাটো যুদ্ধে ও অভিযানে পরাজয় বরণ করে। ৬৫০ সালে ইরানের একটি বড়ো অংশ মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আর ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমরা খোরাসানও জয় করতে সক্ষম হয়। সেই বছরই পলাতক অবস্থায় সাসানি সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ধরা পড়েন এবং নিহত হন। এভাবে এক দশকের ব্যবধানে মুসলিম বাহিনী ইরাক থেকে অক্সাস নদীর অববাহিকা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

তবে খলিফা হিসেবে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিকাশ ঘটিয়ে উমর η যেরকম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, এবার খলিফা উসমান η তুলনামূলক ততটা পাননি; বরং বিভিন্ন জায়গায় তাঁর প্রশাসনিক নীতির বিরুদ্ধে, বিশেষত বেশ কিছু বড়ো দায়িত্ব উমাইয়া গোত্রের সদস্যদের দেওয়ায় নানাভাবে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। অন্যদিকে, যুদ্ধ জয়ের পরিমাণও খলিফা উমর η-এর তুলনায় কমে যাওয়ায় মদিনার রাজকোষে যুদ্ধ-পণ্য আসার পরিমাণও কমে যায়। মদিনার অর্থনীতিও পূর্বের তুলনায় হয়ে পড়ে কিছুটা স্থবির। খলিফা উসমান η পূর্বসুরি দুই খলিফার তুলনায় কিছুটা কম জনপ্রিয় হলেও অজনপ্রিয় ছিলেন তেমনটাও নয়; তাকে দায়িত্ব থেকে সরানোর জন্য অনেক বড়ো কোনো বিদ্রোহও সংঘটিত হয়নি; বরং খুবই অল্প সংখ্যক বিদ্রোহী সহিংস হয়ে ওঠে এবং মদিনার সরকারের বিরুদ্ধে অশান্তি সৃষ্টি করে।

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা উসমান η-এর বেশ কিছু নীতি-কৌশলের প্রতিবাদ করার জন্য মিশর থেকে একদল সেনা মদিনায় আসে এবং মিশরে যেভাবে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে তার সমালোচনা করে। খলিফা তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দেন। তারা যখন মিশরে ফিরে যাচ্ছিল তখন তাদের হাতে একটি চিঠি চলে আসে। চিঠিটা মিশরের গর্ভনরকে উদ্দেশ্য করে লেখা এবং সেই চিঠিতে গর্ভনরকে মদিনায় আগত সেনাদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর এই সৈন্যরা ধরে নেয় যে, খলিফা নিজেই চিঠিটা লিখেছেন। তাই তারা আবার মদিনায় ফিরে আসে এবং খলিফার বাড়ি ঘেরাও করে অবস্থান নেয়। নিজের মৃত্যুর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এই অবরোধের ভেতরে থেকে খলিফা উসমান η একবারের জন্যও মদিনার মানুষকে এই বিদ্রোহী সেনাদের অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিহত করার আদেশ দেননি। এমনকি সিরিয়ায় গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনরত চাচাতো ভাই মুয়াবিয়া η-কেও তিনি সাহায্য করার বা সেনা পাঠানোর কোনো অনুরোধ করেননি। তিনি আসলে চাইছিলেন, যাতে রাসূল γ-এর শহরে অযাচিত কোনো রক্তপাত না হয়। রাসূল γ-এর যে সাহাবিরা তখনও জীবিত ছিলেন, তারা এই বিদ্রোহ মানতে পারছিলেন না, কিন্তু এটাকে দমন করার মতো সামর্থ্য তাদের ছিল না। মদিনায় সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীরা শুধু অসহায় হয়ে প্রত্যক্ষ করল যে, কীভাবে বিদ্রোহীরা তাদের খলিফার বাড়িতে ঢুকে তাকে হত্যা করল। তারা এমন অবস্থায় খলিফাকে হত্যা করল, যখন

তিনি নিবিষ্ট মনে কুরআন পড়ছিলেন। বিদ্রোহীদের হামলায় খলিফা শহিদ হয়ে গেলেন আর মুসলিমদের মধ্যে এতদিন ধরে রাখা একতাও এবার বিনষ্ট হয়ে গেল।

আলী ইবনে আবু তালিব η

বিদ্রোহীরা উসমান η-কে হত্যা করার পর নিজেদের মুসলিম সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক মনে করে বসল। এবার তারা নতুন একজন খলিফা নিয়োগ করার প্রস্তাব করল। হযরত আলী η এক্ষেত্রে ছিলেন সর্বোত্তম পছন্দ। যে কয়জন সাহাবি তখনও জীবিত ছিলেন, তার মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সম্মানীয়। অন্যদিকে, তিনি রাসূল γ-এর সাথে দুই দিক থেকে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূল γ-এর আপন চাচাতো ভাই এবং জামাতা। আলী η ন্যায়বিচার ও সম্মানের প্রতীক হিসেবে সর্বত্র ছিলেন সুপরিচিত। তাই তাকে যখন বিদ্রোহী সেনারা খলিফা হিসেবে নিয়োগ করতে চাইল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ, এরা পূর্বসূরি খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু মদিনায় আরও যে সাহাবিরা ছিলেন এবং সেই সাথে মদিনার গণ্যমান্য লোকজন তখন আলী η-এর কাছে গিয়ে তাকে অনুরোধ করলেন, যাতে তিনি খলিফা হিসেবে দায়িত্ব নেন। সেই মুহূর্তে এই দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য তিনি ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য আর তিনিই হলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মুসলিম বিশ্বে আবারও শান্তি ফিরিয়ে আনার সামর্থ্য রাখেন।

সত্যি কথা হলো, পরিস্থিতি যে জায়গায় চলে গিয়েছিল, তাতে কারও জন্যই মুসলিম বিশ্বকে আবার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারাটা সহজ ছিল না। হযরত আলী η দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল উসমান η-এর হত্যাকারীদের বিচার করা। বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে জনগণের জোর দাবিও ছিল। মুয়াবিয়া η ঘোষণা দিলেন যে, তিনি নতুন খলিফার কাছে শপথ নেবেন না, যতক্ষণ না তিনি পূর্বসূরি খলিফা এবং তার চাচাতো ভাই উসমান η-এর হত্যাকারীদের বিচার না করেন। কিন্তু আলী η ছিলেন তাঁর পূর্বসূরি খলিফাদের মতোই বিচক্ষণ। তিনি জানতেন, তিনি যদি তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্রোহীদের বিচারের উদ্যোগ নেন, তাহলে এর প্রতিদান হিসেবে হয়তো তাকেও জীবন দিতে হবে। কারণ, মদিনা তখনও অবধি এই বিদ্রোহীরাই নিয়ন্ত্রণ করছিল। আর তেমনটা হলে মুসলিম বিশ্বে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবে রক্তপাত ছড়িয়ে পড়বে, যা হযরত আলী η-ও ভীষণভাবে এড়াতে চাইছিলেন। এর বদলে তিনি ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানী নিয়ে গেলেন ইরাকের কুফায়, যেখানে তাঁর জন্য পরিবেশ কিছুটা অনুকূল ছিল। মদিনার অনেকেই আলী η-এর এই সিদ্ধান্তে এবং উসমান হত্যার বিচারে বিলম্ব করায় হতাশ হয়ে পড়েছিল। এমনকি আলী η-এর ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য তারা একটি বাহিনীও গঠন করলেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন রাসূল γ-এর সাহাবি তালহা ও যুবায়ের η এবং উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ι।

নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে আলী η কিংবা তাঁর প্রতিপক্ষের নিয়ত কী ছিল বা কোন প্রেক্ষাপটে তারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা আমাদের পক্ষে মূল্যায়ন করা কঠিন। কারণ, উভয় পক্ষেই রাসূল γ-এর বেশ কয়েকজন সাহাবি ছিলেন এবং তারা বেশ ভালোভাবেই জানতেন, মুসলিমদের মধ্যে এধরনের আত্মসংঘাতের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে। এরপরও উভয়পক্ষই নিজেদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করেই অগ্রসর হয়েছিলেন। কারণ, বিদ্রোহীদের দমনে তাদের কাছে সেটাই সর্বোত্তম কৌশল হিসেবে তখন বিবেচিত হয়েছে। আলী η অবশ্য তাঁর প্রতিপক্ষকে কোনো ধরনের শাস্তি দিতে বা বলপ্রয়োগ করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি যেকোনো মূল্যেই মুসলিম উম্মাহর একতা ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে, আলী η-এর প্রতিপক্ষ ভেবেছিলেন, উম্মাহর একতা কখনও সম্ভব হবে না, যদি পুরোনো ভুলগুলো সংশোধন করা না হয় এবং বাড়ি ঘেরাও করে উসমান η-কে হত্যার মাধ্যমে যে জঘন্য অন্যায় বিদ্রোহীরা করেছে তার প্রতিকার না করা হয়। উভয়পক্ষের যুক্তিতেই হয়তো সত্যতা আছে, কিন্তু বাস্তবতা ছিল এই যে, খলিফা উসমান η-এর শাহাদাতের ঘটনায় মুসলিম উম্মাহ যেভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তার সমাধান করা অনেকটা অসম্ভবই হয়ে পড়েছিল। বিভক্তি আর বিভাজন তাই অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই সামনে চলে আসে।

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে উভয়পক্ষের সেনারা দক্ষিণ ইরাকের কাছাকাছি বসরা নামক এলাকায় সমবেত হয়। যুদ্ধের আগ মুহূর্তেও উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবি মিলিত হন। তালহা ও যুবায়ের η খলিফা আলী η-এর সাথে দেখা করেন, যাতে যেকোনো মূল্যেই রক্তপাত এড়ানো যায়। সকলে মিলে একধরনের সমঝোতায় পৌঁছতেও সক্ষম হন তাঁরা। কারণ, বাস্তবতা হলো– বিশিষ্ট সাহাবিদের কেউই আসলে চাচ্ছিলেন না যে, রাসূল γ-এর ওফাতের মাত্র দুই দশক পেরুনোর পরপর মুসলিমদের মধ্যে এত বড়ো কোনো আত্মঘাতি রক্তপাতের ঘটনা ঘটুক। কিন্তু দুই দলের তৃণমূলে উগ্রপন্থি কিছু সেনা ছিল, যারা যুদ্ধের ময়দানেই এই সমস্যার ফয়সালা করতে ছিল অতি উৎসাহী। এমনই কিছু সেনার উসকানিতে উভয়পক্ষের সেনারা জড়িয়ে পড়ল যুদ্ধে। দু পক্ষের উসকানিদাতারাই একে অপরকে আগে যুদ্ধ শুরু করার দায়ে অভিযুক্ত করছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধটি জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এতে উভয়পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। তালহা ও যুবায়ের η এই যুদ্ধে শহিদ হন। আয়িশা ι ও আলী η উভয়ই যুদ্ধের ময়দান থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। তবে তাদের দুজনের মনই মুসলমানদের এ পরিণতি ও অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি দেখে ভেঙে যায়। আলী η স্বয়ং উম্মুল মুমিনিন আয়িশা η-এর নিরাপত্তার জন্য একটি বাহিনী তৈরি করে দেন, যারা তাকে নিরাপদে মদিনায় নিয়ে আসে। এই যুদ্ধের পর আয়িশা ι সব ধরনের রাজনৈতিক

কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকালের আগপর্যন্ত তিনি আর কখনোই রাজনীতিতে বা প্রশাসনিক কোনো কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হননি।

অন্যদিকে, বিপুল এই রক্তপাতের পরও আলী η-এর খিলাফত সুরক্ষিত হয়নি। উষ্ট্রের যুদ্ধে মুয়াবিয়া η কোনো পক্ষেই তার সমর্থন না দিয়ে নীরব ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পরও তিনি তার আগের অবস্থানে অটল থাকেন এবং তার চাচাতো ভাই ও পূর্বসূরি খলিফা উসমান η-এর হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত খলিফা আলী η-এর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেন। ইসলামি সাম্রাজ্যের তৎকালীন কাঠামোতে সিরিয়ার অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সিরিয়ার গভর্নরের সহযোগিতা না পাওয়ায় খলিফা আলী η-এর কাজ করতে বেশ অসুবিধাই হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও তিনিও তাঁর অবস্থানে বহাল থাকেন। তাঁর মত ছিল সাম্রাজ্যের যে পরিস্থিতি, তাতে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়াই একমাত্র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইস্যু নয়। আর এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করা এখন খুব একটা সহজও নয়। তারপরও তিনি মুয়াবিয়া η-এর সাথে বসে এই সমস্যার একটি সমাধান করতে উদ্যোগ নিলেন। ৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এই দুই পক্ষ ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি স্থানে বৈঠকে মিলিত হলেন।

সে সমঝোতায় কী হয়েছিল কিংবা তার প্রতিক্রিয়াই বা কী? এটা আসলে ইতিহাসের নানা বর্ণনায় পরবর্তী সময়ে যেভাবে উঠে এসেছে সেখান থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া কঠিন। তবে এমন একটা ধারণা পাওয়া যায়, সে আলোচনা থেকে এরূপ একটি চিন্তা এসেছিল যে, মুয়াবিয়া ও আলী η উভয়কেই তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে এবং নতুন করে কাউকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করা হবে। এই চিন্তাটি যখন দুই নেতার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন আলী η-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর কিছু সদস্য তা মানতে অস্বীকার করে। তারা চিৎকার করে বলে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তারা আলী η-এরও সমালোচনা শুরু করে। কেননা, তিনি এই সমঝোতা মেনে নিয়েছিলেন। তারা বলে, মানুষ মাত্রই ভুল করে। আর তার প্রমাণ বর্তমান খলিফা। তাদের এই চরমপন্থি চিন্তাধারা নতুন আরেকটি রাজনৈতিক ধারার সূচনা করে। এরপর তারা আলী η-এর বাহিনী থেকে বের হয়ে যায়। নতুন এই ধারাটি খারিজি ('খারিজি' আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো– যারা বের হয়ে গেছে) হিসেবে পরিচিত হয়।

এরপর থেকে এই খারিজিরা ইরাকের বিভিন্ন স্থানে নৈরাজ্য শুরু করে। তাদের চিন্তাধারার সাথে যে-ই দ্বিমত করত তাদেরই তারা হত্যা করত। অন্যদিকে, মুয়াবিয়া η-এর সাথে হওয়া সমঝোতাটি প্রকৃতপক্ষে কার্যকর না হওয়ায় আলী η-ও আগের মতোই দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। যেহেতু ইসলামের ইতিহাসে তাঁরই খিলাফতের সময় একটি গ্রুপ ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল এবং এরা ইতিপূর্বে তাঁরই সমর্থক ছিল, তাই তিনি খারিজিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে ৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মে খারিজিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলেন। সে যুদ্ধে খারিজিদের মূলধারাকে তিনি ধ্বংস করতেও সক্ষম হন। এরপর থেকে খারিজিদের খুব ছোটো একটা অংশ সক্রিয় থাকে।

খারিজিরা মনে করত– উম্মাহর যে সংকট, তার সমাধানের জন্য আলী ও মুয়াবিয়া η-কে হত্যা করা প্রয়োজন। সে উপলব্ধি থেকেই একজন খারিজি আততায়ীকে দামেস্কে পাঠানো হয় আমিরে মুয়াবিয়া η-কে হত্যা করার জন্য। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। একই সময়ে আলী η-কে হত্যার জন্যও আরেক আততায়ীকে পাঠানো হয়। এই হত্যা মিশনটি বাস্তবায়িত হয়। খলিফা আলী η কুফার মসজিদে তখন ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। হত্যাকারী আততায়ী তাকে বেশ কয়েকবার ছুরিকাঘাত করে। হযরত আলী η শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতে মুসলিম খিলাফত নতুন করে বিরাট এক সংকটে পড়ে যায়। মুসলিমদের এরপর কে নেতৃত্ব দেবে তা নিয়েও নানামুখী আশঙ্কা তৈরি হয়। তখন তাদের সামনে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ ছিলও না। কিছুটা যোগ্যতা বা সক্ষমতা তখন একজন মানুষের হাতেই ছিল, আর তিনি হলেন আমিরে মুয়াবিয়া η।

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

খারিজিদের হাতে আমিরুল মুমিনিন আলী η-এর নির্মম শাহাদাত এবং পরবর্তীকালে খিলাফতের দায়িত্বে যখন মুয়াবিয়া η ছাড়া আর কারও নাম আসার মতো পরিস্থিতি থাকল না, তখন থেকেই মূলত খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের অবসান হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। ৬৬১ থেকে ৬৮০ সাল পর্যন্ত মুয়াবিয়া η শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য এবং সমাজ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে

যায়। তিনি যখন দায়িত্ব নেন, তখন মিশর থেকে শুরু করে ইরান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি আর বিভাজন ছড়িয়ে পড়েছিল। সে বিভাজন আরও নেতিবাচক হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যকে সামগ্রিকভাবে চূড়ান্ত পতনের দিকে নিয়ে যেতে পারত। আমিরে মুয়াবিয়া η-এর রাজনৈতিক দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রভাব সে পতনের হাত থেকে মুসলিমদের রক্ষা করেছিল। কিন্তু একইসঙ্গে এটাও সত্য, তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বিতর্কের সূচনা করেছিল। যা থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফাটল ধরে যায় এবং তা আজও অব্যাহত রয়েছে। আমিরে মুয়াবিয়া η-এর শাসন থেকে উমাইয়া খিলাফতের সূচনা হয়, যে ব্যবস্থায় পরবর্তী শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে পারিবারিক উত্তরাধিকারী হওয়াটাই একমাত্র যোগ্যতা বা মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যায়। উমাইয়া খিলাফত ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর শুরু হয় মক্কার আরেক পুরোনো প্রভাবশালী গোত্র আব্বাসীয়দের নেতৃত্বে আব্বাসি খিলাফত।

আমিরে মুয়াবিয়া η

এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, খলিফা আলী η এবং আমিরে মুয়াবিয়া η-এর মধ্যে বেশ কয়েকবার সমঝোতা উদ্যোগ নেওয়া হলেও কার্যত তা সফল হয়নি। আলী η-এর শাসনামলের শেষ সময়ে এই দুই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মাঝে অনেকটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। আলী η-এর শাহাদাতের পর তাঁর আওতাধীন এলাকাকেও নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া η-এর সামনে কোনো বাধা ছিল না। প্রকৃত বাস্তবতাও এমনই ছিল, এই বিশাল কাজটি সে সময়ে করার জন্য তিনি তখন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

আমিরে মুয়াবিয়া η উমাইয়া খিলাফতের সূচনা করার আগেই দীর্ঘ ২০ বছর সিরিয়াতে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি সিরিয়াতে ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। দীর্ঘ সময় গভর্নর হিসেবে কাজ করার সুবাদে তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীও গঠন করতে সক্ষম হন, যা গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। তার যে কিছু প্রতিপক্ষ ছিল না, তাও নয়। বিশেষ করে আলী η-এর বড়ো ছেলে হাসান η-কে তিনি প্রতিদ্বন্দী বিবেচনা করতেন। কেননা, ইরাকে তখনও হাসান η-এর জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক এবং তাকে খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সেখানকার জনগণের পক্ষ থেকে চাপও ছিল। তবে মুয়াবিয়া η রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বেশ অভিজ্ঞ ও দক্ষ হওয়ায় তিনি খিলাফত নিয়ে মুসলিমদের নিজেদের ভেতরে আর কোনো যুদ্ধ শুরু করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই প্রতিপক্ষকে দমাতে নতুন করে কোনো সামরিক অভিযান শুরু না করে তিনি হাসান η-এর সাথে একটি সমঝোতায় উপনীত হলেন। এই সমঝোতা অনুযায়ী হাসান η কখনোই আর নেতৃত্বের দাবি করবেন না; বরং তিনি মক্কায় গিয়ে একজন আলিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই সমঝোতা হয়ে যাওয়ার পরও অনেকের মনের চাওয়া ছিল, আলী η-এর পরিবার থেকেই যেন কেউ খলিফা হয়। তবে তা সেভাবে প্রকাশ্যে না আসায় মুয়াবিয়া η-এর শাসনের জন্য চূড়ান্ত হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়নি।

ডোম অব দ্যা রক ৬৯০-এর দশকে জেরুসালেমে মসজিদুল আকসার অংশ হিসেবে নির্মাণ করা হয়। এটার নকশা প্রাথমিকভাবে বাইজেন্টাইনরাই করেছিল। আর স্থানীয় খ্রিষ্টানরা এর কারিগরি কার্যক্রম সম্পাদন করে।

আমিরে মুয়াবিয়া η তাঁর অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সাথেও একইভাবে সমঝোতা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই মুয়াবিয়া η-এর শাসন কৌশলটি ছিল ইসলামপূর্ব আরবের গোত্রপ্রধানদের মতো। তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিরাট পরিমাণ উপহার-সামগ্রী ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতেন। নিজের যৌবনে মক্কায় থাকা অবস্থায় তিনি তাঁর পিতা ও তৎকালীন কুরাইশ নেতাদের যেভাবে কাজ করতে দেখেছেন, সেটা তাকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি হলেন প্রথম মুসলিম শাসক, যিনি সিংহাসনে আরোহন করেন এবং সম্ভাব্য আততায়ীর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য মসজিদে সুরক্ষিত স্থানে আলাদাভাবে নামাজ পড়তে শুরু করেন। পূর্বসূরি খলিফাদের মতো অনাড়ম্বর জীবনযাপন তিনি করতে পারেননি; বরং তাঁর আমলেই রাজদরবার ও এ সংক্রান্ত আচারাদি শুরু হয়, যা ইতোপূর্বে সাসানি ও বাইজেন্টাইনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

রাসূল γ-এর ওফাতের পর প্রথম ৩০ বছর যে খিলাফত ছিল, তা যথাযথভাবে সাম্যের নীতি বহাল রাখতে সক্ষম হয়। তৎকালীন সময়ে মানুষের মুখে মুখে প্রথম চার খলিফার সাধাসিধে জীবনের গল্প প্রচলিত ছিল। যেমন, খলিফা উমর η-কে অনেকেই সাধারণ মানুষ ভেবে ভুল করত; তিনি যে রাষ্ট্রপ্রধান তা বাইরের কেউ দেখে বুঝতেই পারত না। উমর η কোনো নিরাপত্তারক্ষীর সুবিধাও নিতেন না। মুয়াবিয়া η ছিলেন তাঁর পূর্বসূরিদের সরল জীবন আর উত্তরসূরিদের রাজতান্ত্রিক বিলাসিতার মাঝামাঝি একটি অবস্থানে। তিনি যেমন দামেস্কের রাস্তায় সাধারণ পোশাক পরিধান করে ঘুরেছেন, আবার তাঁরই আমলে স্থপতিরা অনেক বিলাসিতার সাথে শহরে মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করার সুযোগও পেয়েছেন।

মুসলিমদের মধ্যকার বিভাজন এড়ানোর প্রয়াস হিসেবে আমিরে মুয়াবিয়া η সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারের উদ্যোগ নিলেন। উমর η-এর নীতি অনুসরণ করে তিনি বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে স্থল ও নৌপথে সামরিক অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখলেন।

উসমান η যে নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন তাকে কাজে লাগিয়ে তিনি এজিয়ান সাগরের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দ্বীপ রোডস এবং ক্রিট জয় করলেন। এসব বিজয়কে পুঁজি করে মুসলিমরা প্রথমবারের মতো বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করতে সক্ষম হয়। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এই শহরটির প্রতি মুসলিমদের আগ্রহ ছিল। রাসূল γ মুসলিম সেনাবাহিনীর কনস্টান্টিনোপল জয়ের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে যান। ৬৭৪ সালে মুসলিমরা প্রথমবারের মতো এই শহরের দোরগোড়ায় পৌঁছায়, তখনই মনে হয়েছিল যে, সেই পবিত্র ভবিষ্যদ্‌বাণী বোধ হয় দ্রুতই সত্য হতে যাচ্ছে। কিন্তু তখন তা হয়নি।

৬৭৪-৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে রাখে। কিন্তু সঠিক প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায় তারা সফল হতে পারছিল না। বরঞ্চ এই অবরোধ করতে গিয়ে তাদের বড়ো যে সম্পদ হারাতে হয় তা হলো, রাসূল γ ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রবীণ সাহাবি, যার বাড়িতে মদিনায় হিজরতের পর রাসূল γ আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই আবু আইউব আনসারি η এই সময় ইন্তেকাল করেন। কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের চারপাশের দেওয়াল বেষ্টনীর কাছেই তাকে সমাহিত করা হয়। এই ঘটনার প্রায় ৮০০ বছর পর অটোম্যান সেনারা চূড়ান্তভাবে কনস্টান্টিনোপল শহরের এই দেওয়ালকে গুঁড়িয়ে দিয়ে শহরে প্রবেশ করে এবং বহুল আকাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করে।

মুসলিম সাম্রাজ্য উত্তর আফ্রিকাতেও একইভাবে বিকশিত হয়। বাইজেন্টাইনরা তখনও মধ্য লিবিয়ার বিশাল একটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করত। অন্যদিকে, উমাইয়া সেনারা মিশরের পশ্চিমের বিরাট ভূখণ্ডে ইতোমধ্যে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। সে অংশের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রাসূল γ-এর সাহাবি উকবা ইবনে নাফি η। উকবা η-কে ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাইজেন্টাইন নিয়ন্ত্রিত আফ্রিকান এলাকাগুলোর দিকে অগ্রসর হতে বলা হয়। উকবার সেনাবাহিনীতে ছিল প্রায় ১০ হাজার অশ্বারোহী সেনা, সঙ্গে আরও ছিল স্থানীয় বার্বার গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য। বার্বাররা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। বাইজেন্টাইনরা তখনও তাদের সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় বেশি সচেষ্ট থাকায় উকবা ইবনে নাফি η বর্তমান তিউনিশিয়া পর্যন্ত বেশ সহজেই পৌঁছে যান। সেখানে তিনি সামরিক শহর (ক্যান্টনমেন্টের মতো) কেরাওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি একটু বিরতি নেন। কেননা, আরও পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতে গেলে বাইজেন্টাইনদের পাশাপাশি স্থানীয় বার্বারদের একটি অংশ তাদের জন্য বাধা হিসেবে দেখা দিত। ৬৭৫ থেকে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উকবা η-কে নতুন করে আফ্রিকান শহর ইফরিকায়ার গর্ভনর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অবশেষে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর আফ্রিকায় উমাইয়া সেনাবাহিনী বেশ শক্তিশালী অবস্থান নেয়। ফলে তারা আধুনিক তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া এবং মরক্কোতে অভিযান পরিচালনার সাহস করে। এই অঞ্চলটি তখন মাগরিব হিসেবে পরিচিত ছিল। সামরিক অভিযানগুলো পরিচালনার সময়ে উকবা η যে ঐতিহাসিক ও সাহসী ভূমিকা পালন করেন, সে কারণে আজও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম জনগোষ্ঠী তাকে কিংবদন্তী হিসেবে স্মরণ করে।

৬৮০ সালে কেরাওয়ান ছেড়ে উকবার নেতৃত্বাধীন সেনারা বেরিয়ে মরুভূমির ভেতর দিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় পর্বত এলাকায় পৌঁছে। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে কয়েক হাজার কিলোমিটার এলাকা মুসলিমরা খুব সহজেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, যদিও তখন তাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তির সংকট বিদ্যমান ছিল। মুসলিমরা এত সংকটের পরও কীভাবে এত সফলতা পেল, এটা বলতে গিয়ে বিশ্লেষকরা বলেন– উত্তর আফ্রিকায় বাইজেন্টাইনের শাসন থাকলেও সেখানকার মানুষের ভাষা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বাইজেন্টাইন শাসকদের চেয়ে পুরোপুরি ভিন্ন হওয়ায় তারা কখনোই সে শাসনকে সত্যিকার অর্থে ধারণ করেনি। বাইজেন্টাইনের অধীনে থেকেও বার্বাররা পৃথক একটি জাতিসত্তা নিয়েই বিকশিত হয়েছে বরাবরই। বার্বাররা মরুভূমিতে জীবনযাপনে অভ্যস্ত, অনেকটা আরব বেদুইনের মতো। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে গ্রিক ভাষার কোনো মিল ছিল না, যদিও গ্রিক ভাষাতেই বাইজেন্টাইনরা প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করত। সাংস্কৃতিক কোনো সাদৃশ্য না থাকায় শাসকেরা কখনও জনগণের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি; একধরনের সামাজিক দূরত্ব সব সময় বিরাজমান ছিল। বার্বাররা শত চেষ্টা করেও বাইজেন্টাইনদের আপন করে নিতে পারেনি।

বার্বারদের মুসলিম সেনাবাহিনীকে সমর্থন করার পেছনে ধর্মীয় ফ্যাক্টরটা অন্যতম একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলিম সেনাবাহিনী বার্বার এলাকায় পৌঁছানোর পরপরই বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামকে বরণ করে নেয়। এর কারণ ছিল, বাইজেন্টাইন আমলে ক্রিশ্চিয়ান ইস্যুতে বাইজেন্টাইনের মূলধারার সাথে উত্তর আফ্রিকার মানুষগুলোর আগাগোড়াই বিরোধ ছিল। তারা সকলেই খ্রিষ্টান হলেও ঐশ্বরিক বিষয়াদি এবং তার সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে তাদের মতপার্থক্য ছিল বিস্তর। বাইজেন্টাইনরা খ্রিষ্টবাদের যেই দর্শনকে অন্ধভাবে ধারণ করত, তা প্রত্যাখ্যান করে এরিয়ানিজম ও ডোনেটিজম নামে বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ধারাও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অনেক স্থানে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। হয়তো এসব কারণেই উত্তর আফ্রিকার মানুষ ইসলামের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই বলে তারা সবাই যে একেবারে শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাও নয়। মুসলিমরা আফ্রিকায় পৌঁছে যাওয়ায় বার্বাররা বাইজেন্টাইনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার একটা সুযোগ পেয়েছিল, এটা ঠিক। আর সে কারণেই উকবা ইবনে নাফি η-এর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের পর বেশ তড়িৎ গতিতে উত্তর আফ্রিকার অনেকটুকু জয় করে আটলান্টিকের উপকূল ঘেঁষে মরক্কোর কাছাকাছি চলে যেতে পেরেছিল। উকবা η-এর একটি বিখ্যাত উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি যখন জয় করতে করতে সাগর তীরে পৌঁছে যান, তখন ইসলামের প্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়ে

তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, যদি সাগরের পানি আমার সামনে এসে না পড়ত, তাহলে আমি আলেকজান্ডার দি গ্রেটের মতো বিজয়যাত্রা নিয়ে ওপারেও পৌঁছে যেতাম। সেখানেও আপনার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতাম আর অবিশ্বাসীদের পরাজিত করতাম।"

এই কথাটি তিনি আসলেই হুবহু এমন বলেছিলেন কিনা বা এর তথ্যসূত্র কতটুকু বিশ্বস্ত– সেটা বিবেচনায় নেওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কথার গভীরতা অনুভব করা। ভেবে দেখুন, কতটা বীরোচিত মানসিকতা নিয়ে তৎকালীন মুসলিম সেনাপতিরা দায়িত্ব পালন করতেন। হয়তো এরকম মানসিকতা থাকার কারণেই তারা তখন মাগরিব জয় করেছিলেন, আর আমরা তা হারিয়ে ফেলার কারণে এখন পদে পদে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছি।

উত্তরাধিকার নিয়ে সংঘাত

আমিরুল মুমিনিন আলী η-এর শাহাদাতের পর উদ্ভূত সমস্যা অনেকটা সমাধান করে মুসলিম উম্মাহকে একটি একক নেতৃত্বের আওতায় আনার চেষ্টা করে মুয়াবিয়া η সফল হয়েছিলেন। কিন্তু বিতর্ক সৃষ্টি হয় একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ায়। যার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে ইসলামের ইতিহাসে ছিল না। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে পরবর্তী ১৩শ বছরের ইসলামি সাম্রাজ্যের কাঠামো পালটে যায়। তিনি ইন্তেকালের পূর্বেই তাঁর ছেলে ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে যান এবং তৎকালীন দামেস্কের গণ্যমান্য সবাইকে ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করতে অনেকটা বাধ্য করেন।

ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ অবশ্য মুয়াবিয়া η-এর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তারা মনে করেন, ইয়াজিদের সম্ভাব্য শত্রুতা কমানোর জন্যই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তা ছাড়া সেই সময়ের সার্বিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিলে সন্তানকে উত্তরাধিকার বানানোর বিষয়টা উপলব্ধি করা সহজ হয়। মুয়াবিয়া η-এর সময়ে খিলাফতের সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় ছিল রাজনৈতিক একতা ও সহাবস্থান। হযরত আলী η-এর শাহাদাতের পর মুসলিমদের একতাবদ্ধ এবং একক একটি নেতৃত্বের অধীনে রাখাই ছিল তাঁর জন্য মূল চ্যালেঞ্জ। যদিও মুয়াবিয়া η সেক্ষেত্রে অনেকটা সফল হয়েছিলেন, তবে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না যে তার পরবর্তী শাসকরাও একইভাবে বাইরের হুমকি এবং অভ্যন্তরীণ বিভক্তি-বিভাজনকে সফলভাবে মোকাবিলা করতে পারবে। মুয়াবিয়া η হয়তো মনে করেছিলেন, সামাজিক একতা ও সংহতি রাখার একটামাত্র উপায় আছে আর তা হলো– উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা এবং খিলাফতকে রাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু তিনি যেভাবে ভেবেছিলেন, পরিস্থিতি সেভাবে অগ্রসর হয়নি। ইয়াজিদকে নেতা হিসেবে পছন্দ করে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি বিতর্ক সৃষ্টি করে। মুয়াবিয়া η-এর মতো ইয়াজিদ কখনোই রাসূল γ-এর সাহচর্য পায়নি। তাই একজন সাহাবির মধ্যে সহজাত যে বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি থাকে, তা ইয়াজিদের মধ্যে ছিল না। পাশাপাশি লোকমুখে তখন তার বেশ কিছু বাজে অভ্যাসের কথা প্রচারিত ছিল। মক্কা ও মদিনায়ও তার পাপাচারের অনেক কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। ইয়াজিদের মধ্যে মদপানের অভ্যাস ছিল, তার দরবারে মহিলাদের নৃত্য হতো, তার জীবনও ছিল বিলাসিতায় পরিপূর্ণ। ইসলাম এতদিন যে বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে এসেছে, তাতে এধরনের জীবনযাপন কল্পনাও করা যায় না। ইয়াজিদের জীবনযাপন পদ্ধতির সাথে রাসূল γ বা তাঁর পরবর্তী খলিফাদের জীবনের কোনো মিলই ছিল না। সমাজের এসব প্রচলিত কথার কতটুকু সত্য বা মিথ্যা সেটা যাচাই করার অবস্থাও তখন ছিল না; বরং এগুলোই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল।

ইয়াজিদের শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহটি করেন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের η। তাঁর পিতা যুবায়ের η হযরত আলী η-এর বিপরীতে উষ্ট্রের যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন। এই অবস্থা আরও প্রকট হয়, যখন ইরাক থেকে আরেকটি ইয়াজিদবিরোধী গোষ্ঠীর জন্ম হয়। তারা চাইছিল যে, আলী η-এর কোনো বংশধরই আবার খিলাফতের দায়িত্ব নিক। মুয়াবিয়া η জীবিত থাকা অবস্থায়ই মক্কায় হযরত আলী η-এর বড়ো ছেলে হাসান η ইন্তেকাল করেন। তাই ইরাকের এই মানুষগুলোর গোটা ভরসা আর প্রত্যাশা গিয়ে পড়ে হযরত আলী η-এর ছোটো ছেলে হুসাইন η-এর ওপর। ইরাকের কুফা নগরীতে সেই অনুযায়ী হুসাইন η-কে আমন্ত্রণও জানানো হয়। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের η অবশ্য হুসাইন η-কে ইরাকে যেতে বারণ করেছিলেন। কেননা, তার আশঙ্কা ছিল, ইরাকের জনগণ বিপদে বা চাপে পড়লেই হুসাইন η-কে ছেড়ে চলে যেতে পারে। হুসাইন η-এর জন্য তারা বড়ো কোনো ঝুঁকি নিতে যাবে না বলেও তার ধারণা ছিল। কিন্তু হুসাইন η ইরাকে যাওয়াই সঠিক মনে করলেন। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ার উদ্দেশ্যে তিনি ইরাকে রওনা দিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের η-এর আশঙ্কা সঠিক বলেই প্রমাণিত হলো। কুফায় হুসাইন η পৌঁছানোরও আগেই কুফার লোকজন তাঁর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। ইয়াজিদ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কুফায় নতুন গভর্নর পাঠাল। সেই গভর্নর সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের দমন করল কঠোরভাবে। ফলে সাধারণ জনগণ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গিয়ে হুসাইন η-কে সমর্থন করার প্রতিজ্ঞা থেকে দূরে সরে গেল। হুসাইন η কুফার মানুষের ওপর আস্থা রেখেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাই তাঁর সাথে কোনো বাহিনী ছিল না। ৭০ জন পরিবারের সদস্য ও অনুরক্ত

নিয়েই তিনি খুব সরল বিশ্বাসে কুফায় রওনা করেছিলেন। ইয়াজিদের বাহিনীকে মোকাবিলা করার কোনো সাধ্য বা দৃষ্টিভঙ্গি কোনোটাই তাদের ছিল না। অবশেষে কুফার ৮০ কিলোমিটার উত্তরে কারবালা নামক জায়গায় ইয়াজিদের সেনারা হুসাইন η-এর বহরকে ঘেরাও করে ফেলে। সেখানেই হুসাইন η এবং তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করা হয়। কারবালার এই বিয়োগাত্মক ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে নতুন এক ধারার জন্ম হয়, যাদের শিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের η-এর বিদ্রোহ অবশ্য এত সহজে দমে যায়নি। হুসাইন η-এর শাহাদাতের পর উমাইয়া সাম্রাজ্যের সবখানেই ইয়াজিদ ও তার সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। হুসাইন η রাসূল γ-এর নাতি। তাই রাসূল γ-এর রক্ত শরীরে বহমান এমন কাউকে হত্যার এই মর্মান্তিক ঘটনা সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিমকেই আঘাত করেছিল। আর সেই অসন্তোষের মাঝে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের η উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় বিদ্রোহের ডাক দেন। তাঁর এই বিদ্রোহকে চটজলদি থামানো যায়নি। ইয়াজিদ ৬৮৩ সালে মারা যায়। তার আগপর্যন্ত ইয়াজিদ এই বিদ্রোহকে পুরোপুরি দমন করতে পারেনি। ফলে সাম্রাজ্যে তার একক নিয়ন্ত্রণও সেভাবে আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ইয়াজিদের মৃত্যুর পর গোটা মুসলিম বিশ্বেই উমাইয়াদের নিয়ন্ত্রণ যেন তাসেরঘরের মতো ধ্বসে পড়তে থাকে। ইয়াজিদের পর যে শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়, সে ছিল বয়সে খুবই তরুণ। তার রাষ্ট্র পরিচালনায় তেমন আগ্রহও ছিল না। অল্প কয়দিন এই দায়িত্ব পালনের পর সেও মারা যায়। এ অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের η নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন এবং ইরাক, মিশর এমনকি সিরিয়ার কিছু অংশের মানুষও তাঁর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। অন্যদিকে, উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী বেশ কিছুদিন আন্তবংশীয় সংঘাতের ভেতর দিয়ে যায়।

এরপর মুয়াবিয়া η-এর চাচাতো ভাই মারওয়ান শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়। আর তখন থেকেই আবার উমাইয়ারা বিভিন্ন স্থানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মারওয়ান ও তার সন্তান আবদুল মালিকের শাসনামলে উমাইয়ারা সিরিয়া, ইরাক ও মিশরে পুনর্নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ৬৯২ সালে মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের η-এর বিদ্রোহের অবসান ঘটে। ফলে উমাইয়ারা পতনের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে আসে এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের অভিভাবক হিসেবে আবারও আবির্ভূত হয়। মুয়াবিয়া η তাঁর সন্তানকে উত্তরাধিকারী বানানোর সময় যে পরিমাণ স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করেছিলেন, সেটা অবশ্য তখনও হয়নি। উমাইয়ারা আবারও শক্তিশালী হয়ে ওঠায় ৬৮০ থেকে ৬৯২ সাল পর্যন্ত চলা গৃহযুদ্ধের আপাত অবসান ঘটে। ৭ম শতাব্দীর শেষ দিকে এবং ৮ম শতাব্দীর শুরুতে উমাইয়ারা আবার বড়ো আকারের সামরিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করে এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের অগ্রগতিও আগের ধারায় অব্যাহত থাকে।

উমাইয়ারা মাত্র কয়েক হাজার সেনা নিয়ে মাত্র চার বছরের মাথায় আইবেরিয়ার বিরাট অংশ জয় করে। যাতে বোঝা যায়, এই সেনাদের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন অটুট ছিল। সেই জনসমর্থনের ওপর ভর করেই তারা এই সফলতা অর্জন করে।

সামরিক বিজয়

উত্তর আফ্রিকায় আরও অগ্রসর হওয়ার আগেই উকবা ইবনে আমির η-কে অভিযানের সমাপ্তি টানতে হয়। ৬৯৮ সনে আবদুল মালিক উত্তর আফ্রিকায় বাইজেন্টাইনদের সর্বশেষ ঘাঁটি কার্থেজ জয় করার জন্য সেনাবাহিনীকে সেখানে প্রেরণ করেন। ফলে উত্তর আফ্রিকায় বাইজেন্টাইন অধ্যায়ের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটে এবং তারা সিসিলি ও গ্রিসে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এর পরপরই মুসলিমরা একটি ভিন্ন মাত্রার বিজয়ের স্বাদ পায়। জানা যায়, বাইজেন্টাইনদের সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তা জুলিয়ান উত্তর আফ্রিকার দায়িত্ব পাওয়া নতুন মুসলিম গভর্নরের কাছে আইবেরিয়ার ভিসিগোথিক রাজার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর অনুরোধ জানান। জুলিয়ানের বোন আইবেরিয়ার রাজা রডারিকের জিম্মায় ছিল। কিন্তু রডারিক নানাভাবে তার বোনকে হেনস্তা করে। সে অভিযোগ তুলেই জুলিয়ান তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার জন্য মুসলিমদের প্রতি অনুরোধ জানান। এমনকি এই অভিযান সফল করার জন্য তিনি স্পেনের উপকূল ঘেঁষে তাদের এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন।

জুলিয়ান নামে কেউ ছিল কিনা কিংবা তিনি নিজে আদৌ এমন কোনো প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিনা সেটা অবশ্য সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে জানা যায়, স্পেনে তখন ভিসিগোথিক রাজার আওতাধীন ইহুদি ও ভিন্ন মতাবলম্বী খ্রিষ্টানরাও নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল। আর এই বাস্তবতাই মুসলিমদের স্পেন প্রণালি অতিক্রম করে আইবেরিয়ার দিকে অগ্রসর হতে সাহস জোগায়।

মাগরিব অঞ্চলে উমাইয়াদের গভর্নর ছিলেন মুসা বিন নুসায়ের। তিনি তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে অভিযানে পাঠালেন। তারিক বিন জিয়াদ ছিলেন একজন বার্বার, যিনি সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের উপকূলে একটি শীলা অন্তরীপের কাছে তার বাহিনীসহ পৌঁছে যান। সেখানে জিবরাল্টার প্রণালির কাছে পাহাড়ের পাদদেশে তারা শিবির স্থাপন করেন। পাহাড়টি পরবর্তী সময়ে 'জাবালুত তারিক' বা তারিকের পাহাড় নামে পরিচিত হয়। এই শিবির থেকেই তারিক গোটা স্পেনের বিভিন্ন স্থানে পালাক্রমে অভিযান পরিচালনা করতে থাকেন। তারিক এসব অভিযানে বেশ সফলতা অর্জন করেন।

ভিসিগোথিক রাজা রডারিক ও তার সেনারা তখনও দ্বীপটির উত্তর দিকে অবস্থান করছিল। রডারিক মুসলিমদের মোকাবিলা করার জন্য সেখান থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। অন্যদিকে, তারিক প্রায় ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে সমরযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। গুয়াডালেট নামক স্থানে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুসলিমদের সক্ষমতা তো বেশি ছিলই, পাশাপাশি রডারিক বাহিনীতে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কেউ কেউ তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করে। তাই তারিকের পক্ষে সহজেই রডারিককে বিপর্যস্ত করে ফেলা সম্ভব হয়। রডারিক যুদ্ধে নিহত হয়। আর ভিসিগোথিক সেনাবাহিনীর বড়ো আকারের দুর্বলতা প্রকাশ্যে চলে আসে। গোটা অন্তরীপেই তাদের নিয়ন্ত্রণ কমে যায়। যুদ্ধের কয়েকমাসের মধ্যেই রডারিকের পুরোনো রাজধানী টলেডো জয়ের জন্য তারিক অগ্রসর হন। এরপর শুধু টলেডো নয়, ভিসিগোথিকদের নিয়ন্ত্রণে থাকা একের পর এক শহর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে শুরু করে।

তারিকের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল মুসা বিন নুসায়েরও আরেক দিক থেকে স্পেনে প্রবেশ করে অভিযান অব্যাহত রাখেন। তারিক একের পর এক স্থান জয় করতেন আর মুসা গিয়ে সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতেন। এভাবে একসময় তারিকের নেতৃত্বাধীন বাহিনী উত্তরের এ্যাবরো উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারিকের পিছু পিছু মুসা বিন নুসায়েরের বাহিনীও সেখানে পৌঁছে। তারা সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে বেসামরিক সরকারও গঠন করেন। ৭১১ থেকে ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তারিক ও মুসার যৌথ বাহিনী গোটা অন্তরীপের অধিকাংশ এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এক প্রজন্ম আগে উত্তর আফ্রিকায় মুসলিমদের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, তুলনামূলক ছোটো বাহিনী নিয়ে তারিকের বিজয় অভিযান ছিল সে ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা।

এরপর মুসলিমরা আরও উত্তরে গল এলাকার দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানেও স্পেনের মতোই সফল হয়। মুসলিম সেনাবাহিনী আধুনিক ফ্রান্সের দক্ষিণেও পৌঁছে যায় এবং ৭২০ খ্রিষ্টাব্দে একুইটেইন এবং সেপটিমানিয়াতে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মুসলিমদের এই বিজয়যাত্রা বড়ো আকারের হোঁচট খায় ৭৩২ সালে, যখন আন্দালুসের গভর্নর আবদুর রহমান আল-গাফিকির নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী ফ্রান্সের উত্তরে টরের যুদ্ধে চার্লস মার্টেলের নেতৃত্বাধীন ফরাসি বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধের প্রভাব ও পরিণতি নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, মুসলিমরা এই একটা যুদ্ধে জয়ী হলে গোটা ইউরোপই জয় করে ফেলত। আবার কেউ কেউ মনে করেন, গাফিকি আসলে খুব হালকা প্রস্তুতি নিয়ে এই যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তার দিক থেকে বিজয়ী হওয়ার তেমন কোনো বেপরোয়া প্রচেষ্টা ছিল না। যাহোক, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই যুদ্ধে জয়ী হলে মুসলিমরা ফ্রান্সসহ ইউরোপের আরও অনেক জায়গাতেই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারত, যা হয়তো মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসকেই আমূল পালটে দিত।

৮ম শতকের শুরু থেকে উমাইয়াদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের এ ধারা শুধু উত্তর আফ্রিকায় এবং স্পেনে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং একইসাথে সাম্রাজ্যের বিপরীত দিকেও বিস্তৃত হচ্ছিল। উমাইয়া সেনারা এমন একটি অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিল যেখানে খোদ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটও যাওয়ার সাহস পাননি। আর এই অভিযানের সুযোগও আসে একেবারে অদ্ভুতভাবে। মুসলিমদের একটি বাণিজ্য জাহাজ সেসময় সিলন (আধুনিক শ্রীলঙ্কা) থেকে আরবে ফিরে আসছিল। পথিমধ্যে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব দিকে সিন্ধু নামক এলাকায় ডাকাতরা জাহাজে আক্রমণ চালায়। বেশ কিছু মুসলিমকে তখন আটক করা হয়। কয়েকবার সিন্ধুর রাজা দাহিরকে অনুরোধ জানানো হয়, তিনি যেন বন্দি মুসলিমদের মুক্ত করে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু মুসলিমদের সে আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে মুসলিম সেনারা সেখানে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। মক্কার কাছাকাছি শহর তায়েফের নেতৃত্বাস্থানীয় সাকিফ গোত্রীয় যুবক মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে এই অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুহাম্মাদ বিন কাসিম তখন একেবারেই তরুণ। কিন্তু তিনি ইরাকের তৎকালীন গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ পাওয়ায় সমরনেতা হিসেবে তখনই বেশ পরিণত। ৭১১ সনে ৬০০০ সেনা নিয়ে মুহাম্মাদ বিন কাসিম পারস্য হয়ে অবশেষে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। একই বছর তারিক বিন জিয়াদও স্পেন অভিযান সম্পন্ন করেন।

ভারতে যারা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও নীচু গোত্রের। তারা ইসলামের সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং ইসলামের ছায়ায় এসেছিল।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম যখন সিন্ধু নদীর অববাহিকায় পৌঁছে যান, তখন বেশ বড়ো সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করে। মূলত ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতার যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, সেটাই এই স্থানীয় মানুষগুলোকে নমনীয় হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। বৌদ্ধ মন্দিরের কর্মকর্তারাও মুসলিমদের পাশে দাঁড়ায়। সকলের সহযোগিতা নিয়ে মুসলিমরা একের পর এক শহর জয় করে অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে সিন্ধু নদীর তীরে রাজা দাহিরের সাথে বিন কাসিমের সেনাদের যুদ্ধ হয়। স্থানীয় বাসিন্দা যারা রাজা দাহিরের শাসনে অসন্তুষ্ট ছিল, তারাও মুসলিমদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। যুদ্ধে রাজা দাহিরের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। রাজা দাহির যুদ্ধের ময়দানে নিহত হন। স্পেনের মতো এখানেও রাজার মৃত্যুর পর স্থানীয় প্রশাসন পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। মুহাম্মাদ বিন কাসিম আবার প্রশাসনকে সক্রিয় করেন এবং পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সিন্ধে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রথম ভারতবর্ষের একটি এলাকা ইসলামের আওতায় এলো। যদিও পরবর্তী শতাব্দীতে আরও অনেক এলাকাতেই মুসলিমরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

ইতিপূর্বে মুসলিমরা যেসব স্থান জয় করেছিল, সিন্ধের অবস্থাও তেমনই হয়। উর্ধ্বতন শাসকদের নির্দেশনা অনুযায়ী মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধের বৌদ্ধ ও হিন্দুদেরও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন, যেমনটা মুসলিমরা অন্যান্য স্থানে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদেরও দিয়েছিল। সিন্ধের যুদ্ধে যেসব মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস হয়েছিল, মুসলিম গভর্নরের আদেশে সেগুলো আবার মেরামত করা হয়। এভাবে সহজ ও নিশ্চিত একটি জীবনের নিশ্চয়তা পাওয়ায় সাধারণ মানুষও মুসলিমদের ওপর খুশি ছিল এবং সমাজে সম্প্রীতি ও সামাজিক সংহতিও মজবুতভাবে ছিল বিদ্যমান।

৮ম শতকের মাঝামাঝিতে এসে উমাইয়ারা স্পেন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ অবধি সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে। অর্থাৎ রাসূল γ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির ১০০ বছরের মধ্যেই মুসলিমরা পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্য তৈরি করতে সক্ষম হয়। সাধারণত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণকে যেকোনো দিক থেকেই শক্তিমত্তার ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচনা করা হলেও উমাইয়াদের জন্য এটাই যেন কাল হয়ে দাঁড়ায়। এর আগে অনেক বিদ্রোহকে তারা দমন করতে পারলেও নতুন করে তারা যে সমস্যায় পড়ে তা মোটেই অতিক্রমযোগ্য ছিল না। নতুন নতুন এলাকা সাম্রাজ্যের আওতায় আসায় মুসলিম শাসনের অধীনে বহু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী চলে আসে, যাদের একই প্লাটফর্মে ধরে রাখাটা সহজ ছিল না। তা ছাড়া উমাইয়াদের সামাজিক কৌশলও সবার কাছে সঠিক মনে হয়নি, তাই উমাইয়া শাসকদের ব্যাপারেও ক্রমশ অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল।

সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে প্রতি মুহূর্তেই মুসলিম শাসকদের অধীনে অমুসলিম জনগণের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। অনেক নয়া সাম্রাজ্যেই মুসলিমদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি ছিল না। বাকি ৯০ শতাংশই ছিল খ্রিষ্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ এবং হিন্দু। ইসলামি শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী এই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং তাদের সামরিকভাবে প্রতিরোধ করা হবে না, যদি তারা মুসলিম শাসককে জিজিয়া কর সঠিকভাবে প্রদান করে। অন্যদিকে, মুসলিমদের প্রদান করতে হবে ভূমিকর ও যাকাত। মুসলিমরা অন্য ধর্মের মানুষদের জন্য যে পরিমাণ জিজিয়া নির্ধারণ করে, তার থেকে অনেক বেশি কর তারা পূর্বের সাসানি ও বাইজেন্টাইন শাসকদের প্রদান করত। তারপরও জিজিয়ার পরিমাণ মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত করের তুলনায় একটু বেশি ছিল।

এই অবস্থার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া এই ছিল যে, সাধারণ মানুষদের কেউ কেউ কম হারে কর দেওয়ার লোভে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলত। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি উমাইয়াদের জন্য সংকটের জন্ম দেয়। তারা মনে করল– যদি অন্য ধর্মের সবাই মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে সাম্রাজ্যের কর সংগ্রহের পরিমাণ কমে যাবে। সাম্রাজ্যের আর্থিক সক্ষমতা হ্রাস পাবে। ফলে তারা চাইলেও নতুন করে কোনো সামরিক অভিযান শুরু করতে পারবে না। তাই তারা আইন সংশোধন করে। নতুন আইনে অমুসলিমরা মুসলিম হলেও তাদের পূর্বের হারে জিজিয়া কর দিতে বলা হয়। এতে দুটো লাভ হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। প্রথমত, কর সংগ্রহের হার কমে যাওয়ার যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, সেটা স্থগিত হবে। আর দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সুবিধাটি বাতিল হয়ে যাওয়ায় যারা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হবে, তারা কোনো লোভে পড়ে নয়; বরং বুঝে-শুনেই মুসলিম হবে। কিন্তু কার্যত, এই নতুন আইনটি ধর্ম ও গোত্রগুলোর মাঝে এক ধরনের বৈষম্যের সূচনা করল। যেহেতু আরবের গোটা অঞ্চলের মানুষ আগেই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল, তাই এই সময়গুলোতে যারা নতুন করে মুসলিম হচ্ছিল, তাদের বেশির ভাগই ছিল অনারব, বিশেষত কপ্টস, গ্রিক, বার্বার ও পারসিয়ান। তারা সবাই জিজিয়া দিয়ে যাচ্ছিল, আর আরবের মুসলিমরা এই কর প্রদানের দায় থেকে ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। ফলে উমাইয়া শাসকদের করা নতুন আইন তাদের অর্থনৈতিকভাবে হয়তো কিছুটা নিরাপত্তা দিয়েছিল, কিন্তু একইসঙ্গে সামাজিক বৈষম্যও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছিল। আরবরা সমাজে উন্নত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল আর অনারবরা মূল্যায়নের দিক থেকে একেবারে নিচে পৌঁছে গিয়েছিল। এই বাস্তবতা ইসলামের শিক্ষারও বিরোধী। কেননা, বিদায় হজের ভাষণে রাসূল γ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, “কোনো আরব অনারবের চেয়ে এবং কোনো অনারব আরবের চেয়ে উত্তম হবে না। উত্তম হওয়ার একমাত্র মানদণ্ড হবে তাকওয়া।”

উমাইয়া শাসক উমর ইবনে আবদুল আজিজ অবশ্য তাঁর শাসনামলে (৭১৭-৭২০) অনৈসলামিক কর আদায় পদ্ধতি বাতিল করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রয়াসগুলো অনারব মুসলিমরা প্রচণ্ড ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করলেও তাঁর নিজের পরিবারের সদস্যরাই এর ফলে তাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে শুরু করে। দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র ২ বছরের মাথায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে বিষপানে হত্যা করা হয়। পরবর্তী সময়ে মুসলিমরা উমর ইবনে আবদুল আজিজের অনাড়ম্বর জীবন এবং জনহিতকর কাজের কারণে তাকে দ্বিতীয় উমর হিসেবে আখ্যায়িত করে। তবে তিনি এককভাবে বেশ কিছু শরিয়তসম্মত পদক্ষেপ নিলেও মোটের ওপর তা উমাইয়াদের খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। পরবর্তী উমাইয়া শাসকরা আগের মতোই বৈষম্যমূলক প্রক্রিয়ায় শাসন পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সাম্রাজ্যে অনারব মুসলিমদের সংখ্যাও বাড়তে থাকায় উমাইয়া শাসকদের অন্যায্য করপদ্ধতি নিয়ে ক্ষোভও বৃদ্ধি পায়। আর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই মক্কার আরেকটি ক্ষমতাধর গোত্র আব্বাসীয়রা মুসলিম সাম্রাজ্যের খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য দৃশ্যপটে চলে আসে।

আব্বাসীয় অভ্যুত্থান

আব্বাসীয়রা তাদের এই নামটি নিয়েছে রাসূল γ-এর চাচা আব্বাসের নাম থেকে, যিনি তাঁর গোত্রে এবং ইসলামের ইতিহাসে খুবই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মুসলিমদের সিরিয়া বিজয়ের পর আব্বাসীয়রা জর্ডান নদীর পূর্বপাশে বসতি স্থাপন করে। ৭ম শতকের শেষ দিক থেকে যখন মুসলিম সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত বেড়ে যায়, তখন থেকেই তারা রাজনীতি থেকে একটু দূরে সরে যায়। তারপর অকস্মাৎ ৮ম শতকের

শুরুর দিকে তারা দাবি করতে শুরু করে, হযরত আলী η-এর এক বংশধর আব্বাসীয়দের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন। এটা কেন, কীভাবে হলো, সেটাও রহস্যময়। তবে সে যাহোক, এই দাবিটি আব্বাসীয়দের এক ধরনের বৈধতা দিয়ে দেয়। এর একটা বাস্তবতাও ছিল। কেননা, উমাইয়াদের তুলনায় তারা রাসূল γ-এর রক্তের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ। পাশাপাশি, যারা চাচ্ছিল যে, হযরত আলী η-এর কোনো উত্তরাধিকারী খিলাফতের দায়িত্বে আসুক, তারাও আব্বাসীয়দের সমর্থন করতে শুরু করে।

প্রথমে সিরিয়া ও পরবর্তী সময়ে ইরাকে নিজেদের অবস্থান তৈরি করার পর, আব্বাসীয়রা খোরাসানে তাদের দূত পাঠায়। প্রত্যাশা ছিল, পারস্যের এই লোকগুলোকে নিয়েই তারা উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। ৭৩০ থেকে ৭৪০ সাল পর্যন্ত সময়ে অনেকেই আব্বাসীয়দের কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আর এই প্রক্রিয়াগুলো হয় উমাইয়া শাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু দামেস্ক থেকে বেশ দূরবর্তী স্থানগুলোতেই। মুসলিম সমাজে আবারও সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে এবং শাসন ক্ষমতা থাকবে হযরত আলী η-এর বংশধরদের হাতেই– এই দুটো প্রতিশ্রুতি দিয়েই তারা জনগণকে নিজেদের পক্ষে ভেড়ায়। মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে এভাবেই আব্বাসীয়রা নিজেদের একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে। যারা মুসলিম শাসনকে রাসূল γ-এর মদিনা শাসনের আদলে দেখতে চেয়েছিল, তারাও এসে আব্বাসীয়দের পাশে দাঁড়ায়। সেই সাথে উমাইয়াদের প্রতি অসন্তুষ্ট অনারবরাও আব্বাসীয়দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেননা, তারাও মনে করত যে, রাসূল γ-এর পরিবার থেকেই মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা নির্বাচন করা উচিত।

অবশেষে ৭৪৭ সনে আব্বাসীয় পরিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের মার্ভ শহর থেকে কালো পতাকা উড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেয়। মার্ভ ছিল তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের একেবারে পূর্বপ্রান্তের একটি শহর। এই বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবু মুসলিম নামক রহস্যময় এক ব্যক্তি। আবু মুসলিম সম্বন্ধে তেমন কোনো পরিষ্কার তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি আব্বাসীয় পরিবারের কেউ ছিলেন না, তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। তার চৌকস রাজনৈতিক ও সামরিক দক্ষতার কারণে বিদ্রোহীরা বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই খোরাসান দখল করে নেয়। বিদ্রোহীরা খোরাসানেই তাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপন করে। এরপর আবু মুসলিম তার বাহিনীকে পশ্চিমের দিকে একেবারে পারস্যের কেন্দ্রস্থলের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানকার নাগরিকরাও উমাইয়া শাসনের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। সেজন্য তারাও বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়।

দূরবর্তী মার্ভ শহরে উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে চাপা যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ হয়, তা ক্রমশ সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কিছু স্থানেও সংক্রামিত হয়– যা উমাইয়া খিলাফতের জন্য রীতিমতো হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়। পারস্যের মানুষদের বিদ্রোহে শামিল করার পর এবার বিদ্রোহীরা অগ্রসর হয় কুফার দিকে। কুফার মানুষ আগাগোড়াই উমাইয়াবিরোধী ছিল। বিদ্রোহীরা কুফার স্থানীয় জনগণের সমর্থন নিয়ে সেখানকার উমাইয়া গভর্নরকে বরখাস্ত করে। এভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে বিরাট এলাকা জুড়ে আব্বাসীয়দের কালো পতাকা উড়তে শুরু করে।

কুফা যখন উমাইয়াদের হাতছাড়া হয়, তখন সেখান থেকেই আব্বাসীয়দের খিলাফতের মূল দাবিদার আবুল আব্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। দলে দলে মানুষ আবুল আব্বাসকে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়। যখন থেকে আব্বাসীয়রা বিদ্রোহ শুরু করে, তখন থেকেই তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ছিল। পারস্য থেকে অভাবনীয় সমর্থন পাওয়ায় তারা আরও শক্তিশালী হয়। আর আবুল আব্বাস দৃশ্যপটে চলে আসায় সার্বিকভাবে এখন তারা একজন নেতাও পেল, যার পেছনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আব্বাসীয়রা জনসমর্থনে সিক্ত হচ্ছিল আর উমাইয়ারা সব দেখেও বাধ্য হয়ে রক্ষণাত্মক অবস্থানে ছিল। উমাইয়াদের জন্য পালটা জনসমর্থন পাওয়া ছিল বিরাট এক চ্যালেঞ্জ।

আব্বাসীয়রা বিদ্রোহ করার আগের এক দশকে উমাইয়ারা কোনো ধরনের হুমকি মোকাবিলা করেনি। তাই সিরিয়ান সেনাবাহিনীও অনেকটা নির্জীব হয়ে পড়েছিল, তারা নিজেদের ক্যাম্পে বা স্থাপনাতে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। সেই অবস্থাকে আবার পালটে খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় উমাইয়ারা একটু তৎপর হলো, কিন্তু ততদিনে আব্বাসীয়রা ইরাকের বড়ো একটি অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। ৭৫০ সালের শুরুতে মধ্য মেসোপটমিয়াতে জাবের যুদ্ধে দুই পক্ষ মুখোমুখি হয় এবং আব্বাসীয়রা উমাইয়া বাহিনীকে ধরাশায়ী করে। এই যুদ্ধের পর আব্বাসীয়দের প্রতিহত করা আরও কঠিন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর উমাইয়ারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে। দামেস্ক ছাড়া আর কোথাও উমাইয়াদের অবস্থান ছিল না। আব্বাসীয়রা একের পর এক শহর জয় করছিল, আর সেখানে কর্মরত উমাইয়া কর্মকর্তাদের ধরে ধরে হত্যা করছিল। খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানও মিশরে বন্দি হন। তিনি সেখানে আব্বাসীয়দের মোকাবিলা করার জন্য সামরিক বাহিনী নিয়ে উমাইয়াদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার শেষ একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেনি।

উমাইয়াদের মাত্র একজন সদস্য কোনোভাবে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা না পড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি তখন একজন কিশোর। তার নাম আবদুর রহমান। তিনি উমাইয়া পরিবারের দূরবর্তী একজন সদস্য। তিনি আব্বাসীয়দের হাত থেকে পালিয়ে উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। আব্বাসীয় সেনাবাহিনী ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে মিশর হয়ে গোটা মাগরিব পর্যন্ত উমাইয়াদের উত্তরাধিকারীদের খুঁজে বেড়োচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যেও শুধু একজন পারিবারিক ভৃত্যকে নিয়ে আবদুর রহমান পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এক পর্যায়ে তিনি আন্দালুসে পৌঁছে যান এবং পরবর্তী সময়ে সেখানেই তিনি আবারও উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসীয়দের ধরাছোঁয়ার বাইরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই সাম্রাজ্যটি পরবর্তী ৩০০ বছর অবধি টিকেছিল।

আব্বাসীয় খিলাফত

৮ম শতকের মাঝামাঝি সময় আব্বাসীয়দের বিদ্রোহ চূড়ান্ত পরিণতিতে খিলাফতের অংশীদারিত্বে দ্বিতীয় আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা করে। আব্বাসীয়রা এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছিল, যা রাসূল γ-এর শাসনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। সমাজে সবাইকে বিশেষত অনারবদের ন্যায্যতা ও সমতা দেবে এবং সর্বোপরি হযরত আলী η-এর উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকেই নেতৃত্ব নির্বাচন করবে। এই ধরনের কথা এবং প্রতিশ্রুতি মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন পাওয়ার জন্য জরুরি ছিল। কিন্তু যখন তারা খিলাফতের দায়িত্ব নেয়, তখন তাদের শাসনপদ্ধতি উপর্যুক্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশা থেকে অনেকটাই দূরে বলে প্রতীয়মান হয়। খুলাফায়ে রাশেদা সব সময় করুণা ও সহানুভূতির মানসিকতাকে বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতেন না। আব্বাসীয়রা সেই ধারা আবার ফিরিয়ে আনার কথা বললেও বাস্তবতা ছিল পুরোই ভিন্ন। তারা উমাইয়া শাসকদের রেখে যাওয়া কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনব্যবস্থাই অব্যাহত রাখে। আব্বাসীয়রাও উমাইয়াদের মতো উত্তরাধিকারনির্ভর রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে। শুধু পার্থক্য হলো এটাই যে, এবার উত্তরাধিকারী শাসক আসবে কুরাইশদের আব্বাসীয় গোত্র থেকে; উমাইয়া পরিবার থেকে নয়। ফলে যারা আশা করেছিল যে, হযরত আলী η-এর বংশধর থেকেই খলিফা নিয়োগ দেওয়া হবে, আব্বাসীয়দের এই সিদ্ধান্তে তারা হতাশ হয়ে যায়।

আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদ তার বিপুল সম্পদ এবং ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দূরবর্তী অনেক রাজ্যের শাসকদের সাথে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করেন। ৮০২ সালে তিনি ফ্রান্সের চার্লেমাগনে কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেন। এই সময় সে মিশনের সাথে একটি হাতি ও জলঘড়িও পাঠানো হয়।

আব্বাসীয়দের আমলে সত্যিকার অর্থে যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে তা হলো, সমাজে অনারবদের অবহেলার অবসান ঘটে এবং তাদের সমতা নিশ্চিত হয়। খিলাফত আগের মতোই আরবদের হাতে থাকলেও প্রশাসনিক পদগুলোতে ব্যাপকভাবে পারসিয়ানদের ঢোকানো হয়। ইসলাম আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকেই পারস্য অধিবাসীদের বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল। তার আলোকেই পারসিকরা বেশ জটিল কিন্তু কার্যকর একটি আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করতে সক্ষম হয়েছিল। আব্বাসীয়দের আমলে বৈষম্য হ্রাস পাওয়ায় পারসিয়ানরা আবার প্রশাসনিক মহলে প্রবেশ করে এবং পুরোনো সেই অভিজ্ঞতাকে আবারও কাজে লাগানোর সুযোগ পায়। পারসিদের এই কর্মদক্ষতার কারণে আব্বাসীয় খিলাফত অনেকটাই তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায় এবং খিলাফতের রাজধানী পারস্যের মূল এলাকার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

৭৬৫ সালে দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরের সময় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী উর্বর এলাকায় নতুন একটি শহর নির্মাণ করে সে শহরটিকে আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নতুন এই শহরটির নাম রাখা হয় বাগদাদ। পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে বাগদাদ বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম শহরে পরিণত হয়। তৎকালীন সময়েই প্রায় ১০ লাখ মানুষ সেই বাগদাদ নগরীতে বসবাস করত। এই প্রথম মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল একটি নগরকেন্দ্রিক (মেট্রোপলিটন) কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়– যেখানে সরকার, প্রশাসন, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, চিত্রকলা একই সাথে চর্চা ও বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

আব্বাসীয় খিলাফতকে মূল্যায়ন করতে হলে সামরিক অভিযান বা নতুন নতুন রাজ্য জয়কে বিবেচনায় নেওয়া যাবে না, যেমনটা উমাইয়া খিলাফতের সময়ে হয়েছিল। কেননা, আব্বাসীয়রা খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ কার্যক্রম একরকম থেমেই গিয়েছিল। শুধু সীমান্তবর্তী এলাকায় বাইজেন্টাইনদের অবশিষ্টাংশকে দমিয়ে রাখার জন্য মাঝেমধ্যে কিছু অভিযান চালানো হতো, এর বেশি কিছু নয়।

অন্যদিকে, পশ্চিমে ৭৩২ সালে উমাইয়া আমলে টরের যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার মধ্য দিয়েই ইউরোপে মুসলিমদের অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। পশ্চিমে তাই নতুন করে কোনো জয়ও আসেনি। শুধু আন্দালুস নিয়ে কিছুটা আগ্রহ ছিল। কেননা, সেই এলাকাটি তখনও উমাইয়া উদ্বাস্তুরাই নিয়ন্ত্রণ করত। পূর্বে আব্বাসীয়দের সফলতা বলতে এটুকুই যে, তারা মধ্য এশিয়ায় বেশ কিছু নতুন সড়ক নির্মাণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে তুর্কিরা মধ্য এশিয়ায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তবে তারা কিন্তু কোনো সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এই এলাকা জয় করেনি; বরং ৯ম ও ১০ম শতকে তুর্কিরা যে ব্যাপকহারে মুসলিম সাম্রাজ্যে অভিবাসন করে তারই ফলে তারা একটা সময়ে সেখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আব্বাসীয় যুগেই মুসলিমদের সামরিক অভিযান ও বিজয়গাঁথার আপাত সমাপ্তি ঘটে। আব্বাসীয় শাসনামলে এর পরিবর্তে মুসলিমরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞাননির্ভর কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে অগ্রসর হতে শুরু করে।

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক সোনালি যুগ

ইসলামের ইতিহাসে ৯ম থেকে ১৩শ শতাব্দী ছিল বিজ্ঞান, ধর্মদর্শন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার অনন্য এক সময়। এই কয়েক শতাব্দীতে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং উন্নতি লাভ করে মানব ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোনো নজির পাওয়া যায় না। মরুভূমির শুষ্ক ও তপ্ত বালুতে জন্ম নিয়ে সুদূর স্পেন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিকশিত হওয়ায় ইসলামি সভ্যতা তখন অসংখ্য বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, ধর্ম এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের ধারকে পরিণত হয়। পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর বৈজ্ঞানিক অবদানগুলোকে এখানে একত্রিত ও সমন্বিত করা হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানচর্চার এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। মুসলিম সাম্রাজ্য তখন নানা চিন্তার, নানা বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য জ্ঞানী মানুষের এক মিলনমেলা। আর ততদিনে মুসলিমদের মধ্যে বড়ো মানের জ্ঞানসাধকদের আবির্ভাব হয়েছে। এই জ্ঞানী মানুষগুলোর অবদানের ওপর ভর করেই মুসলিম সভ্যতা পরিণত হয় প্রাচীন সভ্যতা আর রেনেসাঁসপ্রভাবিত ইউরোপের সংযোগস্থলে। শুধু তা-ই নয়, মুসলিমরা সে সময়ে যে কাজগুলো করেছে, সেগুলোর ওপরই আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়েছে।

বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা

ইতিহাসের অন্য অনেক রাজনৈতিক পরাশক্তির মতো আব্বাসীয়রাও একটি ইতিবাচক ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। তারা সাম্যনির্ভর সমাজ এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিল। উমাইয়ারা যেহেতু এ দুটি কাজ করতে পারেনি, তাই সেগুলো নিয়ে মানুষের মনে হাহাকার ছিল। ফলে সাধারণ মানুষ খুব সাবলীলভাবেই আব্বাসীয়দের এসব কথায় আশাবাদী হয়ে তাদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল।

জনগণের এই অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়ায় আটলান্টিক থেকে সিন্ধু পর্যন্ত এ বিশাল এলাকাটিতে আব্বাসীয়রা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আব্বাসীয় শাসনামলে রাজধানী ছিল বাগদাদ– যেখানে নানা ভাষা ও সংস্কৃতির বিশেষত গ্রিক, কপ্ট, পারসিয়ান, ভারতীয়সহ প্রায় ১০ লাখ মানুষ বসবাস করত। নানা ধারার লোকজনকে একসাথে পাওয়ায় বাগদাদও পুরোনো সব সভ্যতার অনেক তথ্য ও ঐতিহ্য পেতে শুরু করে। মূলত যে সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা আব্বাসীয়রা বলেছিল, তা গড়ার কাঙ্ক্ষিত সময়ও যেন এসে যায়। সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন (শাসনকাল : ৮১৩-৮৩৩) দৃঢ়ভাবে মনে করতেন, বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা ছাড়া কাঙ্ক্ষিত সোনালি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতাকে উপভোগ করতে হলে সাম্রাজ্যের নানা স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাত্ত ও ধারাগুলোকে একটি স্থানে নিয়ে আসার কোনো বিকল্প নেই। তিনি জানতেন, মুসলিম সাম্রাজ্যের সব জ্ঞানী ও স্কলারকে এক জায়গায় এনে যদি তাদের পারস্পরিক মত-বিনিময় করার সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে সম্ভাবনার অনেক দুয়ার এমনিতেই খুলে যাবে।

পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় হলো কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয়। মরক্কোর ফেজ এলাকায় একজন মুসলিম মহীয়সী নারী ৮৫৯ সনে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন।

জ্ঞানের এই অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় নিয়ে খলিফা আল মামুন বাগদাদে একটি অনন্যসাধারণ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। এর নাম ছিল 'বায়তুল হিকমাহ' বা হাউজ অব উইজডম (বাংলায় বলা যেতে পারে 'জ্ঞানের বসতবাড়ি')। এর গঠন ও কাজের প্রকৃতি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী; বর্তমান সময়ের প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে এর তেমন কোনো মিল ছিল না। এই শিক্ষাকেন্দ্রের আওতায় একই ক্যাম্পাসে একইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগার, অনুবাদকেন্দ্র এবং গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। উমাইয়া শাসনামলে কিছু ছোটোখাটো পাঠাগার ও স্কুলের প্রচলন ছিল। তবে আব্বাসীয় আমলে জ্ঞান অর্জনের ওপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা ইসলামের ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায়নি। কথিত আছে, সে আমলে যদি কেউ কোনো বইকে মূল ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করত, তাহলে সে অনুবাদককে বইয়ের ওজনের সমানুপাতে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হতো। অভাবনীয় এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আল মামুনের এই আকর্ষণীয় প্রকল্পে অংশ নেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলিম ও অমুসলিম শিক্ষাবিদরা পঙ্গপালের মতো বাগদাদে ছুটে এসেছিলেন। মানব ইতিহাসে প্রথম বারের মতো পারস্য, মিশর, ভারতবর্ষ ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সব সেরা পণ্ডিতরা একত্রিত হয়েছিলেন। ফলে তখন স্বাভাবিকভাবেই বড়ো আকারের কিছু কাজ সম্পাদিত হয়, যা গোটা পৃথিবীর কল্যাণে এসেছিল।

আল মামুনই বিশ্বের ইতিহাসে গুটিকয়েক নেতার মধ্যে একজন, যিনি বিজ্ঞানের ওপর এতটা জোর দিয়েছিলেন। মুসলিমদের জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগটি বেশ কয়েকটি কারণে স্মরণীয়। প্রথমত, মুসলিমরা যখন থেকে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করে তখন থেকেই সেই অদৃশ্য দেওয়ালটি ভেঙে যায়, যা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতিকে বিভক্ত করে রেখেছিল।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার আগে আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্ম নেওয়া একজন ব্যক্তির মধ্যে কখনোই সাসানি রাজ্যে গিয়ে পড়াশোনা করার সাধ জাগেনি। যদি কেউ কোনোভাবে চলেও যেত, ভাষার ভিন্নতার কারণে সেখানে কাজ করতে পারত না। আবার সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারাও তাকে আপন বলে মেনে নিতে পারত না। তাই মুসলিমদের সাম্রাজ্য বিস্তার ভাষার এই ব্যবধানকে দূর করে দেয়। ইসলাম প্রসারের কারণেই তখন আরবি একটি সার্বজনীন ভাষা হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা বিভিন্ন সংস্কৃতি ও গোত্রের মানুষদের এক করতে পারে। কেননা, যার যে মাতৃভাষাই হোক না কেন, একজন মানুষ মুসলিম হওয়া মাত্রই তাকে ন্যূনতম কিছু আরবি জানতে হয়। কারণ, আরবি ভাষাতেই মুসলিমরা নামাজ পড়ে এবং কুরআন অধ্যয়ন করে। তাই আরবি শুধু সাহিত্যের ভাষা হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং বিজ্ঞানীরাও এই ভাষাটিকে তাদের অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজে লাগাতে শুরু করেন।

তৃতীয়ত ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা জ্ঞান অর্জনের ওপর এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলাম জ্ঞান অন্বেষণকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, এই কাজটিকে ইবাদতের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এমন অসংখ্য উদাহরণ এসেছে, যেখানে একজন মুসলিমের জন্য জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল γ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান চর্চা করে, জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সহজ করে দেন।" ফলে মুসলিম বিজ্ঞানীরা এমন মানসিকতা লালন করতেন, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নিত্যনতুন আবিষ্কার করে যাচ্ছেন। কিংবা এভাবেও বলা যায়, নতুন কিছু গবেষণা করলেই আল্লাহ সন্তুষ্ট

হবেন– এমন একটি বোধ ও অনুভূতি তৎকালীন শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর এভাবেই জ্ঞানের রাজ্যে মুসলিমদের সোনালি যুগের সূচনা হয়।

এতক্ষণ যে তিনটি ফ্যাক্টরের কথা আলোচিত হলো, মূলত সেগুলোই মুসলিমদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রলুব্ধ করেছিল। আর সত্যি কথা বলতে, যদি রাসূল γ-এর ওফাতের কয়েক বছরের মধ্যে মুসলিমদের মধ্যে এই জাগরণ এবং জ্ঞানের প্রতি এই আকর্ষণটি তৈরি না হতো, তাহলে হয়তো মুসলিমদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দুষ্কর হয়ে পড়ত। কেননা, শুধু সামরিক অভিযান দিয়ে মুসলিমদের শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে যেত।

গণিত

মুসলিমদের সোনালি যুগে গণিতের ওপর যে ব্যাপক কাজ হয়, তা মানব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। গণিতই হলো বিজ্ঞানের সকল শাখার মূল সূত্রধর। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, মহাকাশ বিজ্ঞান, ভূগোলসহ বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই গণিত অপরিহার্য একটি উপাদান। সোনালি যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা গণিতকে শুধু বিজ্ঞান নয়; বরং একটি পবিত্র জ্ঞান হিসেবেও বিবেচনা করতেন। তারা মনে করতেন, গণিতকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারলে পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ পরিচালনার যাবতীয় সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা সম্ভব। আজকের দিনে যারা পদার্থবিদ্যায় পড়েছেন বা পড়ছেন, তারা সত্যিই ধারণা করতে পারেন যে, মহাকাশে কীভাবে এক একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেই যুগে আজকের মতো সব তথ্য সহজলভ্য ছিল না। তাই মহাকাশ তাদের কাছে তখন পর্যন্ত রহস্যময়ই ছিল। তখনকার সময়ের বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, জাদুকরী কিছু গাণিতিক সূত্রানুযায়ীই এই মহাকাশটি চলছে। এটা বুঝতে পারার পর আল্লাহর অসীম ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকূলের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা নতুনভাবে উপলব্ধি করেন। তাই তারা গণিতচর্চাকে ধর্মচর্চার মতোই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতেন।

ইসলামের সে সোনালি যুগের গণিতবিদদের মধ্যে শীর্ষে ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারিজমি। তিনি ছিলেন একজন পারসিয়ান। ৭৮০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫০ সালে ইন্তেকাল করেন। বায়তুল হিকমায় যারা কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একেবারে প্রথম সময়ের। তাই পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান ও গণিতে যে ব্যাপক কাজ হয় তার ভিত্তি তিনিই গড়ে দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। তিনিই প্রথম ভারতীয় গাণিতিক পদ্ধতিকে আরবি ভাষায় প্রচলন করেন। এর আগে আরবরা রোমান সংখ্যা ব্যবহার করত, কিন্তু তার অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। বিশেষ করে অপূর্ণাঙ্গ সংখ্যার অঙ্কগুলো রোমান সংখ্যায় লেখা কঠিন ছিল। কিন্তু ভারতীয় গাণিতিক সংখ্যায় ১, ২, ৩, ৪ দিয়ে যেকোনো অঙ্ক লেখা যেত। ফলে অংক নিয়ে যে সংকটটা ছিল, সেটা তার অবদানের কারণেই সমাধান হয়। খাওয়ারিজমি শুধু ভারত থেকে এই সংখ্যার হিসেবটাই নেননি; বরং এর সাথে 'শূন্য' সংখ্যাটিকে যোগ করেছেন– যা গাণিতিক হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তিনি শূন্যকে গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করে যেতে পারেননি। তবে তিনি এর সফল ব্যবহার ও প্রয়োগ করেন এবং এই গাণিতিক সংখ্যাগুলোর মাধ্যমে নতুন আরও অনেকগুলো চমকপ্রদ বিষয় ও সূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

দশম শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে ক্যাথলিক পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার গণিত চর্চার প্রচলন শুরু করেন। অথচ তিনি এই জ্ঞানটি মুসলিমদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। মুসলিম স্পেনে ও উত্তর আফ্রিকায় পড়াশোনা করার সময় সিলভেস্টার গণিতের এই শিক্ষা লাভ করেন।

খুব সম্ভবত আল খাওয়ারিজমির সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো– বীজগণিত। কীভাবে অ্যালজেবরা বা বীজগাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে সম্পদের উত্তরাধিকার ইস্যু থেকে শুরু করে ভূগোল পর্যন্ত দৈনন্দিন সকল বিষয়কে সমাধান করা যায়, তা তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *কিতাবুল মুখতাসার ফি হিসাবিল জাবর ওয়াল মুকাবালা* (*The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing*)-তে অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। এর আগে গ্রিকরা জ্যামিতিতে খুব সিদ্ধহস্ত হলেও তারা তাত্ত্বিক বীজগণিতকে জ্যামিতি থেকে আলাদা করতে পারেনি। এ কারণে তখন থেকেই এটা বিজ্ঞানের একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবেই বিবেচিত হতো। খাওয়ারিজমির বইটি বীজগণিতকে পৃথক একটি বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করে। তা ছাড়া তিনি বীজগণিতের অনেক ধরনের কার্যকর প্রয়োগও দেখিয়ে গেছেন। এমনকি বীজগণিতের যে ইংরেজি শব্দ অর্থাৎ অ্যালজেবরা, তাও এসেছে খাওয়ারিজমির আরবি বইটির শিরোনাম থেকে। শিরোনামে 'আল জাবর' একটি শব্দ ছিল, যার অর্থ হলো– পরিপূর্ণতা। মূলত বীজগাণিতিক সমীকরণের দুই পাশেই ভারসাম্য বা পূর্ণতা আনার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয় বলে এই আল জাবর নামটি দেওয়া হয়েছে।

আরেক বিশ্বখ্যাত গণিতজ্ঞ হলেন উমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১)। যদিও আধ্যাত্মিকতা এবং ভালোবাসার ওপর কবিতা লিখে তিনি বেশি পরিচিতি পেয়েছেন। কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন একজন পূর্ণাঙ্গ গণিত বিশারদ। তিনি গণিতকে তার অগ্রজদের মতো সীমিত পরিসরে রাখতে চাননি; বরং তাদের রেখে যাওয়া সব সীমানাকে সচেতনভাবেই ভাঙতে চেয়েছেন। তিনি কিউবিক সমীকরণসংক্রান্ত সমাধান করার জন্য

বীজগাণিতিক কিছু সূচক বের করেন, যেখানে এগুলোকে তিনগুণ বাড়িয়ে বিবেচনা করা হয়। তিনি প্রথম না হলেও প্রথম যুগেরই একজন গণিতজ্ঞ, যিনি অংকের দ্বিপদী তত্ত্বগুলো প্রণয়ন করেন। এর ফলে বীজগণিতের মাধ্যমে যোগ করার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। যদিও এসব আবিষ্কারকে নিতান্তই তাত্ত্বিক ঘরানার এবং মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের উপযোগী বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, এগুলোর ওপর ভর করেই পরবর্তী স্তরের বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও ক্যালকুলাসের ভিত্তি গড়ে ওঠে।

মুসলিম পণ্ডিতরা বিশেষ করে আল বাত্তানি নামক একজন গণিতজ্ঞ বেশ কিছু ব্যবহারিক প্রয়োজনে ত্রিকোণমিতিকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যান। ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে এবং তারকার গতিপথ অনুধাবন করে পৃথিবীতে মানুষ তার অবস্থান নির্ণয় করতেও সক্ষম হয়। এটা মুসলিমদের জন্য খুব বেশি জরুরি ছিল। কেননা, মুসলিমদের কিবলামুখী তথা মক্কার দিকে মুখ করেই প্রতিদিন নামাজ আদায় করতে হয়। মুসলিমদের সেই সোনালি যুগে অসংখ্য শহরের তথ্য নিয়ে একটি বইও বের করা হয়, যেখানে মক্কা থেকে শহরগুলোর দূরত্ব ও ভৌগোলিক অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আমরা যখন হাজার বছরের পুরোনো মসজিদগুলো দেখি, তখন বিস্মিত হই। কেননা, অবস্থানগতভাবে এই মসজিদগুলো মক্কা থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থাকলেও, এত বছর আগেও এই স্থাপনাগুলোকে সঠিকভাবে মক্কার দিকে মুখ রেখে নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল। আজকের সময়ে এসে আমরা নিয়মিতভাবে যে জিপিএস ব্যবহার করছি, তার শুরুটাও হয়েছিল এই ত্রিকোণমিতি দিয়েই; যার মূল উদ্ভাবন ও বিকাশের কৃতিত্ব শুধু মুসলিমদেরই।

জ্যোতির্বিদ্যা বা মহাকাশ বিজ্ঞান

মুসলিমরা গণিতে যে বিশাল অগ্রগতি অর্জন করেছিল, তার একটি বড়ো সুফল পাওয়া যায় মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। সে যুগে মুসলিম গণিতবিদরা যে ফর্মুলা ও তত্ত্বগুলো দিয়ে গিয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে তা-ই তারকারাজি ও নক্ষত্র নিয়ে গবেষণার ভিত্তি তৈরি করে দেয়। আর একথা এখানে অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য যে, এক্ষেত্রেও ইসলামের চেতনা ও ঈমানের নানা দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিমদের কাজ করতে উজ্জীবিত করেছে। পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত আছে যেখানে নভোমণ্ডল, তারকা, গ্রহ আর উপগ্রহের আবর্তন এবং কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে। চাঁদ ও সূর্যের গতিবিধি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, 'এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম হিসেব মেনেই চলাচল করছে'। এমনকি কুরআনে এও বলা হয়েছে– রাতের আঁধারে আকাশে যে তারাগুলো ভেসে উঠে সেগুলোই মানুষকে অন্ধকারে এবং অচেনা স্থানে পথ চিনে যেতে সাহায্য করে। তখন আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মুসলিম বসবাস করত। কুরআনের বাণী ও ঈমানের চেতনা সব সময় তাদের মনে কমবেশি সক্রিয় থাকত। গাণিতিক এসব হিসেব-নিকেশকে তারা চাইলেও অগ্রাহ্য করতে পারত না।

কুরআনে হাকিমের নির্দেশনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু করেন। প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রকে একই বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আর এ কারণেই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে নক্ষত্র ও তারকার প্রভাব নিয়ে অনেক ভুল ও বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত ছিল। মুসলিম বিজ্ঞনীরাই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ্যাকে জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে আলাদা করতে সক্ষম হয়। মুসলিমরা এই শাখায় কাজ করতে আসার আগপর্যন্ত গ্রিক জ্যোতির্বিদ টলেমিকেই এই বিষয়ে সবচেয়ে উঁচুমানের পণ্ডিত হিসেবে বিবেচনা করা হতো। মুসলিম বিজ্ঞানীরা আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন ও বায়তুল হিকমাহর পৃষ্ঠপোষকতায় টলেমির রেখে যাওয়া সব তত্ত্বকে নিবিড়ভাবে পাঠ ও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। টলেমির সকল সূত্রের মূল ভিত্তি ছিল বিশ্বজগতের ভূকেন্দ্রিকতার বিষয়টি। এ তত্ত্বানুযায়ী পৃথিবীর কোনো গতি নেই। কিন্তু মুসলিম গবেষকরা গবেষণা করে দেখতে পান, পৃথিবী ও তারার গতিবিধি নিয়ে টলেমি যা বলে গেছেন তা ভুল এবং এগুলোর সংশোধন জরুরি।

অবশেষে একাদশ শতাব্দীতে আল বিরুনি প্রথমবারের মতো বলেন যে, পৃথিবী ঘুরছে না বলে টলেমির দেওয়া ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি; বরং পৃথিবী প্রতিমুহূর্তেই নিজ কক্ষপথের ওপর আবর্তন করছে। আর টলেমি যেহেতু পৃথিবীকে স্থির ধরেই যাবতীয় তত্ত্ব দিয়েছেন, তাই এর আর কোনো কার্যকারিতা নেই। যদিও ঘুর্ণায়মান পৃথিবী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় আল বিরুনির এই তত্ত্বকে মুসলিম সব বিজ্ঞানী মেনে নিতে পারেননি; বরং এটা নিয়ে তাদের মধ্যে সব সময়ই কিছু না কিছু বিতর্ক ছিল।

এক সময় এই বিতর্ক ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে; বিশেষত যখন আন্দালুসিয়ার মুসলিম পণ্ডিত আল মাজরিতির কাজগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। আল মাজরিতি মহাকাশসংক্রান্ত টেবিল ও হিসাবগুলোকে নতুন করে বিন্যস্ত করেছিলেন। তার মৃত্যুর পরও ইউরোপীয়রা মুসলিম সাম্রাজ্যের আওতাধীন আইবেরিয়াতে এসে আল মাজরিতি ও অন্যান্য মুসলিম গণিতজ্ঞের কাজগুলো নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখে। এভাবে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণাগুলো গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই কোপারনিকাস বা গ্যালিলিওর মতো মহাকাশবিজ্ঞানীরা আবির্ভূত হন এবং বিভিন্ন তত্ত্ব সংযোজন করেন। যেগুলোকে আজকের দিনে এসে আবার সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে ইউরোপে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা তাদের ভিন্নধারার মত প্রদানের জন্য যেভাবে নির্যাতিত ও হয়রানির শিকার হয়েছেন, মুসলিম বিজ্ঞানীরা তা হননি। কেননা, মুসলিম যুগে বৈজ্ঞানিক চর্চা এক ধরনের ইবাদত হিসেবেই গণ্য হতো।

অ্যালজেবরা বা বীজগণিতের মতো মহাকাশ বিজ্ঞানেরও অনেক ব্যবহারিক প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। মুসলিমদের সময়ই মহাকাশ পরিমাপক যন্ত্রের (এস্ট্রোলেব) বিকাশ ঘটে। এই যন্ত্রটির আদি সংস্করণ নির্মিত হয়েছিল গ্রিক আমলে। এর কাজ ছিল তারার গতিপথকে ব্যবহার করে অক্ষাংশ নির্ণয় করা। মুসলিম আমলে এর সাথে গণিত ও মহাকাশ বিজ্ঞানের আরও কিছু উপকরণ যোগ করা হয়। এর ফলে নৌপথে জাহাজ চলাচলে সুবিধা হয়। আকাশে কিছু তারাপুঞ্জির দিকে এই এস্ট্রোলেব ধরে রাখলে এর মাধ্যমে জাহাজটির অবস্থানও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। তার সাথে বিভিন্ন শহরের তথ্য সংবলিত বইটি (এই বইটির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; মক্কা থেকে বিভিন্ন শহরের দূরত্ব ও কিবলার নির্দেশনা পেতে বইটি রচনা করা হয়েছিল) মিলিয়ে দেখলে জাহাজের নাবিক সহজেই নিজের অবস্থান সনাক্ত করে প্রত্যাশিত গন্তব্যের দিকে জাহাজ ধাবিত করতে পারত। এর ফলে অনেক দূর থেকে জাহাজে চড়ে যারা মক্কায় হজে যেতেন, তাদের যাতায়াতও অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়। আর যেহেতু মুসলিম সভ্যতা তখন সুদূর স্পেন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাই বাস্তবিক কারণেই যাতায়াত সহজ ও নিরাপদ করা অনেক বেশি জরুরি ছিল। ১৮শ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত এই এস্ট্রোলেব নৌপথে যাতায়াতের প্রধান সহায়ক যন্ত্র হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

ভূগোল

গণিতের ওপর ভর করে যেমন মহাকাশবিজ্ঞান বিকশিত হয়েছিল, ঠিক একইভাবে মহাকাশ বা জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে ভূগোলের বিস্তার ঘটে। মুসলিমদের সাম্রাজ্য সোনালি যুগে যতটা বিশাল ছিল, এত বিশাল আকারের একক নেতৃত্বের রাজ্য মানব ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। এত বড়ো সাম্রাজ্য একক শাসনের আওতায় থাকায় সেখানে দূরবর্তী যাতায়াত তুলনামূলক নিরাপদ ও সাধারণ ঘটনা হিসেবেই বিবেচিত হতো। এরপরও এটা বিস্ময়কর যে, ঠিক সেসময়েই মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু ভূগোলবিদের আবির্ভাব হয়েছিল।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে পৃথিবী গোলাকার– এত দিন এরকম যে ধারণা ছিল তা আসলেই একটা গালগল্প। সত্যি কথা হলো, একেবারে প্রাচীনকাল থেকে সবাই এটা জানত– পৃথিবী একই রকম সমতল নয়। বিশেষ করে নাবিকরা এটা খুব ভালোভাবে বুঝত। কারণ, তাদের নৌকাগুলো কোথাও থাকত একটু সোজা হয়ে, আবার কোথাও কাত হয়ে। প্রাচীন গ্রিকরা পৃথিবীর আকৃতি মাপার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা এটা করতে গিয়ে শুধু আটলান্টিক মহাসাগরের পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে তারা পৃথিবীর যে আকৃতি ধরে নিয়েছিল, তা পৃথিবীর প্রকৃত পরিধির তুলনায় অনেকটাই কম। বরং আব্বাসীয় আমলের ভূগোলবিদরা আরও অনেক বেশি যথার্থ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। তারা ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতিকে ব্যবহার করে নির্ণয় করেন পৃথিবীর ব্যাসরেখাটির আয়তন ১২,৭২৮ কিলোমিটার, যা এর প্রকৃত আয়তনের তুলনায় মাত্র ৩৭ কিলোমিটার কম। অন্যদিকে, তারা পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেছিলেন ৩৯,৯৬৮ কিলোমিটার। আর বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করেছে, পৃথিবীর প্রকৃত পরিধি এর চেয়ে একটু বেশি ৪০,০৭৪ কি.মি.। বর্তমান যুগে আমরা স্যাটেলাইট ও টেলিস্কোপ ব্যবহার করে এই পরিমাপটি করেছি। কিন্তু আব্বাসীয় বিজ্ঞানীরা এই যন্ত্রগুলো ছাড়াই কীভাবে বাস্তবের এতটা কাছাকাছি যেতে পারল, তা ভাবলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়।

১৪ শতাব্দীতে মরক্কোর মুসলিম পণ্ডিত ও পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ১ লাখ ৭০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ পরিভ্রমণ করেন। তিনি পশ্চিম আফ্রিকা, ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পুরোটা ঘুরে দেখেন।

মুসলিমদের ভৌগোলিক জ্ঞান যে শুধু পৃথিবীর আকৃতি নির্ণয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। তখন পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন নিয়েও অনেকগুলো অসাধারণ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর আগপর্যন্ত গ্রিকদের তৈরি করা মানচিত্রকেই বিস্তৃত করে করে কাজ চালিয়ে নেওয়া হতো। মুসলিমদের হাতে আঁকা মানচিত্র কতটা উন্নত হতে পারে তার একটি উদাহরণ পাওয়া যায় মুহাম্মাদ আল ইদরিসির কাজগুলো দেখলে। তিনি ১২ শতকের সিসিলির বাসিন্দা ও ভূগোলবিদ। সিসিলি ১১ শতক পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১১ শতকের শেষদিকে নরম্যানরা মুসলিমদের হাত থেকে সিসিলি ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু আল ইদরিসি যখন জন্ম নেন তখন নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজারের শাসনকাল চলছিল। তিনি নরম্যান হলেও মানুষ হিসেবে সহনশীল ও স্বাধীন মানসিকতার ছিলেন। তাই তিনি আল ইদরিসিকে কাজ করার সুযোগ দেন। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় ইদরিসি পৃথিবীর একটি মানচিত্র তৈরি করেন। এই ম্যাপটি অনেকটাই বিস্তৃত ছিল। এর আগে এমন বিশ্বমানচিত্র কেউ এতটা বিস্তারিত করে আঁকতে পারেনি। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে এই বিশ্বমানচিত্রই বিশ্ব জুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা শুধু পৃথিবীর একটি অবয়বগত মানচিত্রই ছিল না; বরং পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং সমাজব্যবস্থা সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলো ঘুরে এসেছেন, এমন পর্যটকদের কাছ থেকে এই তথ্যগুলো সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও তেমন কোনো প্রশ্ন ছিল না।

মুসলিম ভূগোলবিদদের কাছে পরিচিত পৃথিবী যেমন আকর্ষণীয় ছিল, ঠিক তেমনি অজানা পৃথিবীটা নিয়েও তাদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। পশ্চিমা বয়ান অনুযায়ী ক্রিস্টোফার কলম্বাস সর্বকালের সেরা একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ১৪৯২ সালে নতুন

পৃথিবী আবিষ্কার করেন। কিন্তু তার এই আবিষ্কারের গল্প ম্লান হয়ে যায়, যখন তার আগের কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা একটি তথ্যকে আমরা সামনে আনি। আর সে তথ্যের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ শক্ত প্রমাণাদিও আছে। সে তথ্যটি হলো, ১০ম শতাব্দীতেই ভাইকিংসরা আজকের কানাডা আবিষ্কার করেছিল। ফলে কলম্বাস আবিষ্কার করার কয়েকশ বছর আগেই মুসলিমদের আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

যেমন, ১০ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ ও ইতিহাসবিদ আল মাসুদি, ৮৮৯ সালেই মুসলিম আইবেরিয়া থেকে পশ্চিমে দেলবা সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত একটি নৌ যাত্রাভিযান পরিচালনার কথা লিখে গেছেন। কয়েকশ বছর পর এই বন্দরে কলম্বাসের নৌকাও এসে ভিড়ে। আল মাসুদির লেখায় আরও জানা যায়, তারা সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কিছু ব্যাবসাও করেছিলেন। তারপর নিজ দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। আল মাসুদির লেখা থেকেই প্রথমবারের মতো আটলান্টিক মহাসাগরের নতুন এই দ্বীপের কথা জানা যায়। পরবর্তী সময়ে আল ইদরিসির মাধ্যমে জানা যায়, মুসলিম একদল নাবিক দীর্ঘ ৩১ দিন আটলান্টিক মহাসাগরে নৌ অভিযান পরিচালনা করে একটি অজানা দ্বীপে নোঙ্গর ফেলেছিলেন। তারপর স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের আটক করে নিয়ে যায়। সেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে একজন আরবি ভাষা জানত। তারই মধ্যস্থতায় পরবর্তী সময়ে এ আটক মুসলিম বণিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

আটলান্টিকে অভিযান পরিচালনাসংক্রান্ত আরেকটি তথ্য পাওয়া যায় মালি থেকে। ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেসময় পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম এই দেশটির শাসকরা অজানা দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আফ্রিকার উপকূল থেকে ২০০টি জাহাজের বিশাল এক নৌবহর পশ্চিমে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারা সেদিকে গিয়ে ঝড়ের কারণে আর এগোতে পারেনি। প্রথম একটি জাহাজ ফিরে এসে এই খবরটি দেওয়ার সাথে সাথে মালির রাজা বাকি জাহাজগুলোকেও ফিরিয়ে এনে আটলান্টিক অভিযানে পাঠান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই জাহাজগুলোর অগ্রগতি নিয়ে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আটলান্টিকে কলম্বাসের অভিযানের আগেই মুসলিমদের চালানো এই নৌযাত্রাগুলোর ব্যাপারে ততটা জোরালো প্রমাণাদি পাওয়া না গেলেও এটা সত্য যে, মুসলিম ভূগোলবিদদের বর্ণনাগাঁথায় এসব অভিযানের কথা অনেক আগে থেকেই ছিল। মুসলিমদের এসব নৌ-যাত্রার কথা আড়ালে থেকে যাওয়ায় সর্বপ্রথম ইউরোপ থেকে নাবিকরা গিয়ে আমেরিকাসহ অজানা এসব দেশ আবিষ্কার করেছে বলে ইতিহাসের বয়ান তৈরি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর আমরা মুসলিমরাও এসব বিভ্রান্তিকর উপাখ্যান বিশ্বাস করে বসে আছি। যদি মুসলিম সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল এই আবিষ্কারগুলোর কথা আমরা সকলের সামনে নিয়ে আসতে পারি তাহলে পৃথিবীতে নয়া দেশ আবিষ্কারের যে প্রচলিত ইতিহাস রয়েছে তাকে হয়তো আমূল পালটে আবার নতুন করে লেখা যাবে।

চিকিৎসাশাস্ত্র

চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসের কথা বললে অনেকেই ভুল ধারণা করে বসে যে, চিকিৎসাশাস্ত্র বোধ হয় অনুমাননির্ভর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে। এমনকি শিক্ষিত অনেকের কাছেই যদি বিংশ শতাব্দীর আগের চিকিৎসার কথা জানতে চাওয়া হয়, তার মানসপটে হয়তো সহজ-সরল গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো– মুসলিম বিশ্বে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ একটি ঐতিহ্য রয়েছে, যার প্রাথমিক ভিত্তি ছিল প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা থেকে পাওয়া তথ্য এবং পাশাপাশি গবেষণালব্ধ জ্ঞান। যদিও আধুনিক সময়ে এসে অনেকের কাছেই এই কথাগুলো অপরিচিত মনে হবে, তারপরও এখনও বিশ্বের অনেক জায়গাতেই চিকিৎসাশাস্ত্র প্রসঙ্গে মুসলিম সোনালি যুগের অসাধারণ সব চিকিৎসাবিদদের লেখা পাওয়া যায়। যা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের দক্ষতাই প্রমাণ করে। মুসলিমদের সে যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রেও এতটাই অগ্রগতি হয়েছিল যে, সে সময়টিকে বিশ্বের চিকিৎসা ইতিহাসের সবচেয়ে আলোকিত যুগ হিসেবে অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হবে না। একইসাথে এটাও ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, মুসলিম চিকিৎসাবিদদের সে অবদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আজকের এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

মুসলিম চিকিৎসাবিদরা তাদের সফলতার যাত্রা শুরু করেন সেখান থেকেই, যেখানে এসে গ্রিক সভ্যতার বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ গ্যালেন ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রাচীন যুগে গ্যালেনকে চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক বলে মনে করা হতো। প্রাচীন এই গ্রিক চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখে গিয়েছিলেন– মানুষের শরীর চারটি বিশেষ ধরনের ধাতু দিয়ে তৈরি হয়েছে। এগুলো হলো– রক্ত, কালো পিত্ত, হলুদ পিত্ত ও কফ। তার মতে, যখনই শরীরের ভেতরে থাকা এই চারটি ধাতুর মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়, তখনই মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়। তার এই তত্ত্ব সেসময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তবে এর মধ্যে অনেকটা ভুল ধারণা মিশে ছিল। তারপরও তিনি তার মৃত্যুর বহুদিন পর পর্যন্ত সব ধরনের চিকিৎসাবিদদের কাছে ভীষণভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছেন।

১০ম শতাব্দীতেই বাগদাদে চিকিৎসক হিসেবে লাইসেন্স ইস্যু করার জন্য একটি পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছিল। কেউ যদি চিকিৎসক হিসেবে রোগীর চিকিৎসা করতে চাইতেন, তাহলে তাকে সে পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হতো।

গ্যালেনের এই তত্ত্বকে প্রথমবারের মতো চ্যালেঞ্জ করেন নবম শতকের মুসলিম চিকিৎসাবিদ মুহাম্মাদ ইবনে জাকারিয়া আল রাজি। বাগদাদের এ চিকিৎসক মানবদেহের তাত্ত্বিক বয়ানের বিপরীতে একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি *ডাউটস এবাউট গ্যালেন* নামে একটি

রচনা লেখেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, শুধু ধাতুর ভারসাম্যহীনতার কারণেই মানুষ অসুস্থ হয় না; বরং মানুষকে যদি সুস্থ থাকতে হয়, তাহলে বেশ কিছু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি কফ, মাথাব্যথা, আমাশয়ের মতো সাধারণ কিছু রোগব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

আল রাজি যে শুধু শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ বা উপসর্গ নিয়ে কাজ করেছেন তা নয়। তিনি *দ্য ভারচুয়াস লাইফ* নামক মেডিকেল এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করেন। সে গ্রন্থে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নে সব সময় চলমান উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বইটিতে মতামত ব্যক্ত করেন, চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন একটি মহৎ উদ্যোগ এবং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা চিকিৎসকদের শুশ্রূষা করার মতো একটি যোগ্যতা আমানত হিসেবে দান করেছেন। এমনকি তার যারা শত্রু অথবা যাদের হয়তো পর্যাপ্ত সামর্থ্য নেই, তারাও সেবা পাওয়ার হকদার। এই বোধটি থাকার কারণে জাকারিয়া আল রাজি বাগদাদের বড়ো বড়ো হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে রোগীদের সেবা করতেন এবং এ কারণে তিনি বেশ জনপ্রিয়ও ছিলেন। তার রেখে যাওয়া অবদানগুলো পরবর্তী কয়েক শতাব্দী মুসলিম বিশ্বের ও ইউরোপীয় জগতের চিকিৎসাবিদদের নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছে।

এরপর যে মুসলিম চিকিৎসাবিদের নাম বলছি তিনি সর্বমহলেই বেশ পরিচিত। তার নাম ইবনে সিনা। অবশ্য মধ্যযুগের ইউরোপে তিনি অ্যাভেসিনা নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। ১১শ শতাব্দীর শুরুতে গোটা পারস্য জুড়ে পরিস্থিতি টালমাটাল থাকায় ইবনে সিনা এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হন। আর এটা করতে করতেই তিনি মুসলিম সোনালি যুগের শ্রেষ্ঠতম বহুবিদ্যাজ্ঞ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা ততদিনে বিজ্ঞানের নানা শাখায় যৌক্তিকতার প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন। ইবনে সিনার হাত দিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রেও সে ধারার সূচনা হয়। এর আগে জাকারিয়া আল রাজির কাজের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতার বিষয়ে কিছুটা ঘাটতি ছিল। সে ঘাটতিকে দূর করে ইবনে সিনা নতুন তত্ত্ব দাঁড় করান, যার মাধ্যমে মানবদেহকে অনেকগুলো ঘটনার মাধ্যমে সহজে বোঝা যায়। আজকের দিনে এসে হয়তো এগুলোকে কমনসেন্স বলে মনে হবে। কিন্তু যখনকার কথা বলছি, অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এগুলো রীতিমতো বৈপ্লবিক ধারণা হিসেবেই বিবেচিত হতো। ইবনে সিনা এ ধারণাগুলোর প্রবর্তন করে গেছেন। বেশ কয়েক বছর চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করার পর তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাতাস, পানি এমনকি মাটির মাধ্যমেও রোগব্যাধি ছড়াতে পারে। তা ছাড়া প্রতিটি রোগের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং রোগগুলোর চিকিৎসাও করতে হবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়েই।

ইবনে সিনাই বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানী, যিনি নিরীক্ষামূলক ওষুধ আবিষ্কার করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ, *আল কানুন (The Canon of Medicine)* -এ তিনি মতামত দেন যে, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার। শুধু তত্ত্বের ভিত্তিতেই ওষুধ দিলে চলবে না। যে ওষুধ দিয়ে মানুষের উপকার হয় না বা সুস্থতা আসে না, ইবনে সিনা সেটাকে ওষুধ বলে মনে করতেন না। তার মতে, চিকিৎসাশাস্ত্র হলো পর্যবেক্ষণ এবং যৌক্তিকতার একটি সমন্বয়। এটাকে ঘিরে কোনো রহস্য নেই, আর এখানে ভাগ্যের কোনো ব্যাপারও নেই।

মুসলিম বিশ্বে কিংবা এর বাইরে যারাই চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে কাজ করতে চাইত, তাদের সকলের জন্যই ইবনে সিনার লেখা এই *আল কানুন* বইটি রীতিমতো অবশ্যপাঠ্য বই হিসেবেই গণ্য হতো। ১৭ শতকে ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদরা এই বইটির ল্যাটিন ভাষার অনুবাদ পড়ে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে ধারণা নিতেন। অন্যদিকে, ১৩-১৪ শতকে চীন শাসন করত ইউয়ান রাজবংশ। সে আমলেই এই বইটিকে সেখানকার মুসলিমরা চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করে সেখান থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এই বইটির এত জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার কারণ– এখানে শুধু রোগের উপসর্গ ও প্রতিকার নিয়ে কথা বলা হয়নি; বরং এটা ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রসংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ একটি এনসাইক্লোপিডিয়া। এ বইতে অ্যানেসথিশিয়া, স্তন ক্যান্সার, জলাতঙ্ক, বিষক্রিয়া, আলসার, কিডনির নানা রোগ এবং যক্ষ্মার বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। এর পাশাপাশি ইবনে সিনা এখানে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যকার যোগসূত্র নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, মনের ভেতরে থাকা নেতিবাচক ধারণাগুলো বিষক্রিয়া ও ব্যথার মতোই শরীরের ক্ষতি করে। বর্তমান সময়ে এসে দাবি করা হয়– মন ও শরীরের মধ্যকার এই সম্পর্কটি প্রথম বের করেছেন ফ্রয়েড ও জাং-এর মতো মনস্তাত্ত্বিকেরা। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, ইবনে সিনা ও তার সমসাময়িক মুসলিম চিকিৎসাবিদরাই সর্বপ্রথম এ তথ্য আবিষ্কার করেন।

---

৮৭২ সনে মিশরের তৎকালীন শাসক আহমাদ ইবনে তুলুন ফুসতাত নামক এলাকায় একটি হাসপাতাল নির্মাণ করার জন্য ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেন। এই হাসপাতাল থেকে জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। এই হাসপাতালে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য পৃথক একটি ওয়ার্ডও চালু করা হয়।

একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী কখনোই তার প্রত্যাশিত মানের বড়ো বড়ো কাজ করতে পারবেন না, যদি না তাকে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে সহযোগিতা করা হয়। আর মুসলিমদের সোনালি যুগের শাসকরা এই সত্যটা চমৎকারভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তৎকালীন মুসলিমদের হাতে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও রাজনৈতিক সক্ষমতা ছিল। তাই এর সুব্যবহার করে সে আমলের মুসলিম শাসকরা বেশ কিছু বিশাল আকারের

হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। হাসপাতাল তৈরি করার এই চিন্তাটি আসে গরিব নাগরিকদের সেবা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে। কেননা, যারা অর্থশালী ছিল তারা চিকিৎসকদের বাসায় ডেকে নিয়ে ঘরোয়াভাবে চিকিৎসা নিতে পারত। কিন্তু গরিবদের তো সে সুযোগ ছিল না। আর সে কারণে সুবিধাবঞ্চিতদের সেবা দেওয়ার জন্য মুসলিম আমির ও খলিফারা গোটা মুসলিম বিশ্বে অসংখ্য হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এসব হাসপাতাল থেকে যেকোনো মানুষ তাদের প্রয়োজনমতো সেবা গ্রহণ করতে পারত।

নবম শতকের শুরুতেই বাগদাদে প্রথম হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। পরে আরও অনেক হাসপাতাল বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব হাসপাতালে বেশ কয়েকজন নার্স, বিশেষজ্ঞ ও সার্জনরা চাকরি করতেন। এখানে বহির্বিভাগ, মানসিক রোগীদের বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ডও ছিল– অনেকটা আজকের সময়ের হাসপাতালগুলোর মতোই। বর্তমান হাসপাতালের সাথে তখনকার দিনের হাসপাতালের মূল যে পার্থক্য ছিল তা হলো– এখনকার সময়ে তো কাউকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না, কিন্তু সে আমলে যাদের সামর্থ্য ছিল না তাদের রাষ্ট্রীয় খরচেই যাবতীয় চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হতো। যারা এ হাসপাতালগুলোতে অর্থ বিনিয়োগ করত, তারা লাভের আশায় করত না। তারা জানত ও বিশ্বাস করত, ইসলাম সব সময় তেমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে– যা ধর্ম-সামর্থ্য নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য একইভাবে কাজ করবে। নবম শতাব্দীতে বাগদাদে প্রথম হাসপাতাল নির্মিত হলেও দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে গোটা মুসলিম বিশ্বের সব শহরেই বিশেষত কায়রো, বাগদাদ, দামেস্ক, মক্কা, মদিনা, গ্রানাডা এমনকি আইবেরিয়াতেও হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত অটোম্যান সাম্রাজ্যেও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এই হাসপাতালের প্রচলন অব্যাহত থাকে। আর অটোম্যানদের কাছ থেকে ধারণা নিয়ে পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের হাসপাতাল নির্মাণ শুরু করা হয়।

ইউরোপে যে রেনেসাঁ হয় সেসময় অসংখ্য আরবি বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং পাদুয়া ও বলোগনার মতো বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর সূচনা করা হয়। ইউরোপীয়রা আল রাজি ও ইবনে সিনার চিন্তার ওপরই কাজ শুরু করে এবং এক পর্যায়ে সে চিন্তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। আজকের দিনে এসে আমরা চিকিৎসাশাস্ত্রের যে অগ্রগতি দেখি, হাসপাতালের মতো যেসব বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান দেখি, সেগুলো বাহ্যত পশ্চিমা জগৎ থেকে এলেও এর ভিত্তি হলো মুসলিমদের সোনালি যুগ। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে সভ্যতার যে দ্বন্দ্ব দেখি, তার অংশ হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তিক এ কর্মকাণ্ডগুলোকে নিয়ে এক ধরনের লুকোচুরি খেলা চলে। ফলে, একটি সভ্যতার অবদানকে উঁচুতে উঠাতে গিয়ে আরেক সভ্যতার অবদানকে বেমালুম অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করা হয়।

পদার্থবিদ্যা

গণিতের ওপর ভর করেই মুসলিমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা কীভাবে বিশাল এ বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন, সে সম্বন্ধে যদি কিছুটা ধারণা পেতেই হয়, তাহলে বাস্তব জগতে গাণিতিক এসব নিয়ম বা সূত্রগুলো প্রয়োগ করার কোনো বিকল্প নেই। আর তা করতে গিয়েই বিশ্বের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ পদার্থবিদদের জন্ম হয়। মুসলিম পদার্থবিদরা প্রাচীন পদার্থবিদদের অবদানের ওপরও নির্ভর করেছেন। প্রাচীন সে জ্ঞানকর্মকে তারা আরবিতে অনুবাদ করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সে জ্ঞান নিয়ে নিবিড় চর্চা করে এক সময় তারা পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ কিছু অর্জন করতে সক্ষম হন। সে সময় তারা এমন কিছু অবদান ও ভূমিকা রেখে গেছেন, যা পরবর্তী সময়ে পৃথিবীকে নিউটন ও আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী উপহার দিয়েছে।

মুসলিম সোনালি যুগে পদার্থবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য কাজ যারা করেছেন, তাদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম আসে তিনি হলেন ইবনে হাইসাম। তিনি ৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৪০ সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন ইরাকের বাসিন্দা। আব্বাসীয় আমলে তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে মিশরে গমন করেন এবং সেখানে তৎকালীন ফাতেমীয় খিলাফতের অধীনে একটি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফাতেমীয় শাসক তাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। ফলে তিনি তাকে একটি বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখেন। হাউজ এরেস্টের এ বিষয়টা ইবনে হাইসামের জন্য সাপেবর হয়, এমনকি পদার্থবিদ্যার জন্যও। কেননা, সে বাড়িতে আটক থাকা অবস্থাতেই তিনি 'আলো' বিষয়ে বিশদ পড়াশোনা ও নিরীক্ষা চালানোর সুযোগ পান।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই 'আলো' নিয়ে মানুষের মনে বিস্তর আগ্রহ ছিল। ইবনে হাইসামের সময়ে আলো বিষয়ে যে ধারণাটি এর আগে চালু ছিল তা এসেছিল গ্রিক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী টলেমি থেকে। টলেমির ধারণা ছিল– চোখ থেকে আলো নির্গত হয়, পরে তা সামনে থাকা বস্তুর ওপর প্রতিফলিত হয়ে আবার আমাদের চোখে ফিরে আসে, তার ফলে আমরা সামনের সে বস্তুটিকে দেখতে পাই। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা থেকে চলে আসা এ ধারণাকে ইবনে হাইসাম মানতেই পারছিলেন না। তাই তিনি বিষয়টি নিয়ে অসংখ্য গবেষণা ও নিরীক্ষা পরিচালনা করেন। আলোর প্রকৃতি আর ধরনের ওপর তিনি একের পর এক নিরীক্ষা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে দর্শনের ওপর কম নির্ভর করে তিনি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এভাবে দীর্ঘদিন কাজ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আলো সম্বন্ধে দেওয়া টলেমির ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং রীতিমতো অসম্ভব। তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন, সামনে থাকা বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে

আসে। প্রতিক্ষণে এরকম অসংখ্য আলোকরশ্মি আমাদের চোখে এসে লাগে। আর সেগুলো থেকেই আমাদের মস্তিষ্ক প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে বস্তুগুলোকে সনাক্ত করে। ইবনে হাইসামের এই সমসাময়িক সময়েই পারস্যে বসে আবার ইবনে সিনা চোখের গাঠনিক প্রকৃতি আবিষ্কার করেন। তাই ইবনে হাইসাম যখন মিশরে বসে আলোর উৎস সম্পর্কিত তথ্য আবিষ্কার করেন, ঠিক তখন পারস্যে ইবনে সিনা আবিষ্কার করলেন আলো চোখের ভেতরের নানা স্তরের ভেতর দিয়ে কীভাবে আসা যাওয়া করে। দিকে দিকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা এভাবেই একের পর এক অজানাকে আবিষ্কার করছিলেন।

দীর্ঘ গবেষণা ও নিরীক্ষা চালানোর পর ইবনে হাইসাম *কিতাবুল মানাযির (Book of Optics)* নামে একটি বই রচনা করেন, যা সে সময়ে প্রবলভাবে সমাদৃত হয়। এ বইতে ইবনে হাইসাম জানান, আলো হলো অসংখ্য আলোকরশ্মির সমষ্টি– যা সব সময় সরলপথেই পরিভ্রমণ করে। এ তথ্যের ওপর ভর করেই তিনি ক্যামেরা অবসকিউরা আবিষ্কার করেন। এটা হলো এমন এক যন্ত্র, যেখানে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট একটি বক্স থাকে। বক্সের যে পাশে ছিদ্রটি অবস্থিত, সে পাশে বক্সের বাইরে যা আছে তার আলো এ ছিদ্র দিয়ে বক্সের ভেতরে প্রবেশ করে এবং বিপরীত পাশে উলটা চিত্র অভিক্ষেপ করে। যারা আধুনিক ক্যামেরার কার্যপ্রণালির সাথে পরিচিত, তারা বুঝতে পেরেছেন যে এভাবেই ক্যামেরা কাজ করে। পার্থক্য হলো বর্তমানে লেন্স সংযোজিত থাকে।

ইবনে হাইসাম এই ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট ক্যামেরা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ফটোগ্রাফির আধুনিক অগ্রগতির শত শত বছর পূর্বে। আর তার এই আবিষ্কার ছাড়া ক্যামেরা বানানো সম্ভব হতো না। যদিও আধুনিক ক্যামেরা বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা এসেছে ইবনে হাইসামের আবিষ্কারেরও প্রায় ১ হাজার বছর পর। তিনি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানকে নির্ণয় করার জন্য অপটিকস এবং মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে একই সাথে কাজ করেছিলেন। আলোর প্রতিঃসরণসংক্রান্ত নীতিমালাকে কাজে লাগিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন যে, সূর্যাস্তের সময় সূর্যের আলো কোনো কর্নার বা বাঁকা গতিপথ থেকে পৃথিবীতে এসে পড়ে, তার ওপর ভিত্তি করেই আকাশের রং পালটায়। সূর্যের রং এবং অবস্থানকে বিশ্লেষণ করে তিনি বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত আরও অনেকগুলো তথ্য আবিষ্কার করেন। বহু শতাব্দী পর যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সেভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহসহ অন্যান্য যান পাঠায়, তখন ইবনে হাইসামের এসব তথ্য ও আবিষ্কার যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়।

ইবনে হাইসামের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে কয়েক ভলিউম বই লেখা যায় এবং বাস্তবে হয়েছিলও তাই। তিনি ২ শতাধিক বই লিখে গেছেন, যদিও তার মধ্যে মাত্র কয়েক ডজন এখন পাওয়া যায়। তিনি চুম্বক লেন্স, গতিবিদ্যা, নিরীক্ষামূলক জ্যামিতি, ক্যালকুলাস, মহাকাশ বিজ্ঞান এবং নিরীক্ষাধর্মী মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করা প্রথম ব্যক্তি। এত সব বিষয় নিয়ে যদি কেউ সত্যিই কাজ করতে পারে, তাহলে সে বুঝবে যে ইবনে হাইসাম কত বড়ো মাপের জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। তার প্রদর্শিত পথ বেয়েই বিজ্ঞানীরা আজ নিত্য নতুন আবিষ্কার করে যাচ্ছেন। ইবনে হাইসাম প্রথমে পর্যবেক্ষণ এবং পরে গবেষণার যে কৌশল প্রণয়ন করেছেন, তাই আজ বিজ্ঞানের প্রধান কর্মকৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আর তার এই কৌশলের ওপর ভর করেই বিজ্ঞানকে প্রাচীন গ্রিক দর্শন থেকে বা সেই দর্শনের প্রভাব থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে। ইবনে হাইসাম কেন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এতটা গুরুত্ব দিলেন, সে প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলে গেছেন, “আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে সব সময় জ্ঞান ও সত্যকে জানার চেষ্টা করেছি। আর এটা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আল্লাহকে জানার জন্য, তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সত্য ও জ্ঞানকে অনুসন্ধান করার চেয়ে উত্তম কোনো উপায় আর হতে পারে না।”

দ্বাদশ শতকে আল জাজারি নামে একজন মুসলিম আবিষ্কারক ছিলেন, যিনি অসংখ্য অটোমেটিক মেশিন নির্মাণ ও নকশা করে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– অটোমেটিক (স্বয়ংক্রিয়) হাত ধৌতকরণ যন্ত্র, ঘড়ি এবং পানিচালিত মিউজিকাল রোবট।

ইবনে হাইসামের ইন্তেকালের পর পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিম বিজ্ঞানীরা তার আবিষ্কারগুলোকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগিয়ে আরও অগ্রগতি সাধন করে। ফলে পুরোনো যন্ত্রগুলোকে বাতিল করে একের পর এক নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হতে থাকে। সামান্য একটা ঘড়ি থেকে শুরু করে রসায়নের গবেষণাগার– প্রতিটিতেই ব্যাপক উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে। ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, পানির পাম্প, চোখের চশমা, কম্পাস, ইঞ্জিনবিহীন বিমান কিংবা পানিচালিত রোবট মুসলিম বিজ্ঞানীরা এসব ১৩ শতকের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলে। এভাবে আরও অনেক কিছুই বলা যাবে– যা আমাদের পরিচিত, কিন্তু মুসলিমরা এগুলোর আবিষ্কার বহু আগেই করে গেছেন। এর পাশাপাশি এটাও প্রণিধানযোগ্য, মুসলিমরা যে শুধু বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন তা নয়; বরং প্রযুক্তির দিক থেকেও তারা একটি বিশাল বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন মুসলিমদের বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার গতি হ্রাস পায়, ক্রুসেডার ও মোঙ্গলরা যখন মুসলিম সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেয়, তখন খ্রিষ্টান অধ্যুষিত ইউরোপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলিমদের সে সফলতার জায়গাটি দখল করে নেয়। ফলে কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটনের হাত দিয়ে বিজ্ঞানের আরেক দফা উত্থান বিশ্ববাসী দেখতে পায়। এসব ইউরোপীয় কিংবদন্তিতুল্য বিজ্ঞানীদের সবাই মুসলিমদের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলির ওপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামি জ্ঞানচর্চা

পদার্থবিদ্যা ও গণিতের ওপর ভর করে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছিল। আল্লাহর রাসূল γ-এর ওফাতের পর কুরআনের মর্মবাণী এবং রাসূল γ-এর রেখে যাওয়া সুন্নাতকে ধারণ ও উপলব্ধি করার জন্য জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা-উপশাখাও এ সময় প্রবর্তন করা হয়।

ইসলামি জ্ঞানের মৌলিক কাঠামোটি কেমন হবে তা আমরা পরবর্তী সময়ে বুখারি শরিফের সংকলনে যুক্ত হওয়া হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারি। হাদিসটি এরকম– একবার রহস্যময় একজন মানুষ নবিজি γ-এর কাছে এলেন এবং তাকে তিনটি বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করতে বললেন। এগুলো হলো– ঈমান. ইসলাম ও ইহসান। রাসূল γ এর উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, তাঁর নবি ও রাসূল, শেষ বিচারের দিন এবং তাকদিরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো ঈমান। আর ইসলাম বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, রমজান মাসে রোজা রাখা এবং যাদের সামর্থ্য আছে তাদের জন্য হজ আদায় ও যাকাত প্রদান করাকে বোঝায়। আর ইহসান হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, যেন আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি। যদি আমরা তাকে দেখতে পারার মতো অনুভূতি নিজের ভেতর সৃষ্টি করতে নাও পারি, তাহলে এতটুকু অন্তত দৃঢ়ভাবে অনুভব করা যে, তিনি অবশ্যই আমাদের দেখতে পাচ্ছেন।

এই হাদিসের বয়ানের ওপর ভিত্তি করে ইসলামি জ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিতগণ এই বিজ্ঞানকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। এগুলো হলো ইসলামি বিশ্বাস, ইসলামি ব্যবস্থাপনা ও আধ্যাত্মিকতা।

ফিকহ

সাধারণভাবে ফিকহ বলতে ইসলামি আইনকেই বোঝানো হয়। তবে এই ধারণাটি ফিকহের মূল বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। আজকের সময়ে আধুনিক আইন বলতে যা বোঝায়, অনেকে ফিকহকেও সেই একই পাল্লায় ফেলার চেষ্টা করেন। প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা ফিকহ বলতে মানুষের জীবনের প্রতিটি ধাপের কার্যক্রমকেই বোঝাতেন। তা একেবারে ব্যক্তিগত জীবন থেকে সামাজিক জীবন, এমনকি সরকারের নীতিমালা পর্যন্ত। তাই ফিকহকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের (জুরিসপ্রুডেন্স) আওতায় ব্যাখ্যা করাটাই অধিক সংগত হবে।

ফিকহ নিয়ে প্রাথমিক যুগের মুসলিম স্কলাররা যে চ্যালেঞ্জটিতে পড়েছিলেন তা হলো, কীভাবে তারা নবিজি γ-এর রেখে যাওয়া উদাহরণগুলোকে পরবর্তী সময়ে গতিশীল ও বিশ্বজনীন পৃথিবীতে প্রয়োগ করবেন। যেহেতু মুসলিম সাম্রাজ্য তৎকালীন সময়গুলোতে প্রবলভাবে বিস্তৃত হচ্ছিল এবং আইবেরিয়া থেকে ইরাক হয়ে ভারত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, তাই বিভিন্ন এলাকার বাস্তবতার আলোকে রাসূল γ-এর রেখে যাওয়া আদর্শকে প্রয়োগ করার জন্য সে সময়ের ফকিহগণ নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ফিকহ শাস্ত্র সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর (মৃ. ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কাজ করা প্রথম ব্যক্তি। তিনি পারস্যে জন্ম নিলেও বড়ো হন ইরাকে। ইরাকের সমাজব্যবস্থা দেখে ইমাম আবু হানিফা রহ. অনুভব করেন, তিনি এমন একটি সমাজে অবস্থান করছেন, যা রাসূল γ-এর রেখে যাওয়া মদিনা থেকে অনেকটা আলাদা। সে সময়ে ইরাক ছিল আরব-অনারব, মুসলিম-অমুসলিম ও শহুরে নাগরিক আর মরু বেদুইনদের মিলনকেন্দ্র। এত ধরনের বর্ণ, গোত্র ও বৈচিত্র্যময় মানুষের জন্য ইসলামি আইন ও বিধি-বিধানকে কীভাবে সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে– তা উদঘাটন করাই ছিল ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং তার সহকর্মীদের (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানি ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর) জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। এর পাশাপাশি তখন আরও একটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে। দৈনন্দিন জীবনের যে বিষয়গুলো নিয়ে পবিত্র কুরআনে সরাসরি কোনো আলোচনার উল্লেখ নেই, সেগুলোর ব্যাপারে কী ফয়সালা করা হবে? কিংবা বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনা নিয়ে যে মতবিরোধ রয়েছে, তার সমাধানই-বা কীভাবে করা যাবে?

এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও প্রথমদিকের অন্যান্য ফিকহ শাস্ত্রবিদদের জন্য একটি হাদিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। হাদিসটি এমন– রাসূল γ তাঁর সাহাবি মুয়াজ ইবনে জাবাল η-কে ইয়েমেন পাঠানোর সময় প্রশ্ন করেন, হে মুয়াজ! দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখন তোমার সামনে কোনো সমস্যা এসে উপস্থিত হবে, তখন তুমি কীভাবে তার সমাধান করবে? মুয়াজ η উত্তর দিলেন, আমি কুরআনের ভিত্তিতে এর সমাধান করব। তারপর মুয়াজ η-কে প্রশ্ন করা হলো, যদি কুরআনে সে সমস্যার সমাধান পাওয়া না যায়? তখন মুয়াজ η বললেন, তাহলে আল্লাহর রাসূল γ-এর সুন্নাহর ওপর নির্ভর করব। আবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, যদি রাসূল γ এই বিষয়ে সরাসরি কিছু না বলে থাকেন। তখন মুয়াজ η বললেন, তাহলে আমি আমার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার আলোকে সিদ্ধান্ত নেব। এই হাদিসটিকেই পরবর্তী যুগের ফিকহশাস্ত্রবিদরা নিজেদের কাজের কাঠামো হিসেবে নির্ধারণ করেন এবং এর ওপর ভিত্তি করেই তারা তাত্ত্বিক একটি ধারাবাহিকতা দাঁড় করান, যার নাম দেওয়া হয় উসূলুল ফিকহ (ইসলামি আইনশাস্ত্রের উৎস)।

মুসলিমদের যেকোনো কাজ নির্ধারণ কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআন হলো প্রথম ও প্রধানতম উৎস। আল্লাহ বলেছেন, কুরআনকে তিনিই হেফাজত করবেন। তবে কুরআন সাধারণ কোনো আইনগ্রন্থ নয়। মানুষকে খুব নির্দিষ্টভাবে কাজ ও কাজের ধরন বলে দেওয়া হয়েছে– এ সংক্রান্ত আয়াত কুরআনে খুবই কম। আর সে আয়াতসমূহ নিয়ে অনেক মতও তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে কোন মুসলিম কীভাবে তা পালন করবে, তা নিয়ে নানা আলোচনা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুরআনে মুসলিমদের নামাজ আদায় করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কখন কখন নামাজ পড়তে হবে বা কীভাবে নামাজ পড়তে হবে– সে বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট আলোচনা নেই। আর সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্যই আছে রাসূল γ-এর সুন্নাহ। মুসলিম ফিকহশাস্ত্রবিদরা হাদিসকে কুরআনের বিস্তারিত বিবরণ হিসেবেই বিবেচনা করেন। তাই মুসলিমরা কীভাবে নামাজ পড়বে, সে বিষয়ে যখন কুরআনে সরাসরি ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তখন ফকিহগণ তা নবিজি γ-এর জীবন থেকে বোঝার চেষ্টা করেন। বিশেষত তিনি কীভাবে নামাজ পড়তেন, সেটা পরবর্তী সময়ে নবির সাহাবিরা যেভাবে বর্ণনা করেছেন কিংবা তাদের পরবর্তী তাবেয়ি বা তাবে-তাবেয়ির বর্ণনা থেকে এ সম্পর্কে যা জানা যায়– সেগুলো থেকেই ফিকহের পণ্ডিতগণ তথ্য সংগ্রহ করতেন। তারপর সে তথ্যগুলোর আলোকে তারা নির্ধারণ করেন, মুসলিমরা কীভাবে নামাজ আদায় করবে। এভাবে রাসূল γ-এর সুন্নাহ ও সাহাবিদের জীবনচরিত যথাক্রমে ইসলামি আইনশাস্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃত হয়ে যায়।

এরপরও তৎকালীন ইরাকে এমন কিছু বিষয় থেকে যায়, যেগুলো নিয়ে কুরআন-হাদিস এবং সাহাবিদের জীবন থেকে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। সে অবস্থায় প্রথম যুগের ফকিহগণ নতুন আরেকটি ধারার সূচনা করেন, যার নাম কিয়াস। এই কিয়াস প্রবর্তনের যুক্তি ছিল

খুবই প্রাসঙ্গিক। যদি এমন কোনো বিষয় মানুষের সামনে চলে আসে, যেগুলোর ব্যাপারে প্রথম তিনটি উৎস থেকে কোনো নির্দেশনা পাওয়া না যায়, তাহলে আইনবিদরা দেখবেন, এই সমস্যার মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন কোনো সমস্যা আছে কিনা, যার ব্যাপারে কুরআন, হাদিস বা সাহাবিদের বর্ণনায় কোনো বার্তা পাওয়া যায়। তাহলে এই তিনটি উৎসের মধ্যে যেকোনো দুটি থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে সে আলোকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ধরা যাক, আমরা জানতে চাই, গাড়ি চালানোর বিষয়ে ইসলামি ফিকহের নির্দেশনা কী? এখন এটা খুবই বাস্তব যে, রাসূল γ-এর জমানায় বা সপ্তম শতকে গাড়ির প্রচলন ছিল না। তাই এ বিষয়ে কুরআন, হাদিস বা সাহাবিদের বর্ণনায় কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের এভাবে চিন্তা করতে হবে, গাড়ি চালানোর মূল উদ্দেশ্য হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত। আর ইসলামের প্রাথমিক যুগে গাড়ি না থাকলেও সে যুগের মানুষরা যাতায়াত করতেন; হয়তো ঘোড়া বা উট দিয়ে। তখন তারা কি দৃষ্টিভঙ্গিতে সে যাতায়াত করতেন, এসব বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সময়ের ফকিহগণ গাড়িতে যাতায়াতের বিষয়টিকে শরিয়তসম্মত বলেই অভিমত দিয়েছেন।

এতক্ষণ যে গাড়ির উদাহরণটি দিলাম, তা বেশ সহজ উপলব্ধির বিষয়। তবে কিয়াসের মূল ধারণা এর তুলনায় আরও অনেক গভীর ও সূক্ষ্ম। কোন উদাহরণ যথাযথ, কোন দৃষ্টান্তের সাথে কোনটাকে মেলানো হবে– এগুলো নিয়ে মুসলিম স্কলারদের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক ও ভিন্নমত দেখা গেছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন যে, কীভাবে ফিকহকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা যায়। তিনি ও তার সহকর্মীদের মতে– কেউ যদি কুরআন ও সুন্নাহকে শুধু পারিভাষিকভাবে উপলব্ধি করে তা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে, তাহলে তা হবে রীতিমতো অসম্ভব একটি বিষয়। কেননা, সমাজ প্রতিনিয়ত পালটে যাচ্ছে আর একেকটি এলাকার সমাজব্যবস্থা ও বাস্তবতা নবিজি γ-এর সময়কালীন মদিনার থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সমসাময়িক আরেক বিখ্যাত স্কলার ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ. (মৃ. ৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেছিলেন। ইমাম মালিক রহ. জন্ম নিয়েছিলেন মদিনায়, তিনি সেখানেই বড়ো হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাসূল γ-এর ওফাতের পর দেড়শ বছর চলে গেলেও মদিনা শহরটি সে অর্থে আহামরি পালটে যায়নি। তার প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের অধিকাংশই ছিলেন বিভিন্ন সাহাবির বংশধর। ফলে ইসলামের ব্যাপারে তারা যা শিখেছেন, যতটুকু জেনেছেন তার বেশিরভাগই ছিল সাহাবিদের পরম্পরা থেকে পাওয়া জ্ঞান ও তথ্যভান্ডার থেকে। তাই ইমাম মালিক রহ.-এর মতে মদিনায় বসবাসরত অধিবাসীদের জ্ঞানও ইসলামের আইনশাস্ত্রের একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তার যুক্তি ছিল এই যে, যদি মদিনাবাসীগণ কোনো বক্তব্য বা কাজের বিষয়ে একমত হন, তাহলে বুঝতে হবে– সে জ্ঞানটি তারা সরাসরি সাহাবিদের কাছ থেকেই পেয়েছেন। আর সাহাবিগণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন রাসূল γ-এর কাছ থেকে। তাই এই উৎসটিকে সুন্নাতের মতোই বা কাছাকাছি পর্যায়ের শক্তিশালী বলে মনে করার অবকাশ আছে।

ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ অবশ্য স্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতিকে উসুলুল ফিকহের উৎস হিসেবে খুবই দুর্বল বলে বিবেচনা করতেন। একবার আবু হানিফা রহ.-এর ছাত্র মুহাম্মাদ আশ-শায়বানি মদিনায় গিয়ে ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে কিছু বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন। এই আলোচনার শেষে মুহাম্মাদ আশ-শায়বানি আবারও অনুধাবন করেন, তারা ইরাকে যে প্রক্রিয়াটিকে শরিয়তের উৎস হিসেবে বিবেচনা করছেন, সেটাই অধিক গ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে তিনি একটি বইও লিখেন, যার নাম *রেসপন্স ট্যু দ্য পিপল অব মদিনা*। এ বইতে তিনি ইমাম মালিক রহ.-এর ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বিমত করেন। কেননা, ইমাম মালিক রহ. স্থানীয় প্রথাকে আইনশাস্ত্রের একটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন। এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বের সাথে প্রণিধানযোগ্য, তা হলো– ফিকহ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রথম দিকে যদিও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল, তারপরও তারা কেউই কিন্তু অপরের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ ভুল বা বিপথগামী হিসেবে আখ্যায়িত করেননি। কেননা, তাদের এই মতপার্থক্য কোনো মৌলিক বিষয়ে ছিল না; বরং শাখা-প্রশাখাগত বিষয়েই মতভিন্নতা দেখা গিয়েছিল।

ফিকহের ক্ষেত্রে তৃতীয় মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিটি নিয়ে আসেন মুহাম্মাদ বিন ইদরিস আশ-শাফেয়ি (মৃ. ৮২০ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনের নাগরিক; একেবারে শৈশবেই জ্ঞান অর্জনের জন্য মদিনায় গমন করেন। তিনি ইমাম মালিক রহ.-এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। তার পূর্বসূরি দুই ইমামের কর্মকৌশলের বাইরে এসে ইমাম শাফেয়ি রহ. একটু ভিন্নভাবে অগ্রসর হন। মদিনার অধ্যয়নের পাঠ চুকিয়ে তিনি ইয়েমেন, ইরাক এবং মিশরেও দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। ইরাকে থাকা অবস্থায় তিনি আশ-শায়বানির সান্নিধ্য লাভ করেন। ফলে ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম হানিফা রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তিনি পরিচিত হন। তার নিজস্ব ভাবনা ও দর্শন ছিল পূর্ববর্তী দুই দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে আলাদা। তিনি ইরাক ও মদিনার আঞ্চলিক বাস্তবতার উর্ধ্বে ওঠে নিজ বিবেচনাবোধকে বেশি প্রাধান্য দেন। হাদিসকে যেভাবে তিনি পর্যালোচনা করতেন, সেটাও অন্যদের থেকে একটু ভিন্নতর ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইমাম আবু হানিফা রহ. সেসব হাদিসকেই অন্য সব হাদিসের চেয়ে বেশি পরিমাণ অগ্রাধিকার দিতেন, যেগুলো বহুল প্রচলিত এবং পরিচিত (এই হাদিসগুলো মুতাওয়াতির নামে পরিচিত)। তিনি এ হাদিসগুলোর ওপর ভিত্তি করে একটি বয়ান বা মানদণ্ড ঠিক করেছিলেন, যার ভিত্তিতে অন্য হাদিস, বিশেষ করে মুতাওয়াতির নয় এমন হাদিসগুলোকেও

তিনি মূল্যায়ন করতেন। এককথায় বলতে গেলে, তিনি বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো বয়ান তৈরি করেছিলেন, যার ওপর ভিত্তি করে তার গোটা ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড়িয়েছিল। এ মূলনীতিগুলোর সাথে যেগুলোকে মেলানো যেত না, সেগুলোকে তিনি যুক্তি দিয়ে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করতেন। অন্যদিকে, ইমাম শাফেয়ি রহ. ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন। কোনো হাদিস একক একটি সূত্র থেকে এলেই তা প্রচলিত মুতাওয়াতিরের তুলনায় দুর্বল, তিনি এমনটা মনে করতেন না। বরং তিনি একটি নতুন ধরনের কৌশল নির্ধারণ করেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল– ফিকহসংক্রান্ত বিষয়ে যখন সাংঘর্ষিক বক্তব্য ধারণ করছে এমন দুটি হাদিস তিনি পেতেন, যার একটি রাসূলের γ প্রাথমিক যুগে বর্ণিত আর আরেকটি পরবর্তী যুগে, তাহলে তিনি দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সর্বশেষ আসা হাদিসটিকে গ্রহণ করতেন। ফলে ইমাম শাফেয়ি রহ. যুক্তি ও বিবেচনাবোধকে কাজে লাগানোর নিজস্ব একটি পদ্ধতি বের করেন। তবে তার পূর্বসূরি দুই ইমাম ফিকহশাস্ত্রের উৎস নির্ধারণে যুক্তিকে যত বেশি বিবেচনায় নিতেন, তিনি ততটা নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।

চার প্রসিদ্ধ ইমামের মধ্যে সর্বশেষ এসেছিলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. (মৃ. ৮৫৫ সন)। তিনি ছিলেন ইমাম শাফেয়ির ছাত্র। এই চারজনের মধ্যে তিনি সবচেয়ে কম যুক্তির ওপর নির্ভর করেছেন এবং ফিকহের উৎসগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনিও তার পূর্ববর্তী তিন ইমামের মতো কিয়াসের অবকাশ রেখেছেন বটে, তবে তিনি এটাকে খুবই সীমিত পর্যায়ে রাখার ব্যাপারে মত দিয়ে গেছেন।

ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ি ও আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর এই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ফিকহে চারটি নতুন ধারার প্রচলন হয়, যেগুলোকে মাযহাব হিসেবে অভিহিত করা হয়। সময়ের বিবর্তনে এই চারটি মাযহাবই সুন্নি মুসলিমদের ফিকহশাস্ত্রের প্রধান চার ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কুরআন ও হাদিস থেকে কীভাবে বিধান নেওয়া হবে কিংবা যুক্তির ওপর কতটা নির্ভর করা যাবে– এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেউ কেউ হানাফি ধারা অনুসরণ করতে শুরু করে, আবার কেউবা হাম্বলি। এখানে বলা বাহুল্য, হানাফি মাযহাব তুলনামূলক উদার হলেও হাম্বলি মাযহাব অনেকটাই কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির। যেহেতু হানাফিরা যুক্তি ও বিবেচনাবোধকে ছাড় দেয়, তাই তুলনামূলকভাবে হানাফি মাযহাবের অনুসরণ করা সহজ হওয়ায় বিশ্বের বেশির ভাগ স্থানেই এ মাযহাব অনুসরণকারীর সংখ্যা বেশি। আব্বাসীয়, সেলজুক, অটোম্যান এবং মোগলসহ ইসলামি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অধিকাংশ শাসকগোষ্ঠী এই মাযহাবকে আইন হিসেবে প্রয়োগ করতেন। তা ছাড়া বৈচিত্র্যময় বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে উপস্থাপন করার সুযোগ থাকায় পৃথিবীর অনেক স্থানেই এ মাযহাবের অধিক গ্রহণযোগ্যতা দেখা যায়। বিশেষত মধ্য এশিয়া, তুরস্ক, বলকান, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরাকের বড়ো একটি অংশ, সিরিয়া ও মিশরে হানাফি মাযহাবের অনুসরণকারীদের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে, ইমাম মালিক রহ. জীবিত থাকা অবস্থাতেই ইসলামি সাম্রাজ্যের পশ্চিমের দিকে তার দৃষ্টিভঙ্গি জনপ্রিয় হতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা এবং আইবেরিয়াতে মালিকি মাযহাব বেশি অনুসৃত হয়। শাফেয়ি মাযহাব জনপ্রিয়তা পায় মিশরের কিছু অংশ, পারস্য, লেভান্তে, ইয়েমেন ও ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে। আর হাম্বলি মাযহাব আরব উপদ্বীপের বিশাল অঞ্চলে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। লেভান্তে ও আইবেরিয়ার কিছু অংশেও হাম্বলি মাযহাবের চর্চা দেখা যায়।

উল্লেখ্য, এই ইমামগণ ফিকহশাস্ত্রের ভিত রচনা করলেও তাদের ইন্তেকালের পর এই চর্চা থেমে যায়নি। ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ি ও আহমাদ রহ. তাদের স্ব স্ব ধারার সূচনা করার পর পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে তাদের অনুসারীরা সেই কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ইবাদত ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী নতুন নতুন অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। সেই সাথে তারা সরকারের কাঠামো এবং নীতিমালা নিয়েও বেশ কিছু নির্দেশনা প্রণয়ন করেন।

আকিদা

ইসলামের ফিকহশাস্ত্র নিয়ে যতটা মতপার্থক্য আছে, তার তুলনায় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আরও বেশি বিতর্ক বিদ্যমান। আলিমগণ একমত হয়েছেন, আইনশাস্ত্রে যে মতপার্থক্য আছে, সেগুলোর ততটা তাৎপর্য নেই। কিন্তু কারও ঈমান যদি রাসূল γ-এর প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে তার পরকালীন মুক্তি হওয়া রীতিমতো প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে যায়। আইনগত ভিন্নতাকে ফিকহের আওতায় মেনে নেওয়া গেলেও, ঈমান বা বিশ্বাসের ভিন্নতার ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই। কেননা, এতে সার্বিকভাবে একক দ্বীন হিসেবে ইসলামের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে যায়।

ইসলামি ধর্মতত্ত্বের মধ্যে প্রথম যে ইস্যুটা সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়, তা হলো খারিজি ইস্যু। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা খারিজিদের উত্থান নিয়ে আলোচনা করেছি। ৭ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে এই খারিজিরা খলিফা আলী η-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে! কেননা, তিনি আমিরে মুয়াবিয়া η-এর সাথে খিলাফত নিয়ে একটি সমঝোতায় বসেছিলেন। খারিজিরা ইতিপূর্বে আলী η-এর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল, আলী η তৃতীয় পক্ষের সাথে সমঝোতায় গেলেন, তখন তারা এই সিদ্ধান্তকে হযরত আলীর পক্ষ হতে ঈমানবিধ্বংসী গর্হিত পাপ হিসেবেই বিবেচনা করল। ফলে হযরত আলী η কিংবা যারাই এ ধরনের কাজ করুক না কেন, তাদের হত্যা করাকে খারিজিরা বৈধ হিসেবেই গণ্য

করল। তারা আলী 𝛈-কে হত্যা করেও ক্ষান্ত হয়নি; বরং পরবর্তী সময়ে যারাই তাদের মতের বিরোধিতা করেছে, তাদের হত্যা করেছে বা হত্যার উপযোগী সাব্যস্ত করেছে। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে তারা হত্যা ও রক্তপাতের একটি নির্মম ধারার সূচনা করেছিল।

খারিজিদের বড়ো সংকট ছিল, তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি সেসময়ের অধিকাংশ মুসলিমই মানতে পারেনি। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই খারিজি হয়েছিল। আলিমরা মনে করেন, ইসলামি দর্শনে ঈমান আর তার বাস্তবায়নের মধ্যে এ ধরনের বিচ্যুতির কোনো সুযোগ নেই। ইমাম আবু হানিফা রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন, আমরা কোনো মুমিনকে তার কোনো পাপের জন্য কাফিরের চোখে দেখব না, এমনকি যদি সে ভুলের মধ্যেও ডুবে থাকে। তিনি এরকম মত দেন, কারণ তার যুক্তি ছিল– রাসূল γ বা তাঁর সাহাবিদের মধ্যে এ জাতীয় কোনো দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ইসলামের প্রথম দিকের সব চিন্তাবিদরাই কাছাকাছি ধরনের মানসিকতা ধারণ করতেন এবং তারা কেউই খারিজিদের সমর্থন করেননি। আর ৬৬১ সালে খলিফা আলী 𝛈-কে হত্যা করার পর খারিজিরা কার্যত আর সেভাবে প্রভাবশালী হিসেবে থাকতে পারেনি। তাদের চিন্তাধারা কখনোই ইসলামের মূলধারার দর্শনে ঠাঁই পায়নি।

কিন্তু খারিজি বিভ্রান্তির প্রভাবের ইতি ঘটার সাথে সাথে নতুন আরেকটি চিন্তাধারার উত্থান ঘটে, যার কারণে ধর্মীয় দর্শনের বেশ কিছু জায়গায় নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নয়া এই চিন্তাধারার নাম ছিল মুতাজিলা। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তারা যৌক্তিকতার ওপর অত্যধিক নির্ভর করত। বিশেষ করে আল্লাহ ও অন্যান্য অদৃশ্য সত্তাকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রেও তারা যুক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিত। অন্য মুসলিমদের মতো তারাও কুরআন ও এর মর্মবাণীকে বিশ্বাস করত। পার্থক্য ছিল এই যে, আগের যুগের মুসলিমরা কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার বৈশিষ্ট্য, গুণবাচক নাম এবং এগুলোর মধ্যকার সূক্ষ্ম তারতম্য নিয়ে খুব একটা মাথা না ঘামিয়ে বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিত; কিন্তু মুতাজিলারা এগুলোর পেছনেই যুক্তিতর্ক করে বেশি সময় ব্যয় করত।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুরআনে আল্লাহর হাত বা তাঁর দেখার কথা বলা হয়েছে। মুতাজিলারা দাবি করত, এই আয়াতগুলো রূপক। যেহেতু হাত বা চোখ থাকাটা মানবীয় বৈশিষ্ট্য, তাই এগুলোকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলানো সংগত নয়। এভাবে মুতাজিলারা আল্লাহর কথা বলা, শোনা, দেখাসহ প্রতিটি বিষয় নিয়েই প্রশ্ন ও তর্ক উত্থাপন করে। তাদের মতে, কুরআন আক্ষরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার কথা নয়! কেননা, কুরআন যেহেতু নশ্বর, তাহলে এর মূল বয়ানকারী হিসেবে আল্লাহও নশ্বর হয়ে যান বা তাঁর অসীম হওয়ার ক্ষমতাও প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু অনন্ত ও অসীম, তাই সীমিত কোনো কিছুকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। মুতাজিলারা বলত, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যা মানুষের ভাবনা ও কল্পনারও বাইরে। ফলে মানবিক কোনো বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহকে বিবেচনা করা যাবে না। মুতাজিলাদের এই কথাগুলো সেসময় খুবই আলোচিত হয়। কেননা, তারা যেভাবে আল্লাহকে মানুষের ধারণার বাইরের সত্তা হিসেবে বিবেচনা করছে, কিংবা যেভাবে তারা কুরআনের কিছু আয়াতকে নিছক রূপক হিসেবে ধরে নিয়েছে, এ জাতীয় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাদের নেই। এভাবে কুরআনের কিছু আয়াতকে যদি একভাবে আর অন্য আয়াতকে যদি আরেকভাবে দেখা হয়, তাহলে সামগ্রিকভাবে গোটা কুরআনের বক্তব্য আরও জটিল ও বাস্তবতাশূণ্য হয়ে পড়তে পারে– যা কোনোভাবেই সঠিক চিন্তাধারা হতে পারে না।

একই সাথে তারা আল্লাহর ঐশী ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলে। মুতাজিলারা বলে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক, সুতরাং তিনি কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না। কেননা, পাপীকে শাস্তি দেওয়াটাই ন্যায়বিচারের দাবি। পাপীকে ক্ষমা করা হলে তা হবে ন্যায়বিচারের পরিপন্থি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক; সুতরাং তিনি পাপীকে ক্ষমা করতে সক্ষম নন। মূলধারার মুসলিমরা মুতাজিলাদের এসব কথাবার্তার সাথে একমত ছিল না। কেননা, তারা বিশ্বাস করত– আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান ও সবকিছু করতে সক্ষম।

খারিজিরা বুদ্ধিজীবী ও ইসলামি চিন্তাবিদদের কাউকেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলেও মুতাজিলারা তা করতে সক্ষম হয়। ফলে একটি চিন্তাশীল সম্প্রদায় হিসেবে মুতাজিলাদের উত্থান ঘটে। মুতাজিলা চিন্তাধারার সবচে প্রভাবশালী সমর্থক ছিলেন আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন। তিনি এই চিন্তাধারাকে তার সাম্রাজ্যের সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং সাম্রাজ্যের সকল আলিম ও চিন্তাবিদকেও এই দর্শন ধারণ করার আদেশ দেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে প্রভাবশালী বিরোধী ছিলেন ইমাম ইবনে হাম্বল রহ.। তিনি মুতাজিলাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ইমাম ইবনে হাম্বলের মতে– আল্লাহ তায়ালা তেমনই এক সত্তা, ঠিক যেভাবে পবিত্র কুরআনে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের যুক্তি বিবেচনাবোধ দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টাটাই বিরাট বড়ো ভুল। এরকম বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণে আব্বাসীয়রা ইমাম ইবনে হাম্বলকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। তা সত্ত্বেও তার প্রতিরোধ ও বয়ান গোটা মুতাজিলা চিন্তাধারা এবং আব্বাসীয় খিলাফতের দর্শনের ভিতকে নাড়িয়ে দেয়।

যদিও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মুতাজিলা চিন্তাকে প্রতিরোধ করার জন্য ইসলামের চিরায়ত ধারাটিই একমাত্র সমাধান। তারপরও মুতাজিলাদের সবচেয়ে বড়ো বিরোধী গ্রুপ হিসেবে কালক্রমে যারা আবির্ভূত হন, তারা হলেন আশআরি ও মাতুরিদি। আবুল হাসান আল আশআরি (মৃ. ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) ও আবুল মানসুর আল মাতুরিদি (মৃ. ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) মুতাজিলার যুক্তিনির্ভর দর্শন এবং হাম্বলিদের সরাসরি প্রত্যাখ্যান কৌশলের বিপরীতে ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হাজির হন। শুধু আল্লাহ ও ধর্মতত্ত্বসংক্রান্ত কুরআনের

বার্তাগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য মুতাজিলারা যুক্তিনির্ভর কৌশল প্রয়োগ করার কথা বলেনি; বরং কুরআনের গোটা বিবরণীর ক্ষেত্রেই যুক্তিকে ব্যবহার করার মত দিয়েছে। সরলভাবে বলতে গেলে আশআরি ও মাতুরিদিরা মনে করত, যুক্তিকে ওহির আলোকে উপলব্ধি করতে হবে। আর মুতাজিলাদের মত ছিল পুরোই বিপরীত। তারা ওহিকে যুক্তির বিচারে মূল্যায়ন করার পক্ষে ছিল।

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এসে মুতাজিলা দর্শনের গুরুত্ব ক্রমশ কমতে শুরু করে। আল মামুন মুতাজিলা দর্শনটি ধারণ করার ওপর সরকারি আদেশ দিলেও পরবর্তী খলিফারা তা আর করেননি। আর মুতাজিলা দর্শনের মধ্যে নানা বিভক্তি-বিভাজন চলে আসায় দর্শন হিসেবে এটাও আর সেভাবে সমাদৃত হয়নি। অধিকন্তু আশআরি চিন্তাধারার বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ইমাম আবু হামিদ গাজালি (মৃ. ১১১১ খ্রিষ্টাব্দ) এবং মাতুরিদি দার্শনিক আন নাসাফি (মৃ. ১১৪২ খ্রিষ্টাব্দ) মুতাজিলা দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন, যা মুতাজিলা দর্শনের বিলুপ্তিকরণ প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করে। যদিও আছারি, আশআরি ও মাতুরিদির মধ্যেও মতপার্থক্য ছিল, তারপরও এই তিনটি ধারাই পরবর্তী সুন্নি ইসলামি দর্শনের প্রধান তিন চিন্তাধারা হিসেবে আবির্ভূত হয়। সুন্নি ধারা– যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত নামে পরিচিত; এখানে ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে রাসূলের সুন্নাহভিত্তিক চিরায়ত দর্শন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের (আল জামায়াত) ঐকমত্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আজ অবধি সুন্নি দর্শনের এই তিনটি ধারাই বিরাজমান রয়েছে।

সুফি ধারা

ইসলামি জ্ঞানের তৃতীয় যে শক্তিশালী ধারাটি রয়েছে, তা মূলত আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্রিক। এই ধারাটিকে তাসাউফ বা তাযকিয়া ধারা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এই চিন্তাধারার মূল ভিত্তি হলো বান্দার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সম্পর্ক। এর আগে ফিকহ ও আকিদায় ইসলামের অনেক বিস্তৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের বিষয়টি তাসাউফ ধারার মতো অত বেশি আলোচিত হয়নি।

ফিকহ ও আকিদার মতো সুফি ধারার সূচনাও হয় প্রথম যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের হাত দিয়েই। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লালন করার পেছনে নবিজি ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের নানা ঘটনাকেই তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে সামনে নিয়ে আসে। এই বিষয়ে প্রথম যে মনীষীর নাম বলতে হয় তিনি হলেন ইমাম হাসান বসরি রহ. (মৃ. ৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ)। ইরাকের বসরা নামক ছোট্ট একটি শহরে জন্ম নেওয়া এই মনীষী জাগতিক জটিলতাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার অনন্যসাধারণ নিদর্শন স্থাপন করেন। তার সমসাময়িক একজন নারী ছিলেন রাবিয়া আল আদাবিয়া (মৃ. ৮০১ খ্রিষ্টাব্দ), তিনিও তার আধ্যাত্মিক চর্চার জন্য বিশ্ব জুড়ে সমাদৃত হয়েছেন। আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা কতটা প্রবল ছিল তা একটি বিখ্যাত উক্তি থেকেই বোঝা যায়, যেখানে তিনি বলেছেন, "ও আমার আল্লাহ, আমি যদি জাহান্নামের আগুনের ভয়ে তোমার ইবাদত করি, তাহলে বরং জাহান্নামের আগুনেই আমার পুড়ে যাওয়া শ্রেয়। আর যদি বেহেশতের লোভে তোমার ইবাদত করি, তাহলে জান্নাতের দরজা আমার জন্য বন্ধ করে দাও। যদি শুধু তোমার জন্যই ইবাদত করি, তাহলে আমাকে তোমার পবিত্র সত্তার দিদার দাও।" রাবেয়া বসরির এই বিখ্যাত উক্তিটি প্রমাণ করে আধ্যাত্মিকভাবে তিনি কতটা শক্তিশালী ছিলেন, আল্লাহর ওপর তার নির্ভরতা এবং ভালোবাসা কতটা তীব্র ছিল। যদিও ফিকহি দিক থেকে তার এ বক্তব্য নিয়ে দ্বিমতও আছে।

ফিকহ যেমন কালক্রমে নতুন একটি ধারার সূচনা করেছিল। ঠিক একইভাবে সুফিজমও ইসলামের নতুন এক ভাবধারা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বেশ কয়েকজন সুফি-সাধকের নেতৃত্বে নতুন নতুন সুফি-ধারাও (তরিকা) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এসব সুফি-সাধকদের মধ্যে ছিলেন আবদুল কাদের জিলানি (মৃ. ১১৬৬ খ্রিষ্টাব্দ), মুইনুদ্দিন চিশতি (মৃ. ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দ), ইবনে আরাবি (মৃ. ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ), আবুল হাসান আস সাধিলি (মৃ. ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) প্রমুখ। এই তরিকাগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। সুফি-সাধকদের এসব কর্মকৌশলের মূল উদ্দেশ্যই ছিল আত্মাকে বিশুদ্ধ করা, উদারতার চর্চা করা, স্বার্থপরতার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য ও প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকা; কেননা, এগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং বিপথগামী করে দেয়।

যারা যে তরিকা অনুসরণ করত তারা ওই তরিকার শীর্ষে থাকা ব্যক্তিকে শায়খ (শিক্ষক) হিসেবে বিবেচনা করত। আর তারা নিজেদের সেই শায়খের মুরিদ (অনুসারী) বলে পরিচয় দিত। এসব মুরিদরা মনে করত, শায়খের দেখানো পথ ধরে চললেই আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে। যখন কোনো তরিকার শায়খ ইন্তেকাল করতেন, তখন মুরিদদের মধ্য থেকে শীর্ষস্থানীয় কাউকে সে তরিকা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হতো। তিনি আবার পরবর্তী প্রজন্মের মুরিদদের দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। প্রতিটি তরিকাতে এরকম শায়খদের একেকটি প্রজন্মও দাঁড়িয়ে যেত। এই তরিকা অবলম্বনকারীরা মনে করত, প্রতিজন শায়খের মূল শিকড় এসেছে স্বয়ং রাসূল ﷺ থেকে। ফলে ফিকহ ও আকিদার ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষক-ছাত্র নীতি বিদ্যমান ছিল, ঠিক তেমনি এই তরিকাগুলোও একটি শায়খ-মুরিদ সম্পর্কের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়।

তবে সুফিবাদের ইতিহাসও সর্বাংশে বিতর্কমুক্ত নয়। সুফি-সাধকদের অনেকেই দাবি করতেন– যদি কেউ আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, তবে তার আর আকিদা বা ফিকহ সম্পর্কে জানার প্রয়োজন নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সুফি-সাধকদের নিয়ে ইসলামের অন্য ধারাগুলোর একটি দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। এরকম একটি দ্বন্দ্ব ইতিহাসে প্রথমবার পরিলক্ষিত হয় দশম শতাব্দীর গোড়ার

দিকে, যখন সুফি মনসুর হাল্লাজ (মৃ. ৯২২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রকাশ্যে ফিকহ ও আকিদার প্রচলিত তথ্যগুলো জানার কোনো দরকার নেই বলে ঘোষণা দেন। অনেকেই তার এই বক্তব্যকে খোদাদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচনা করে। যদিও তিনি পরবর্তী সময়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন যে তিনি এ কথাটি বলেছেন তাদের জন্য, যারা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু তারপরও তাতে কোনো কাজ হয়নি। ফলে আব্বাসীয় খিলাফতের সময় তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সেসময় জুনাইদ বাগদাদি (মৃ. ৯১০ খ্রিষ্টাব্দ) নামে আরেকজন বিখ্যাত সুফি ছিলেন। তিনি অবশ্য হাল্লাজের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত ছিলেন না। তিনি মত প্রকাশে বেশ সংযত ছিলেন। তাই পরবর্তী বেশ কয়েক যুগ ধরে সুন্নি মুসলিমরা জুনাইদ বাগদাদির চিন্তাধারাকেই প্রকৃত তাসাউফ হিসেবে অনুসরণ করে যায়। কেননা, জুনাইদ বাগদাদি তাসাউফ, ফিকহ আর আকিদার মধ্যে ভারসাম্য রাখার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

শিয়া

যদিও তৎকালীন মুসলিমদের অধিকাংশই ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রের শীর্ষ মনীষীদের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতেন, কিন্তু এর বাইরে একটি ছোটো অংশ ছিল, যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা মূলত রাজনৈতিক কারণে মূলধারা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের সামনে বেশ কিছু ধর্মীয় সংকট চলে আসে। এই অংশটি শুরু থেকেই একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বাস করত। তারা বলত, একমাত্র আলী η-এর উত্তরাধিকারী থেকেই খলিফা নির্ধারণ করতে হবে। মূলধারার অন্য সবার থেকে ভিন্ন এই চিন্তাধারা পরবর্তী সময়ে তাদের এমন দিকে নিয়ে যায় যে, হাদিস ও ইসলামি আইনের ব্যাপারে প্রথমদিকের খলিফারা যে দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতেন, তারা সে বিষয়েও ভিন্ন চিন্তা করতে শুরু করে। তারা নিজেদের শিয়ানে আলী বা আলীর দল হিসেবে দাবি করত। আর সামষ্টিকভাবে তাদের বলা হয় শিয়া সম্প্রদায়।

শিয়ারা মনে করে, সব সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে নবিজি η-এর ওফাতের দিন থেকে, অর্থাৎ যেদিন আবু বকর η খলিফা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। যে বৈঠকে উমর η খলিফা হিসেবে আবু বকর η-এর নাম প্রস্তাব করেন, সে বৈঠকে হযরত আলী η উপস্থিত ছিলেন না। যদিও পরবর্তী সময়ে আলী η খলিফা হিসেবে আবু বকর η-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং আনুগত্য করেছিলেন, তারপরও শিয়ারা তার বৈধতা ও যথার্থতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। তারা মনে করে, রাসূল γ-এর আপন চাচাতো ভাই ও জামাতা হিসেবে হযরত আলী η-এর সে বৈঠকে থাকা অপরিহার্য ছিল এবং তাঁরই প্রথম খলিফা হওয়া উচিত ছিল। তাই তাদের চোখে আবু বকর ও উমর η-সহ যারা এই প্রক্রিয়াকে অর্থাৎ রাসূল γ-এর নিজ পরিবার থেকে নেতৃত্বকে বাইরের কারও হাতে সোপর্দ করাকে সমর্থন করেছেন, তারা সকলেই অন্যায় করেছেন। শিয়ারা খিলাফতের প্রতিষ্ঠিত ধারণাকেই ভুল বলে মনে করে। তারা মনে করে, মুসলিম উম্মাহকে রাসূল মুহাম্মাদ γ-এর কন্যা ফাতিমা ι-এর উত্তরাধিকারীদের দিয়েই পরিচালনা করা উচিত ছিল। আর ফাতিমা ι হলেন আলী η-এর স্ত্রী। শিয়ারা খলিফা নয়; বরং ইমামের ধারণায় বিশ্বাসী। তারা মনে করে, ফাতিমা ও আলী η দম্পতি থেকে যে উত্তরাধিকারী আসবে, তারাই মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি যোগ্য। শিয়ারা এই বিশ্বাস থেকেই আলী η-কে প্রথম ইমাম এবং তাঁর দুই ছেলে হাসান η ও হুসাইন η-কে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে।

শিয়ারা খলিফার স্থলে ইমামের ধারণায় বিশ্বাস করে। ইমামকেন্দ্রিক নেতৃত্ব হলো একটি রাজনৈতিক ধারণা। এমনকি উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকরাও নিজেদের ইমাম বলে পরিচয় দিত। কিন্তু এ রাজনৈতিক ধারাটাই এক সময় ধর্মতাত্ত্বিক ধারায় পরিণত হয়। শিয়াদের শুধু রাজনৈতিক কোনো ধারা হিসেবে বিবেচনা না করে, ধর্মীয় ধারা হিসেবে বিবেচনা করারও যুক্তি রয়েছে। কেননা, তারা যদি কেবল আবু বকর η-কে প্রথম খলিফা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টিকে না মানত, তাহলে হয়তো বিষয়টা নিছক রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু তারা বিষয়টাকে আরও গভীরে নিয়ে গেছে। তারা মনে করে যেহেতু খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে আবু বকর η এবং তাঁর সমর্থকরা অন্যায় করেছেন, অসততা করেছেন। তাই তাদের মাধ্যমে যে হাদিসগুলো এসেছে, সেগুলোকেও আর ন্যায়নিষ্ঠ বা সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির ভয়াবহ ধর্মতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া আছে। কেননা, আবু বকর η-কে প্রথম খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছেন বা সমর্থন করেছেন, এমন সাহাবিদের মাধ্যমেই অধিকাংশ হাদিস এসেছে। রাসূলের স্ত্রী আয়িশা ι এবং আবু হুরায়রা η হলেন বুখারি শরীফের শীর্ষ দুই হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি। কিন্তু শিয়ারা মনে করে– যেহেতু এই দুইজন সাহাবিও আবু বকর, উমর ও উসমান η-এর খিলাফতকে সমর্থন করেছেন, তাই তাদের মাধ্যমে আসা হাদিসগুলো আর বিশ্বাস করা যায় না।

হাদিস প্রত্যাখ্যান করলে স্বাভাবিকভাবে যে বিশাল শূন্যতা তৈরি হয় তা পূরণের জন্য শিয়ারা তাদের বিভিন্ন ইমামদের বাণীকে হাদিসের সমপর্যায়ের বা কাছাকাছি ধরনের বস্তুনিষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে। অধিকাংশ মুসলিম শিয়াদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্মবিরোধী বলে মনে করলেও শিয়ারা মনে করে, যেহেতু ইমামরা নেতা হিসেবে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং আল্লাহই তাদের নেতা হিসেবে বাছাই করেছেন, তাই তাদের ইসলামের কোনো বিষয়ে বলার জন্য বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহই তাদের বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন! শিয়াদের কিছু কিছু চিন্তাধারা

মুতাজিলা দর্শনের সাথেও কিছুটা মিলে যায়। যদিও কিছু কট্টরপন্থি ধর্মতাত্ত্বিক মানুষের আধা-ঐশ্বরিক একটি ভাবমূর্তির অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করত। তারপরও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের কাছে তা সেভাবে স্বীকৃত হয়নি।

শিয়াদের মধ্যে আবার বিভিন্ন দল-উপদল আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়ারা 'ইসনা আশারিয়া' বা ১২ ইমামের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এই ধারার শিয়ারা মনে করে, হযরত মুহাম্মাদ γ-এর থেকেই ১২ ইমামের সিলসিলা শুরু হয়েছে, যা শেষ হয়েছে ইমাম মুহাম্মাদ আল মাহদির মাধ্যমে। আর ইমাম মাহদি হলেন সেই রহস্যময় ব্যক্তি, যিনি ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৫ বছর বয়সে হারিয়ে যান। এই সময় থেকেই বালক ইমাম ধারণাটির প্রচলন ঘটে। বলা হয়েছিল, যারা যোগ্য ও ইমামের সত্যিকার প্রতিনিধি, তারা এই দ্বাদশ ইমামের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম এবং তার কাছ থেকে এখনও নির্দেশনা গ্রহণ করে থাকেন। তবে ৯৪১ সনে এসে বলা হয়, ইমাম মুহাম্মাদ আল মাহদির সাথে আর কোনো ধরনের যোগাযোগ করা এখন রীতিমতো অসম্ভব। শিয়ারা মনে করে, পৃথিবীর একেবারে শেষ সময়ে লুকোনো অবস্থা থেকে ইমাম মুহাম্মাদ আল মাহদি বেরিয়ে আসবেন এবং তার নেতৃত্বে পুনরায় ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ধারার অনুসারীরা মনে করে, দ্বাদশ ইমামের ফিরে আসার আগপর্যন্ত কুরআন এবং তাদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হাদিস সমূহ থেকেই নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে। সে সাথে ১২ ইমামের রেখে যাওয়া কথা ও কাজকে দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুসরণ করতে হবে।

আব্বাসীয় খিলাফতের গোড়ার দিকে শিয়াদের মধ্যে ১২ ইমামপন্থি ধারার বাইরে আরেকটি ধারার জন্ম হয়, যারা ৭ জন ইমামে বিশ্বাস করত। তাদের বলা হয় 'সাবিয়া'। এই ধারাটি রাজনৈতিকভাবে ১২ ইমামপন্থিদের তুলনায় বেশি সফলতা পায়। ১০ম শতাব্দীতে এসে আরবের পূর্বদিকে এবং মিশরে এই ৭ ইমামপন্থি শিয়ারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। শিয়াদের আরেকটি ছোটো সম্প্রদায়ও আছে, যাদের 'জায়দিয়া' বলা হয়। এরা পাঁচ ইমামের অনুসারী। তারা ইমাম হুসাইন η-এর নাতি জায়েদকে পঞ্চম ও শেষ ইমাম হিসেবে বিবেচনা করে। জায়দিয়া সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি মূলধারার মুসলিমদের সাথে অনেকটাই প্রাসঙ্গিক। সে সাথে তারা খুলাফায়ে রাশেদার ব্যাপারে ১২ ইমামপন্থি ও ৭ ইমামপন্থি শিয়াদের তুলনায় অনেকটাই উদার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে।

শিয়া মতধারার প্রবক্তাগণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যা প্রত্যাশা করেছিলেন, বাস্তবে তা হয়নি। হযরত আলী ও ইমাম হুসাইন η-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা মুসলিমদের মনে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু তারপরও অধিকাংশ মুসলিম শিয়াদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তার বিচ্যুতিকে মেনে নেয়নি। এমনকি মূলধারার মুসলিমরা মনে করে, শিয়াদের এসব চিন্তাভাবনা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা, ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পর থেকেই বৈশিষ্ট্যে ও প্রকৃতিতে ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কুরআনে এমন অসংখ্য জাতির কথা বর্ণিত হয়েছে, যাদের কাছে নবি পাঠানো হয়েছিল এবং তারা সত্য পথে ফিরে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা আবার অকুণ্ঠ পাপাচার ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এমনকি তাদের ওপর নাযিল হওয়া ঐশ্বরিক গ্রন্থকেও তারা নিজেদের স্বার্থে বিকৃত করে ফেলেছিল। বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা এই জঘন্য বিকৃতির জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। কিন্তু রাসূল মুহাম্মাদ γ-এর ক্ষেত্রে তা হওয়ার সুযোগ নেই। তিনি শেষ নবি এবং তাঁর ওপর যে কুরআন নাযিল হয়েছে, তা কখনও পরিবর্তিত বা বিকৃত হবে না। তাই কুরআনের সেই মর্মবাণী ও চেতনা থেকে যখন শিয়ারা বিচ্যুত হয়, তখন মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবেই তা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি এবং এর প্রতিক্রিয়াও খুবই নেতিবাচক হয়।

তা ছাড়া আব্বাসীয়রাও শিয়াদের ওপর খুবই দমন-পীড়ন চালায়, ফলে শিয়াদের অনেকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা মূলধারার মুসলিমদের মধ্যে মিশে যেতে চেষ্টা করে। যে ধর্মতাত্ত্বিকরা জোরালোভাবে শিয়া চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু হামিদ আল গাজালি; ইমাম গাজালি মুতাজিলা চিন্তাধারার দার্শনিকদের চিন্তার বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছিলেন। তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ এবং প্রশাসন ও সামরিক বাহিনী দ্বারা কোণঠাসা হয়ে দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে শিয়া সম্প্রদায় একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। ১৬শ শতকে এসে যখন সাফাভি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার মাধ্যমে শিয়া মতধারাটি আবারও একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

উত্থান-পতন

ইসলামের প্রথম ৩০০ বছরে মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করত, পৃথিবীকে জয় করার যে স্বপ্ন তা অচিরেই পূরণ হবে। কেননা, সেসময়ের মধ্যে ইসলাম অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং পারস্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি মুসলিমরা ফ্রান্স ও ভারতবর্ষের দোরগোড়ায়ও পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু যখন থেকে সামরিক এ অভিযাত্রা স্থগিত হয় এবং মুসলিমরা বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতায় বেশি

মনোযোগী হয়, তখনই এ স্বপ্নের ব্যত্যয় ঘটে। কিন্তু অন্যদিকে, মুসলিমরা জ্ঞান ও গবেষণায় মনোযোগী হওয়ায় বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য রকম উন্নতি ঘটে, যা আগে দেখা যায়নি। এমনকি মুসলিমরা অর্থনৈতিকভাবেও বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। এমনকি বাগদাদে তখন ব্যাংকসদৃশ এমন প্রতিষ্ঠানও ছিল, যার শাখা খোলা হয়েছিল চীনে। সার্বিক এই দৃশ্যপট দেখে তখন এটাই প্রতীয়মান হয়েছিল, ইসলাম যেন আবির্ভূতই হয়েছে পৃথিবীব্যাপী সামরিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিকভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে।

তবে সে গন্তব্যের চূড়ান্ত বিন্দুতে আর পৌঁছানো হয়নি। ১০ম শতাব্দীতে ইসলামের ইতিহাসে একটি ঝড় শুরু হয়, যা ১৫ শতকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের উত্থান অবধি অব্যাহত থাকে। দশম থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের ওপর একের পর এক আক্রমণ আসতে থাকে। শিয়া, ইউরোপীয় ক্রুসেডার এবং মোঙ্গলরা ধারাবাহিকভাবে ইসলামি সাম্রাজ্যের ওপর আঘাত হানতে থাকে। সর্বশেষ ১৩শ শতাব্দীতে এসে অনেকেরই মনে হতে থাকে, ইসলামের পতনের সময় যেন শুরু হয়ে গেছে।

ইসমাইলিয়া

যখন থেকে শিয়া দর্শনের আবির্ভাব হয়, তখন থেকেই তারা নিজেদের মূলধারার সুন্নি খিলাফতের একটি বিকল্প হিসেবে মনে করতে শুরু করে। তাদের অনেকেই তখন ইমামের আনুগত্য করতে শুরু করে। কেননা, তারা বিশ্বাস করত ইমামদের সাথে আল্লাহর গভীর সম্পর্ক আছে। তারা উমাইয়া বা আব্বাসীয় নেতৃত্ব মানতে চাইত না। যদিও ইমাম কীভাবে নির্ধারিত হবে বা ইমামতির মানদণ্ড কী হবে, তা নিয়ে শিয়াদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্যের অস্তিত্ব ছিল। অন্যদিকে, শিয়াদের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ ১২ ইমামের অনুসারী, তারা ছিল রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকার পক্ষে। কেননা, তাদের মতে– দ্বাদশ ইমাম হারিয়ে যাওয়ার পর তার নেতৃত্ব বা নির্দেশনা ছাড়া কোনো মুসলিম সরকারই বৈধভাবে পরিচালিত হতে পারে না। তারা বিশ্বাস করে, দ্বাদশ ইমামের ফিরে আসার আগপর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যেতে হবে। কেননা, তিনি একেবারে শেষ জমানায় এসে চূড়ান্তভাবে সফল একটি মুসলিম সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করবেন।

অন্যদিকে, ৭ ইমামের অনুসারী শিয়ারা রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় থাকার ব্যাপারে একমত ছিল না। তারা বিশ্বাস করত, সপ্তম ইমাম ইসমাইল ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্বাসীয়দের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন। ১২ ইমামের অনুসারীরা যেমন মনে করে, দ্বাদশ ইমাম না আসা পর্যন্ত আর কোনো ইমাম আসবে না। ৭ ইমামের অনুসারীরা তা মনে করে না। তারা মনে করে, ৭ম ইমামের বংশধররা এখনও আছে এবং তারা মূলধারার মুসলিমদের মধ্যেই মিশে আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৭ ইমামের অনুসারীদের ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইমাম ইসমাইলের আসলে কী হয়েছিল বা তার পরিণতি কী হয়েছে, তা নিয়ে অনেক রূপকথা ও গল্পগাঁথা প্রচলিত আছে। ইসমাইলের অন্তর্ধানের (কিংবা মৃত্যু) পরপরই তার অনুসারীরা গোটা মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার নানা জনপদে ঘুরে ঘুরে ইসমাইলের ইমামতির ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করতে শুরু করে। আব্বাসীয়রা ইসমাইলিয়াদের হুমকি মনে করত এবং এই সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল। ফলে ইসমাইলিয়া আন্দোলন ক্রমশ আরও গোপনে চলে যায়, যাতে আব্বাসীয়রা তাদের খুঁজে না পায় বা সনাক্ত করতে না পারে। ইসমাইলি মিশনারিরা মুসলিম বিশ্বের প্রধান শহরগুলোতে গোপনে কাজ করতে থাকে। তারা তাদের চিন্তাধারার পক্ষে মানুষকে আনার চেষ্টা বাদ দিয়ে; বরং আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ মানুষদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে। তাদের এ চেষ্টা বেশ দ্রুততম সময়ের মধ্যেই সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষ, অনারবগোষ্ঠী ও বেদুইনদের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এভাবে কয়েক দশক যাবৎ মিশনারি কাজ করার পর ১০ম শতকে এসে ইসমাইলিরা সুন্নি মুসলিম খিলাফতের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয়। আরব উপদ্বীপের পূর্বদিকে বেদুইনদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে তারা উত্তেজিত করে তোলে, যারা আব্বাসীয়দের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই জনগোষ্ঠীর নাম ছিল কারামিতা। এরা ৯০৩ সনে অপ্রত্যাশিতভাবে সিরিয়ায় আক্রমণ চালায় এবং আব্বাসীয় বাহিনীকে পরাজিত করে দামেস্ক দখল করে নেয়। তবে তারা খুব বেশি দিন তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। মাত্র দুই বছরের মাথায় তারা আবার মরুভূমিতে ফেরত যেতে বাধ্য হয়। ৯০৫ সাল থেকে কারামিতারা ইসমাইলিয়াদের ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে। তারা নতুন দেশ দখল করে নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করার কৌশল থেকে সরে এসে; বরং বাহরাইনে নিজেদের একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে সেখান থেকে নানাভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। তারা আতঙ্ক সৃষ্টির এই কৌশল প্রয়োগ করার মাধ্যমে আব্বাসীয় সরকারকে কাবু করে নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিল করতে চেয়েছিল। ৯০৬ সালে তারা মক্কাগামী ২০ হাজার হজযাত্রীকে হত্যা করে। ৯২০ সালের মাঝামাঝিতে কারামিতারা ইরাকের বসরা ও কুফা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। কারামিতা বেদুইনরা বাগদাদ শহরও প্রায় দখল করে নিয়েছিল। তাদের এই এলোপাতাড়ি হামলা ৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে এসে চূড়ান্ত রূপ পায়। কেননা, সে বছরই তারা মক্কা আক্রমণ করে। মক্কার বাসিন্দাদের ওপর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালায় এবং কাবা থেকে হাজরে আসওয়াদ চুরি করে বাহরাইনে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে যায়। ৯৫২ সাল পর্যন্ত হাজরে আসওয়াদ বাহরাইনেই ছিল।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও কারামিতারা ছিল চরমপন্থি। তারা ইসলামপূর্ব সময়ের বর্বর নানা প্রথাকেও নিজেদের আদর্শ হিসেবে বিশ্বাস করত। সে সময় যারা বিভিন্ন কারণে বাহরাইনে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে জানিয়েছিল, কারামিতাদের অধীন এলাকায় তারা কোনো মসজিদ দেখেনি এবং কাউকে নামাজও পড়তে দেখেনি। কারামিতারা মক্কাকে পবিত্র শহর হিসেবে মানত না, আর একারণেই তারা মক্কাগামী হাজীদের নির্বিচারে হত্যা করত। তাই স্বাভাবিকভাবে মূলধারার মুসলিমদের অনেকেই কারামিতাদের মুসলিম বলে স্বীকার করত না। মূলধারার মুসলিমদের সাথে কারামিতাদের চিন্তার ব্যবধান ছিল যোজন যোজন। তবে কারামিতারা এত সন্ত্রাস ও সহিংসতা করলেও ইসলামি আইনের শাসনের জন্য প্রকৃতার্থে কখনোই শক্তিশালী হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কেননা, সাধারণ মুসলিমরা তাদের কখনোই গ্রহণ করেনি; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এই কারামিতা সম্প্রদায়কে চরমপন্থি হিসেবেই গণ্য করত। ইতিহাসের বিচারে গেলে দেখা যায়, মুসলিমদের জন্য প্রকৃত হুমকি এসেছিল মাগরিব অঞ্চল থেকে, যেখানে বার্বার জাতির ওপর ভর করে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের একটি বড়ো আকারের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল।

ফাতেমি

ইসমাইলিয়া মিশন উত্তর আফ্রিকায় বেশ সফলতা পেয়েছিল। কেননা, তারা সেখানকার সাহারার বার্বার ও উপকূলীয় আরব গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার বিরাজমান উত্তেজনা ও দূরত্বকে ভালোভাবেই নিজেদের পক্ষে কাজে লাগাতে পেরেছিল। ৯ম শতকের শেষদিকের পুরো সময় জুড়ে বার্বারদের মাঝে কাজ করে ইসমাইলিয়ারা নিজেদের একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে নেয়। এক পর্যায়ে বার্বারদের সাথে নিয়ে তারা উত্তর আফ্রিকায় সুন্নি শাসকগোষ্ঠীকে (যারা রুস্তামি ও আঘলাবি নামে পরিচিত) উৎখাত করে। ৯০৯ সালে এসে ইসমাইলিরা দাবি করে, ইসমাইলের বংশধরদের মধ্য থেকেই নতুন একজন ইমাম এসেছেন, তার নাম উবায়দুল্লাহ, কিন্তু তিনি মাহদি উপাধি ধারণ করেছিলেন। উবায়দুল্লাহর বংশপরিচয় নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তিনি নিজেকে ইসমাইলের বংশধর হিসেবে দাবি করতেন। তার মানে তিনি এসেছেন আলী η ও ফাতিমা ι-এর বংশ থেকে। আর তাই ফাতিমা ι-এর নামানুসারে তারা নিজেদের নাম রাখে ফাতেমি।

ফাতেমীয়রা কারামিতাদের মতো শুধু সুন্নি শাসকদের গলার কাঁটা হয়ে থাকেনি; বরং তারা মনে করত, তাদের দায়িত্ব হলো সুন্নিদের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া এবং উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে ইসমাইলিয়া শাসনের প্রবর্তন করা। সে মোতাবেক ৯০৯ সালে তিনি নিজেকে খলিফা ঘোষণা দিয়ে আব্বাসীয় খিলাফতকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বসেন। যদিও আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে ফাতেমীয়রা একমাত্র সংক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ছিল না, কিন্তু কালক্রমে তারাই আব্বাসীয়দের সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। তারা নিজেদের ঘাঁটি গড়ে বর্তমান তিউনিশিয়ার আশেপাশের এলাকায়। সেখান থেকে খুব দ্রুত তারা পূর্ব দিকে মিশরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ৯২০ সালে পশ্চিম-উত্তর আফ্রিকার বড়ো অংশে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ৯৩৪ সালে উবায়দুল্লাহর মৃত্যুর পর ফাতেমীয়রা তাদের সামরিক অভিযানের মাত্রা কমিয়ে দেয়। ইসমাইলিয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলো বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জন্ম হয়, যারা সুন্নিমুক্ত পৃথিবী গড়ার ঘোষণা দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। অন্যদিকে, খারিজিদের কিছু গ্রুপ বিদ্রোহ শুরু করে ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে। যদিও খারিজিরা ইসমাইলিয়াদের একসময় সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে তারা ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তবে বাস্তবতা হলো, মূলধারার সুন্নিরা তখন এত বেশি বিভক্ত ছিল যে, ফাতেমীয়দের উত্থান ঘটছে এটা বোঝার পরও তারা তাদের থামিয়ে দেওয়ার জন্য তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেনি।

৯২৯ সালে আইবেরিয়ার তৎকালীন উমাইয়া শাসক নতুন করে খিলাফতের ঘোষণা দেন। কর্ডোভাভিত্তিক সে খিলাফত উত্তর আফ্রিকার শাসক ফাতেমি গোষ্ঠীর জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দৃশ্যমান হয়। অর্থাৎ ১০ম শতাব্দীতে এসে মুসলিম সাম্রাজ্যে পাশাপাশি তিনটি খিলাফত চলছিল– আব্বাসীয়, উমাইয়া এবং ফাতেমীয়।

দশম শতকের মাঝামাঝি এসে আব্বাসীয় খলিফা অনেকটাই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। গোটা নবম ও দশম শতাব্দী জুড়ে রাজনীতির একটি বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম চলে। আর এর সূচনা হয় তুর্কি ভূমি থেকে, যেখানে ক্রীতদাস সেনারা নিজেরাই একটি উত্তরাধিকারভিত্তিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া চালু করে। ক্রমাগতভাবে এই গোষ্ঠীটি ক্ষমতাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলায় খলিফাদের সক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণও অব্যাহতভাবে কমতে থাকে। ৯৪৫ সালে পারস্য রাজপরিবার ইরাক দখল করে নেয় এবং তারাও খলিফার নামে ইরাক শাসন করতে থাকে। ঠিক একইভাবে খিলাফতের অর্থনৈতিক ও কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু মিশরকে ইখশিদি নামক একটি তুর্কি রাজতন্ত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এভাবে মুসলিম সাম্রাজ্য মিশর ও পারস্য এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মুসলিমদের নিজেদের মধ্যকার এ বিভাজনের কারণে উত্তর দিক থেকে নতুন করে বাইজেন্টাইনের আক্রমণের হুমকি দেখা দেয়। আর এ সুযোগে ৯৬৯ সালে ফাতেমীয়রা মিশর আক্রমণ করে। প্রায় এক লাখ সেনা নিয়ে তারা মিশরে ইখশিদিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে এবং খুব সহজেই ইখশিদিদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। ফাতেমি আক্রমণে মিশরের সুন্নি সরকারব্যবস্থারও অবসান ঘটে। বিজয়ী ফাতেমীয়রা

মিশরে নীলনদের তীরে রাজধানী হিসেবে নতুন একটি শহর নির্মাণ করে, যার নাম দেওয়া হয় আল কাহিরা (কায়রো)। ফাতেমীয়রা তখন আর মরুভূমির বেদুইন নয়, বরং তারাই কার্যত মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীর অধিকারী। একই সাথে সিরিয়া, ইরাক ও পারস্যেও মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে যায়। ফলে মনে হচ্ছিল, ফাতেমীয়রা পূর্বদিকে নিজেদের সমর অভিযান অব্যাহত রেখে বাগদাদ পর্যন্ত দখল করে নিয়ে গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যে নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কেননা, ফাতেমীয়দের তখন বাইজেন্টাইন শাসকদের নতুন ঝড় মোকাবিলা করতে হয়। শুধু তা-ই নয়, নিজেদের স্বধর্মীয় ও স্বগোত্রীয় বাহরাইনের কারামিতারাও তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কারামিতারা ফাতেমীয়দের কখনও নিজেদের পক্ষের শক্তি বলে মনে করেনি। কেননা, তাদের মতে ফাতেমীয়রা সত্যিকারের ইসমাইলিয়া চেতনা ধারণ করে না। এসব হুমকি আর ঝামেলার কারণে ফাতেমীয়রা আর খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে আক্রমণ করতে পারল না। ফলে সুন্নি খিলাফত আবারও নিজেদের সুসংগঠিত করার মতো একটি সুযোগ পেয়ে যায়। ১১শ শতকে এসে সেলজুক তুর্কিদের অধীনে সুন্নিরা আবারও একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে দৃশ্যমান হয়।

এ কারণে ফাতেমীয়রা উত্তর আফ্রিকা, মিশর, পবিত্র শহর মক্কা, মদিনা এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের কিছু অংশ নিয়ে তাদের সাম্রাজ্য চালাতে থাকে। পুরো সাম্রাজ্যকে ইসমাইলিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের অধীনে নিয়ে আসার জন্য এরপরও তাদের মধ্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান ছিল। ৯৭০ সালে কায়রোতে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মিশরে বসবাসরত সুন্নি মুসলিমদের ভেতরে ইসমাইলিয়া চিন্তাচেতনার বিস্তার ঘটানো। পাশাপাশি খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের জীবনধারাও ফাতেমি খলিফার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নির্ভর হয়ে যায়। কখনও কখনও তারা তীব্র নিপীড়নের শিকার হয়, আবার কোনো কোনো খলিফার আমলে তারা যথেষ্ট স্বাধীনতাও ভোগ করে।

৯৯৬ থেকে ১০২১ সাল পর্যন্ত সময়ে জনগণের মধ্যে ইসমাইলিয়া মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়। এসময় ফাতেমি খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন আল হাকিম, যাকে ইতিহাসে উন্মাদ শাসক হিসেবেও অভিহিত করা হয়। অন্য সব ইসমাইলিয়া খলিফার মতো তাকেও আল্লাহর বাছাইকৃত শাসক বলে ইসমাইলিয়ারা মনে করত। তবে ইসমাইলিয়া অন্য সব খলিফার তুলনায় তিনি অনেক বেশি ঘৃণিত ছিলেন। কেননা, তিনি নিজের খেয়াল-খুশিমতো শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

আল হাকিমের সময়েই খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়। তিনি ইহুদিদের সকল সিনাগগ (ধর্মীয় উপাসনালয়) ভেঙে ফেলার আদেশ দেন। সেই সাথে তার সাম্রাজ্যে অবস্থিত খ্রিষ্টান চার্চগুলোও ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। এমনকি জেরুসালেমের ঐতিহাসিক চার্চও তিনি এসময় ভেঙে ফেলার আদেশ দেন। অথচ খ্রিষ্টানরা জেরুসালেমের এই চার্চকে অত্যন্ত পবিত্র স্থাপনা বলেই মনে করে। তারা বিশ্বাস করে– এই চার্চের জায়গাটিতে যিশুকে দাফন করা হয়েছিল; আর এখান থেকেই তার পুনরুত্থানও হয়েছিল। ৬৩৭ সালে হযরত উমর η চার্চগুলোকে সংরক্ষণ করার যে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তা অমান্য করে ১০০৯ সালে আল হাকিমের সময়ে এসে চার্চটি ধ্বংস করে ফেলা হয়। শুধু খ্রিষ্টানরাই যে আল হাকিমের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েছিল তা নয়, তার সময়ে সুন্নি মুসলিমদের জামাতে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করা হয়। জুমার নামাজে ফাতেমি খলিফার নামে খুতবা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়। ইসমাইলিয়া চেতনার প্রবেশ ঘটানো হয় সবখানে। খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের পাশাপাশি সুন্নি মুসলিমদেরও জেরুসালেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

আল হাকিমের এসব নিপীড়ন যে শুধু ধর্মের ওপরই কষাঘাত হিসেবে এসেছিল তা নয়, সাধারণ জীব-জন্তুর ওপরও এসেছিল। তার প্রাসাদের নিকটবর্তী জনবসতির সব কুকুরকে একদিন আল হাকিমের আদেশে হত্যা করা হয়! কেননা, কুকুরগুলোর চিৎকারে তার ঘুমের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটেছিল। তিনি আরও ডিক্রি জারি করেন, সকল ব্যাবসায়িক কার্যক্রম রাতের বেলায় করতে হবে। পনির নিষিদ্ধ করা হয়, কারণ তার পনির খেতে ভালো লাগত না। মুলুখিয়া নামক মিশরীয়দের একটি খাবারকেও একই কারণে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। এমনকি তিনি বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে হাইসামকে গৃহবন্দি করে রাখেন! কারণ, ইবনে হাইসাম তার পছন্দমতো নীলনদের ওপর বাঁধ নির্মাণ করতে পারেননি। ১০২১ সালে তিনি একদিন হুট করেই মরুভূমিতে চলে যান এবং রহস্যজনকভাবে সেখান থেকে নিখোঁজ হন। আর এভাবেই উন্মাদ এই ফাতেমি খলিফার শাসনের অবসান ঘটে।

আল হাকিমের শাসনকালটি তার বর্বরতা এবং নিপীড়নের জন্য ইতিহাসের পাতায় নিন্দিত হয়েছে। সে ছাড়া অন্য ফাতেমি শাসকদের শাসনকে এককথায় সহনশীলও বলা যায় না আবার নিপীড়ক হিসেবে আখ্যায়িত করার সুযোগও কমই পাওয়া যায়। ফাতেমিদের একটা বড়ো দুর্বলতা ছিল, সরকার পরিচালনায় তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান ছিল না। তাই তারা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে, সমাজ ব্যবস্থাপনায় এবং অমুসলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত হঠকারিতা করত। আব্বাসীয় এবং অন্যান্য সুন্নি খিলাফতগুলো অন্তত নামকাওয়াস্তে হলেও ইসলামি আইন অনুসরণ করত, কিন্তু ফাতিমীয়রা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মতকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিত। ফলে একেকজন খলিফা একেক পদ্ধতিতে সরকার চালাতেন। অনেক সময় এর জন্য তাদের কড়া মাশুল গুনতে হতো। আইনগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিশালী অবস্থান না থাকায় ফাতেমীয়রা কখনও নিজেদের অবস্থানকে সংহত করতে পারেনি। সেই সাথে জনগণের কাছেও নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে

পারেনি। ফলে দীর্ঘদিন ফাতেমীয়রা মিশর, সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকা শাসন করার পরও সেখানে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়নি; বরং বিরাট সংখ্যক মানুষ আগাগোড়াই সুন্নি মতধারাই অনুসরণ করে। জনসমর্থন না থাকায় এবং বিভিন্ন খলিফার সময় শাসন পদ্ধতিতে ভিন্নতা আসায় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে ফাতেমীয়রা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর ক্রুসেডের সময় গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবির হাতে তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটে। এই ক্রুসেড হলো আরেকটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যা মুসলিম বিশ্বের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

ক্রুসেড

মুসলিম ও পশ্চিমা উভয় ইতিহাসেই ক্রুসেডের সমপরিমাণ আলোচিত দ্বিতীয় আর কোনো ঘটনা আছে বলে মনে হয় না। এই সংঘাতের পুরোটাই ঘটেছিল জেরুসালেমকে কেন্দ্র করে। জেরুসালেম এমন একটি শহর– যা একই সঙ্গে মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান সকল ধর্মাবলম্বীদের কাছেই পবিত্রতম স্থান। খ্রিষ্টানদের কাছে এটা হলো সেই শহর, যেখানে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং এখান থেকেই তাঁর পুনরুত্থান ঘটেছে। মুসলিমদের জন্য এটা অসংখ্য নবির স্মৃতি বিজড়িত শহর, যেখানে নবিজি γ তাঁর মিরাজ গমনের সময় যাত্রা বিরতি করেছিলেন। ১০৯৫ সালে এই ক্রুসেড শুরু হয়, যা পরবর্তী ২০০ বছর ধরে চলমান থাকে। ক্রুসেডের কারণে খ্রিষ্টান ইউরোপ এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যকার সম্পর্কে একটি অনিবার্য সংঘাতমুখর কাঠামো তৈরি হয়।

সেলজুকরা একাদশ শতকের শেষে বাগদাদে নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে। এটা ছিল মধ্যযুগের সবচেয়ে বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানকার শিক্ষা ছিল পুরোটাই অবৈতনিক।

ক্রুসেডের যে চেতনা, তার জন্ম কিন্তু জেরুসালেম থেকে অনেক অনেক দূরে; মধ্য এশিয়ায়। তখন মধ্য এশিয়া ছিল তুর্কিদের নিয়ন্ত্রণে। তুর্কিরা যুদ্ধে বেশ পারদর্শী হওয়ায় আব্বাসীয়রা তুর্কিদের মধ্য থেকেই সেনাবাহিনীর জেনারেল ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ দিত। এভাবে তুর্কিরা ধীরে ধীরে মধ্য এশিয়া থেকে অভিবাসিত হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের অনেক জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় তুর্কি অভিবাসীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় ১০ম শতাব্দীতে এসে তারা রাজনৈতিক স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে কাঠামোটি দাঁড়িয়ে যায় তা হলো সেলজুক সাম্রাজ্য, যা ১০৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেলজুকরা সিরিয়া থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। আব্বাসীয় খলিফারা তখন নিছক নামেই টিকে ছিল, মূলত সেলজুকরা তাদের নিরাপত্তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। খলিফারা তখন বাগদাদে প্রাসাদের ভেতর আটকা ছিলেন, এর বাইরে কোথাও তাদের কোনো ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সেলজুকরা সুন্নি মতাবলম্বী হওয়ায় তারা ফাতেমিদেরও প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়। ফাতেমীয় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যে সম্ভাবনা ছিল, সেলজুকদের শক্তিশালী উত্থানে তা ১১ শতকে এসে সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায়।

১০৭১ সালে পূর্ব আনাতোলিয়ায় সেলজুকরা বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে জয়লাভ করে। মানজিকার্তে সংঘটিত এই যুদ্ধে বাইজেন্টাইনরা পরাজিত হওয়ায় আনাতোলিয়ার ওপর তাদের আধিপত্য শেষ হয়ে যায়। এই যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছরে সেলজুকরা পশ্চিম দিকে আরও অগ্রসর হয়ে একেবারে কনস্ট্যান্টিনোপলের বিপরীত উপকূলে গিয়ে পৌঁছায়। তখনও কনস্টান্টিনোপল বাইজেন্টাইন রাজধানী এবং পরিস্থিতি এমন সম্ভাবনা তৈরি করে যে, যেকোনো সময় তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করবে।

১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বাইজেন্টাইনদের সম্রাট ছিলেন এলেক্সিওস। তিনি এটা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন যে, তার সেনাবাহিনী এককভাবে তুর্কিদের মোকাবিলা করতে পারবে না। তা ছাড়া বিগত কয়েক শতাব্দীতে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের খ্রিষ্টানদের মধ্যে নানা বিষয়ে বিভেদ-বিভাজন বাড়তে থাকায় এলেক্সিওস যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, খ্রিষ্টানদের মধ্যে শক্তিশালী ঐক্যই কেবল বাইজেন্টাইনের পতন ঠেকাতে পারে। তিনি এ ব্যাপারে রোমে অবস্থানরত পোপ দ্বিতীয় আরবানের কাছে সাহায্য চেয়ে একটি চিঠি পাঠান। তিনি আশা করেছিলেন, পোপ হয়তো তার সাহায্যার্থে বড়ো কোনো বাহিনী প্রেরণ করবেন। আরবান সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিষ্টের নামে, ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশাল এক খ্রিষ্টান বাহিনী গঠন করলেন। কিন্তু এ বাহিনী দিয়ে এলেক্সিওসকে সাহায্য বা তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না; বরং তার খায়েশ ছিল জেরুসালেম জয় করার। যেহেতু উমর η-এর শাসনামল থেকেই জেরুসালেম মুসলিমদের অধিকারে রয়েছে, তাই তিনি সকল খ্রিষ্টানদের জেরুসালেম জয় করার ডাক দিলেন, যাতে পোপের নিয়ন্ত্রণে ফিলিস্তিনে একটি ল্যাটিন-খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা যায়।

আরবানের সেনাবাহিনী অবশ্য খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল না। বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল অসংখ্য নাইট ও অন্যান্য শীর্ষ কর্মকতা। ১০৯৬-১০৯৭ সালে এসে তারা আজকের ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালি থেকে পূর্ব ইউরোপের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল। যেহেতু এই বাহিনীটি চার্চের মাধ্যমে অনেক বেশি ধর্মীয় আগ্রাসী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তাই তারা যাত্রাপথে অসংখ্য ইহুদিকেও নির্বিচারে হত্যা করছিল। প্রথম এ ক্রুসেড বাহিনীটি এতটাই বর্বর ও পাশবিক ছিল যে, তারা কনস্টান্টিনোপলের দুয়ারে পৌঁছালে খ্রিষ্টান হওয়ার পরও এলেক্সিওস শুরুতে তাদের শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে চাননি! কেননা, তার ভয় ছিল এই বাহিনী এ পর্যন্ত আসার পথে যেভাবে অসংখ্য শহরকে ধ্বংসস্তূপে

পরিণত করেছে, তার শহরটাকেও (কনস্টান্টিনোপল) না একইভাবে ধ্বংস করে দেয়। যাহোক, এরপর ৩০ হাজার খ্রিষ্টান সেনার বিশাল বাহিনী বসফরাস প্রণালি পাড়ি দিয়ে আনাতোলিয়ায় মুসলিমদের ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। তাদের প্রতিরোধ করার মতো অবস্থা সেখানকার মুসলিমদের ছিল না। ১০৯৭ সালে ক্রুসেডাররা বর্তমান তুরস্ক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এন্টিয়ক শহরে পৌঁছে যায়। এটা ছিল ক্রুসেডারদের জন্য সত্যিকারের পরীক্ষা। কেননা, এই ধাপটি পার হতে পারলেই তারা জেরুসালেমে চলে যেতে পারবে। আর পরাজিত হলে তারা কখনোই জেরুসালেম জয় করতে পারবে না। কেননা, তারা তখন খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্য থেকে এতটাই দূরে ছিল যে, চাইলেও সহজে অতটা পথ পাড়ি দিয়ে নতুন সেনা আমদানি সম্ভব হবে না।

এন্টিয়ক শহর অবরোধের যে চিত্র দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে তার মাধ্যমেই একাদশ শতকের মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের অবস্থা অনুধাবন করা যায়। শহরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই উন্নত, তাই যেকোনো আক্রমণকারীর জন্যই তা জয় করা ছিল দুঃসাধ্য। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করলে এটা ছিল অনেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। সেলজুক সাম্রাজ্য আকৃতিতে অনেক বড়ো হলেও কার্যত এটা কখনও একক একটি রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। একেকটি শহর একেকজন আমির দ্বারা পরিচালিত হতো এবং তারা নিজেদের মধ্যে হরহামেশাই বিবাদে লিপ্ত থাকত। সিরিয়ার প্রধান শহরগুলো বিশেষ করে দামেস্ক, আলেপ্পো, এন্টিয়ক এবং মসুলের মধ্যে কখনও সংহতি ছিল না। বরং এই শহরগুলোর মধ্যে প্রায়শই বিবাদ লেগে থাকত, যা ১০৯০-এর দশক পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। তাই যখন এন্টিয়কের শাসক ইয়াঘি সিয়ান ক্রুসেডারদের অবরোধের মুখে আশেপাশের শহরগুলোর শাসকদের কাছে সাহায্য চাইলেন, তখন তিনি কোনো সাড়াই পেলেন না। অবস্থাটা এমন ছিল, ক্রুসেডাররা এন্টিয়ক আক্রমণ করায় আশেপাশের আমিররা বরং খুশিই ছিলেন! কেননা, তারা মনে করেছিল, তাদের প্রতিপক্ষের এবার একটা উচিত শিক্ষা হবে। আর এর পরিণতিতে তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য আরও বেড়ে যাবে। ফলে এন্টিয়কের শাসক আশেপাশের মুসলিম শহরগুলো থেকে কোনো সহযোগিতাই পাননি। উলটো এন্টিয়ক শহরের প্রতিরক্ষা অস্ত্রগুলো নির্মাণের দায়িত্বে যে ব্যক্তি ছিল, তার সাথে এন্টিয়কের আমিরের ব্যক্তিগত রেষারেষি থাকায় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে-ই শহরের একটি প্রবেশদ্বার ক্রুসেডারদের জন্য খুলে দিয়েছিল।

ক্রুসেডাররা কোনো শহর একবার জয় করতে পারলে, সে শহরের বাসিন্দাদের ওপর চালাত গণহত্যা। জেরুসালেম যাওয়ার পথে এন্টিয়ক ও অন্যান্য শহরে তারা যে নৃশংসতা চালিয়েছিল, তা আশেপাশের মানুষের মধ্যেও ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মুসলিম আমিররা ক্রুসেডারদের সাথে সংঘাত পরিহার করতে চাইল। যখনই তারা বুঝে গেল, ক্রুসেডারদের মূল লক্ষ্য এ সকল মাঝপথের শহর ও ভূখণ্ড নয়; বরং তাদের টার্গেট হলো জেরুসালেম, তখন অনেকেই তাদের খাবার ও সেনা সমর্থন দিয়ে সাহায্য করল এবং সংঘাতে না জড়িয়ে শহরগুলো নির্বিঘ্নে পাড়ি দেওয়ার সুযোগ করে দিলো। তারা ভাবল, সমস্যা তো আমাদের না; বরং জেরুসালেমের। আর জেরুসালেমের জন্য আমার শহর কেন আক্রান্ত হবে! ফলে ১০৯৯ সালের গ্রীষ্মে ক্রুসেডাররা চূড়ান্তভাবে জেরুসালেমের দুয়ারে পৌঁছে যায়।

জেরুসালেমের নিজস্ব প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। এর আগে অনেক বছর ধরে শহরটি পর্যায়ক্রমে ফাতেমীয় ও সেলজুকদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শহরটির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল ভঙ্গুর। ফাতেমীয়রা কখনও বুঝতে পারেনি ক্রুসেডাররা জেরুসালেমের জন্য হুমকি হতে পারে! তাই তারা শহর প্রতিরক্ষায় নামমাত্র প্রস্তুতি নিয়েছিল। ফাতেমীয়রা মিশর থেকে একটা সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল, কিন্তু তারা জেরুসালেম পৌঁছানোর আগেই সব শেষ হয়ে যায়। ১০৯৯ সালে প্রায় এক সপ্তাহ অবরোধ করে রাখার পর ক্রুসেডাররা জেরুসালেমে প্রবেশ করে। মুসলিমদের কাছ থেকে শহরটি হাতছাড়া হয়ে যায়। উমর ফারুক ฑ জেরুসালেমের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ৪৬২ বছর পর খ্রিষ্টানরা পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়।

"আল আকসা মসজিদ এবং তার আশেপাশে ক্রুসেডাররা এমনভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, যেন কোনো মানুষ দাঁড়ালে তার হাঁটু অবধি রক্তেই ডুবে যেত।"

– রেইমন্ড ডি এগুইলার্স নামক একজন ক্রুসেডার ১০৯৯ সালে জেরুসালেম জয় প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছিল।

মুসলিম বিশ্বের জন্য জেরুসালেমের নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়াটা ছিল বিরাট এক বিপর্যয়। শহরে যে ৭০ হাজার নাগরিক ছিল, তাদের সবাইকে ক্রুসেডাররা হত্যা করে। গোটা আল আকসা মসজিদ মুসলিমদের রক্তে ভরে যায়। গোটা শহর জুড়ে সমস্ত মসজিদ ও ইহুদিদের সিনাগগগুলো ধ্বংস করা হয়। এমনকি খ্রিষ্টানরাও নিপীড়নের শিকার হয়। এর আগে জেরুসালেমে যে গ্রিক, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান ধারার চার্চ এবং খ্রিষ্টানরা ছিল তারাও নিষ্পেষণের শিকার হয়! কেননা, ক্রুসেডাররা তাদের নতুন ধারার ক্যাথলিক চিন্তাধারাকে মূল খ্রিষ্টধর্ম হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য জবরদস্তি করছিল। মুসলিমদের তৃতীয় পবিত্র শহরটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ঘটনা গোটা বিশ্বের মুসলিমদের ব্যথিত করেছিল। বিশেষ করে কায়রো ও বাগদাদে কষ্টের সাথে সাথে মুসলিমদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জন্ম নেয়। তারা বুঝতে পারছিল, মুসলিমরা একতাবদ্ধ থাকলে ক্রুসেডাররা এত দূর কখনও আসতে পারত না। জেরুসালেমের দ্বারপ্রান্তে ফাতেমীয়রা ক্রুসেডারদের হাতে ধরাশায়ী হওয়ার পর শহরটি পুনরুদ্ধারে তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র আর অভ্যন্তরীণ বিভাজনের কারণে ফাতেমীয়রা ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আব্বাসীয় খিলাফত বলতে তখন যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও ছিল ক্ষমতাহীন। আর সিরিয়া, ইরাক ও পারস্যে অবস্থানরত তুর্কি মুসলিম সেনাবাহিনীও নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে ছিল। মুসলিম বিশ্বের এই বেহাল অবস্থার সুযোগ নিয়ে ক্রুসেডাররা

ফিলিস্তিন ও সিরিয়া জুড়ে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে শুরু করে। জেরুসালেম আসার পথে যে শহরের আমিররা তাদের সাহায্য করেছিল, কালক্রমে তারা সেসব শহরও জয় করে নেয়। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে ক্রুসেডাররা গোটা ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় এলাকাতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভিকায় মধ্যপ্রাচ্য ভিন্ন এক চেহারা ধারণ করল। কারণ, ইসলামের আবির্ভাবের পর এই প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের পবিত্র ভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যেন একসাথে সংযুক্ত হলো। ফ্রাংক নাইটরা জেরুসালেম দখল করেছিল, সেখানে তারা ইউরোপীয় ঢঙ্গে সামন্তপ্রথা চালু করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, ক্রুসেডার সেনারা, যারা মূলত গোটা জেরুসালেমের অধিবাসীদের হত্যা করল, আশেপাশের জনপদগুলো খালি করে ফেলল, এর বিনিময়ে তারা কিছুই পেল না। উলটো এসব বিশাল জমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল সেই নাইটরা। তবে ক্রুসেডাররা সফল হলেও জেরুসালেমের প্রতি তাদের স্বজাতিদের সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারল না। ইউরোপীয়রা সফল ক্রুসেডের পরও জেরুসালেমে প্রত্যাশিত হারে খ্রিষ্টানদের অভিবাসন করতে পারেনি; বরং সেখানে সামন্তপ্রথা বিস্তৃতি লাভ করল। আর ক্রুসেডাররা এখান থেকে মুসলিমদের সাধনালব্ধ দর্শন ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে পাচার করার সুযোগ পেয়ে গেল।

অর্থনৈতিকভাবে যে পরিবর্তনটি ঘটল তা হলো, ক্রুসেডের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নতুন করে একটি অর্থনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ল। মধ্যযুগের ইউরোপে সর্বাধিক সংখ্যক বণিক নৌযাত্রী ছিল ইতালিতে। তাই ক্রুসেডাররা যখন ১০৯০-এর দশকের শেষ দিকে সিরিয়ান উপকূল দিয়ে জেরুসালেম পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তখন ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইতালির বণিকরাও তাদের পিছু পিছু সেখানে পৌঁছে গেল। জেরুসালেমে ক্রুসেডাররা নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করার পর থেকে ইতালীয় বণিকরা সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করতে শুরু করল। তাই একসময় যেসব পণ্য এখানকার মানুষ দেখেওনি, সেগুলো পর্যন্ত সহজলভ্য হয়ে পড়ল। ফলে ইতালিতে, বিশেষত সেখানকার বণিক পরিবারগুলোর হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ জমা হতে লাগল। সে সম্পদ আরও কয়েকগুণে বেড়ে গেল যখন মুসলিমদের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপীয় ভাষাতে অনূদিত হতে শুরু করল। আর এ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে ইউরোপে চতুর্দশ শতাব্দীতে রেনেসাঁ তথা শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হলো। সেই সাথে ইউরোপীয় নগর-রাষ্ট্রগুলোতে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ায়, এর ওপর ভর করে ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা অটোম্যানদের জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা জেরুসালেম দখলে নেওয়ার পর প্রথম কয়েক বছর তাদের রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে তেমন একটা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়নি। কেননা, মুসলিম সাম্রাজ্য তখন ছিল যথেষ্ট দুর্বল ও ভঙ্গুর অবস্থায়। যদিও ক্রুসেডাররা দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আবির্ভূত হয়, তারপরও জেরুসালেম কখনও বাগদাদ, দামেস্ক বা কায়রো থেকে দূরে ছিল না। অথচ এসব স্থান থেকে ক্রুসেডারদের কোনো বাধার মোকাবিলা করতে হয়নি; বরং তাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াল একজন তুর্কি আমির, যার নাম ইমাদ উদ্দিন জংগি। নেতা হিসেবে জংগি একটু রুক্ষ হলেও তার একটি অনবদ্য কৃতিত্ব হলো, তিনি মসুল আর আলেপ্পোকে একক শাসনাধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দুই শহর তার নিয়ন্ত্রণে থাকায় ১১৪৪ সালে তার সেনাবাহিনী এডেসাও জয় করে নেয়। এডেসা ছিল ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শহর। এডেসা জয় করতে জংগিকে অবশ্য তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি। কারণ, রাজনৈতিকভাবে এডেসা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, আর ক্রুসেডাররাও এই শহরকে ততটা শক্তভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করেনি। তা সত্ত্বেও এটি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একটি বার্তা ছিল। মুসলিমরা আবার আসছে এই ইঙ্গিতটা জংগি দিতে সক্ষম হলেন।

জংগি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সফল হওয়ার জন্য গোটা সিরিয়াকেই তার নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিলেন, আর তা করতে গেলে দামেস্ককে নিয়ন্ত্রণে নিতে হতো। কিন্তু তিনি তা পারছিলেন না। মুসলিম আমিররা তখনও দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, আর দামেস্কের আমির মুসলিমদের একতার জন্য নিজের শহরটি ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। ১১৪৬ সালে যখন ইমাদ উদ্দিন জংগি মারা যান, তখন তার সন্তান নুরউদ্দিন দায়িত্বে আসেন এবং মধ্যপ্রাচ্যকে এক জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করেন।

১১৪৯ সালের মধ্যেই নুরউদ্দিন এন্টিয়ক এবং এর আশেপাশের বিশাল এলাকা জয় করে নেন। আর ১১৫৪ সালে তিনি স্থানীয় জনগণের সহায়তা নিয়ে দামেস্কের আমিরকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। দামেস্কের আমির ক্রুসেডারদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। সিরিয়া পুরোটাই যখন নুরউদ্দিনের নিয়ন্ত্রণে চলে এলো, তখন অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু তখনই একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল, যার কারণে নুরউদ্দিনকে জেরুসালেম নয় বরং মিশর ও পতনের মুখে থাকা ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের দিকে নজর দিতে হলো।

সেলজুকদের পতনের পর আবার যখন সিরিয়াকে একীভূত করা সম্ভব হলো, তখন মুসলিমদের হাতে বিরাট একটি সাম্রাজ্য চলে এলো। সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়াতে হলে ক্রুসেডারদের তখন দক্ষিণের দিকে অর্থাৎ মিশর দখলের জন্য অভিযান পরিচালনা করতে হবে। মিশরের ফাতেমীয় রাজা নির্ধারিত কর দিতে অস্বীকার করায়, ১১৬৩ সালে জেরুসালেমের রাজা মিশর আক্রমণ করল। ক্রুসেডারদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মিশরের উজির শাওয়ার নুরউদ্দিনের কাছে সাহায্য চাইলেন। ফলে নুরউদ্দিন ১১৬৪ সালে মিশরে মুসলিম সেনাদের একটি বড়ো বাহিনী পাঠালেন, যাতে তারা ফাতেমীয় সেনাদের সাথে মিলে ক্রুসেডারদের পরাজিত করতে পারে এবং শাওয়ারকে পুনরায় ক্ষমতায় বসাতে

পারে। সে যুদ্ধে ক্রুসেডাররা পরাজিত হয় এবং শাওয়ার আবার উজির পদে আসীন হন। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ফাতেমীয় শিয়া আর সুন্নি সিরিয়া সবাই একজোট হয়ে তখন জেরুসালেম জয়ে অভিযান শুরু করতে পারে। কিন্তু তা হয়নি। কারণ, শাওয়ার উজির হওয়া মাত্রই তার অবস্থান পরিবর্তন করলেন। যে ক্রুসেডারদের সাথে তিনি যুদ্ধ করলেন, সেই ক্রুসেডারদের সাথেই আপস করে মিশরে অবস্থানরত নুরউদ্দিনের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। ক্রুসেডার-ফাতেমীয়দের যৌথ আগ্রাসনের মুখে জংগির সেনাবাহিনী সিরিয়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

চার বছর পর ক্রুসেডাররা আবার মিশর আক্রমণ করে, যাতে মিশরসহ আশেপাশের বেশ কিছু এলাকা তারা নিজেদের জিম্মায় নিয়ে আসতে পারে। আরও একবার নুরউদ্দিনের কাছে সাহায্য চাওয়া হলো এবং বলা হলো মিশরকে রক্ষা করার জন্য সুন্নি-শিয়া ঐক্য গড়া প্রয়োজন। মিশরকে সাহায্য করার জন্য জংগির বাহিনী আরও একবার নীলনদের তীরে পৌঁছাল। তবে তারা এবার শাওয়ারকে আর ছেড়ে দিলো না। ক্রুসেডাররা পরাজিত হলো আর শাওয়ারকে তার পূর্বের প্রতারণার জন্য ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। ফাতেমীয় সাম্রাজ্য এই ঘটনার পরপর পুরোপুরি বিলুপ্ত না হলেও এ এলাকাকে শাসনপদ্ধতিসহ আবার নুরউদ্দিনের নাগালে নিয়ে আসা হয়। আর মিশরের দায়িত্ব দেওয়া হয় তার অন্যতম সেনাপতি শিরকুহর হাতে। কিন্তু শিরকুহ মিশরের দায়িত্ব নেওয়ার মাস কয়েকের মাথায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মিশর পরিচালনার দায়িত্ব তখন এসে পড়ে শিরকুহর অল্প বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসুফের হাতে, যিনি ইতিহাসে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি হিসেবেই অধিক পরিচিত।

জেরুসালেম

রাজনীতি ও যুদ্ধ নিয়ে প্রথম অবস্থায় তেমন একটা আগ্রহ ছিল না সালাহউদ্দিন আইয়ুবির। তিনি দামেস্কে বড়ো হয়েছেন, সে যুগের বড়ো বড়ো মনীষীদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সুন্নি। ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী এবং আশারিয়া চিন্তাধারার একজন সমর্থক। তিনি সরকারি কাজের তুলনায় ধর্মচর্চা ও জ্ঞানচর্চার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তার চাচা শিরকুহর অনুপ্রেরণায় তিনি মিশরীয় সামরিক অভিযানে অংশ নেন। এরপর যেন তাকদিরই তাকে ভিন্ন দিকে টেনে নিয়ে যায়। ১১৬৯ সালে যখন তিনি চাচার স্থলে মিশরের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান, তখন তার কর্মকৌশলে স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের শক্তিশালী প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল। এতদিন যে ফাতেমীয় খিলাফত সুন্নি মুসলিমদের গলার কাঁটা হয়ে বিঁধেছিল, তিনি দায়িত্ব নিয়েই এক ঝটকায় তার অবসান ঘটান। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, যে প্রতিষ্ঠানের সূচনাই হয়েছিল ইসমাইলিয়া মতাদর্শ প্রচারের জন্য, সে বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি মূলধারার সুন্নি ইসলামি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন– যা আজও অব্যাহত রয়েছে। মিশরের সাধারণ মানুষ সে অর্থে শিয়া মতবাদকে কখনও আপন করে নেয়নি, তাই তারা সালাহউদ্দিনের সংস্কার ও সুন্নিপন্থি কার্যক্রমকে স্বাগত জানান।

কিন্তু সালাহউদ্দিনের এসব কার্যক্রমকে তার মূল অভিভাবক ও তৎকালীন একীভূত সিরিয়ার শাসক নুরউদ্দিন খুব একটা ভালোভাবে নেননি। মিশরের এই নতুন নেতৃত্বকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেন, যার ফলে মিশর কর্তৃপক্ষের সাথে তার এক ধরনের টানাপোড়ন শুরু হয়। অনেকেই ধারণা করছিল, নুরউদ্দিন আর সালাহউদ্দিনের মধ্যে যেকোনো সময় যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। যদিও সেটা কখনও হয়নি। ১১৭৪ সালে দুরারোগ্য এক ব্যধিতে নুরউদ্দিন ইন্তেকাল করেন।

নুরউদ্দিনের ইন্তেকালের পর সালাহউদ্দিন আইয়ুবি সিরিয়া গমন করেন এবং বিপুল জনসমর্থন পেয়ে সিরিয়ার শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। ফাতেমীয় শিয়াদের উত্থানে যে মিশর ও সিরিয়া সুন্নিরা হারিয়ে ফেলেছিল, অবশেষে আইয়ুবির মাধ্যমে সুন্নিরা সে এলাকা নিজেদের জিম্মায় নিয়ে আসতে সক্ষম হলো। ক্রুসেডাররাও এই প্রথম একটি শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টের পেল। আর এ বাস্তবতা তাদের জন্য ছিল খুবই উদ্বেগের কারণ। কেননা, এই বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসক জেরুসালেম পুনরুদ্ধারকে তার একান্ত ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবেই বিবেচনা করবেন। ক্রুসেডারদের জন্য আরেকটা বড়ো সংকট ছিল এই যে, তাদের নিজেদের মধ্যকার একতা ও সংহতি ভীষণ রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে নাইটস টেম্পলার এবং নাইটস হসপিটালার– ইত্যাদি নাম দিয়ে বেশ কিছু সংগঠনের উদ্ভব হয়, যারা প্রতিনিয়ত জেরুসালেমের মূল প্রশাসনকে নাজেহাল করছিল। ১১৭০ থেকে ১১৮০ সালের মধ্যে মুসলিমরা একত্রিত হয়ে গেল, আর অন্যদিকে ক্রুসেডারদের মধ্যকার বিবাদ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। অর্থাৎ ১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা জেরুসালেম জয় করার সময় মুসলিমদের মধ্যে যে বিভক্তি-বিভাজন ছিল, ১০০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সেরকমেরই বিভক্তি-বিভাজন খ্রিষ্টানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

এরপরও সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি শুরুতেই যুদ্ধে জড়াতে চাননি। তিনি জেরুসালেম প্রশাসনের সাথে শান্তিচুক্তি করলেন এবং নিজের সাম্রাজ্যকে সব ধরনের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুমকি থেকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করলেন। তার জন্য সেসময় সবচেয়ে পেরেশানির কারণ ছিল হাশাশিন (পশ্চিমে এই গ্রুপটিকে অ্যাসাসিন নামে অভিহিত করা হয়) নামক ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের একটি গ্রুপ, যারা বিশ্বাস করত ফাতেমীয়রা ইসমাইলিয়া চেতনাকে সঠিকভাবে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সুন্নি সাম্রাজ্যকে নাস্তানাবুদ করার জন্য বিভিন্ন এলাকার

শাসক ও গভর্নরের বিরুদ্ধে গোপন হত্যা মিশন পরিচালনা করে। সালাহউদ্দিন বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও এই গ্রুপটিকে সমূলে নির্মূল করতে পারেননি। উলটো তিনি নিজেই দুই দফায় তাদের গুপ্ত হত্যাচেষ্টা থেকে কোনো রকম বেঁচে যান।

১১৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসে সালাহউদ্দিন ক্রুসেডারদের দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। সহজ করে বললে, তিনি বাধ্য হয়েছিলেন! কেননা, রেমন্ড ডে চ্যাটিলন নামক এক নাইট বেশ কয়েকবার পূর্ব স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করে এবং মুসলিম তীর্থযাত্রীদের একটি দলকে নির্বিচারে হত্যা করে। এই কাজে জেরুসালেমের প্রশাসন সম্পৃক্ত থাকায় সালাহউদ্দিন আর জেরুসালেমের ক্রুসেডার শাসকদের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

১১৮৭ সালে ঐতিহাসিক হিত্তিনের যুদ্ধে সালাহউদ্দিন আইয়ুবির সেনাবাহিনী জেরুসালেমের ক্রুসেডারদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। জেরুসালেমে তখনও অল্প কিছু নাইট অবশিষ্ট ছিল, আর তারা সে বছরের অক্টোবরে সালাহউদ্দিনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ৮৮ বছর আগে ক্রুসেডাররা এই শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। তখন তারা হাজার হাজার মানুষের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছিল, সকল ধর্মীয় স্থাপনাকে খ্রিষ্ট ধর্মীয় স্থাপনায় রূপান্তর করেছিল। অন্যদিকে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবির বাহিনী ব্যতিক্রম উদাহরণ তৈরি করে। সালাহউদ্দিন শুরু থেকেই হযরত উমর ῃ-এর নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করার পক্ষে ছিলেন। ৬৩৭ সালে খলিফা উমর ῃ যখন প্রথমবারের মতো জেরুসালেম জয় করেন, তখন তিনি মানবিকতা আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুপম নিদর্শন স্থাপন করেছিলেন। সালাহউদ্দিন আইয়ুবিও সে ধারাবাহিকতাই অনুসরণ করেন। তিনি শহরের বাসিন্দাদের নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেন। প্রয়োজনীয় সবকিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতিও প্রদান করেন। শহরে ঐতিহাসিক যত খ্রিষ্ট ধর্মীয় স্থাপনা ছিল, সবগুলো সংরক্ষণ করা হয় এবং খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের সেগুলো নিয়মিতভাবে জিয়ারতেরও সুযোগ দেওয়া হয়। সালাহউদ্দিনের এসব মানবিক আচরণের খবর বিদ্যুৎবেগে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর সিংহহৃদয় খ্যাত রাজা রিচার্ডের সাথে সালাহউদ্দিনের যুদ্ধ হয় এবং সেখানেও উভয় পক্ষ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সালাহউদ্দিনের ইন্তেকালের পর তার সাম্রাজ্য আইয়ুবি রাজতন্ত্র নামে পরিচিত হয়। তার বংশধররা এরপরও আরও কয়েক বছর সিরিয়া ও মিশরকে নেতৃত্ব দিয়েছে। এরপর আরও বেশ কয়েকটি ক্রুসেডার বাহিনী জেরুসালেম জয় করার জন্য এসব এলাকায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা আর কখনও মুসলিমদের জন্য সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারেনি। বরং মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য ভিন্ন এক এলাকা থেকে পরবর্তী চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হয়। সালাহউদ্দিনের জেরুসালেম জয়ের মাত্র ২০ বছর পর চীনের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন মোঙ্গলীয় গ্রুপকে একত্রিত করে চেঙ্গিস খান বিশাল এক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। যদিও তারা মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে প্রায় ৫ হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল, তবুও চেঙ্গিসের সামরিক অভিযানগুলো খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে ইসলাম এবং ইসলামের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য বিশাল হুমকি হিসেবে আর্বিভূত হয়।

মোঙ্গল

নিয়তির নির্মম পরিহাস, এমন একটি সময়ে মোঙ্গলদের উত্থান হয় যখন মনে হচ্ছিল মুসলিমরা হয়তো পুনরায় পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে পারবে। তখন ফাতেমীয়দের অস্তিত্ব ছিল না, পারস্য ও সিরিয়াতে খুব সামান্য পরিমাণেই কিছু শিয়া মতাবলম্বীর অবস্থান ছিল। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সামান্য কয়েকটি উপকূলীয় এলাকা ক্রুসেডারদের কবজায় ছিল। কিন্তু এগুলো কেউই মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য বড়ো কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল না। অন্যদিকে, মানজিকার্তে বাইজেন্টাইনরা যেভাবে ধরাশায়ী হয়েছিল, সে লোকসান থেকে তারা তখনও ওঠে দাঁড়াতে পারেনি। আর ক্রুসেডাররাও বাইজেন্টাইনের স্বধর্মীয় খ্রিষ্টান বা কনস্টান্টিনোপলকে রক্ষার চেয়ে জেরুসালেম পুনরুদ্ধারেই বেশি আগ্রহী ছিল। তাই সেদিক থেকে বাইজেন্টাইনরা কোনো ধরনের শক্তি ও সমর্থনের আয়োজন করতে পারেনি।

১৩ শতকের শুরুতে মুসলিমদের মাঝে কিছুটা স্থিতিশীলতা থাকলেও তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। চেঙ্গিস খান ও তার বাহিনীর উত্থান হয়েছিল চীনের মহাপ্রাচীরের উত্তরে, আর সেখান থেকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখায়। উত্থানের মাত্র ১০ বছরের মধ্যে মোঙ্গল বাহিনী চীনের উত্তরাঞ্চলের প্রায় অর্ধেক দখল করে ফেলে। এবার চেঙ্গিস খানের নজর পড়ে পশ্চিমের দিকে। তারা ভেবেছিল এশিয়াতে যদি নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে তাদের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হলো মধ্য এশিয়ার কারা-খিতান সাম্রাজ্য। মধ্য এশিয়ার সমতল ভূমি মোঙ্গলদের কাছে ছিল খুবই সুবিধাজনক। কেননা, তাদের জন্ম ও বেড়ে উঠা ঠিক এধরনের সমতল এলাকাতেই। তাই তারা বেশ সহজেই এ এলাকাটি জয় করে নেয়। ১২১৯ সালে এসে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে এমন এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কোরিয়া সীমান্ত থেকে শুরু করে মুসলিম সাম্রাজ্যের পারস্যের কিনারা অবধি বিস্তৃত।

১৩ শতকের শুরুতে মোঙ্গলদের যে উত্থান ঘটেছিল, তা মানব ইতিহাসের সামরিক বিস্ময়ের অন্যতম একটি নিদর্শন। এই মোঙ্গল যাযাবররা শুধু ঘোড়া ছুটাতেই জানত। মানবিক অগ্রগতি ও জ্ঞানের সাধনায় এরা এতটাই পিছিয়ে ছিল যে, সামান্য কৃষিকাজটাও তারা ভালোমতো

জানত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বিশাল এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের ঘোড়া চালানোর দক্ষতাই তাদের এই সফলতার অন্যতম কারণ। মোঙ্গলরা দিনের পর দিন ঘোড়ার ওপর আরোহী হয়ে থাকতে পারত, এই একটি যোগ্যতাই তাদের অন্য সব সেনাবাহিনীর চেয়ে অনন্য উৎকর্ষতায় নিয়ে গিয়েছিল। তাদের গতি ছিল রুদ্ধশ্বাস্য, আর তারা সব সময়ই সফলভাবে শত্রুদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্কের বীজ ঢুকিয়ে দিতে পারত। এই ভয়টা এতটাই মারাত্মক ছিল যে, প্রতিপক্ষের সেনারা মোঙ্গলদের আগমনের কথা শুনলেই পালটা প্রতিরোধ তো দূরের কথা, বরং অস্ত্র ফেলে সারি বেঁধে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করত।

যখনই মোঙ্গল বাহিনী কোনো শহরের কাছে পৌঁছে যেত, তারা সে শহরের অধিবাসী ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামনে তিনটি বিকল্প উপস্থাপন করত। প্রথম সমাধান ছিল– সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া, মোঙ্গলদের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং মোঙ্গলরা যে সামরিক অভিযাত্রায় নেমেছে তার সাথে যোগ দেওয়া। দ্বিতীয়টি ছিল– যদি সেই শহর আত্মসমর্পণ না করে মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে এবং পরাজিত হয়, তাহলে পরাজিত সেনাবাহিনীকে মোঙ্গলদের তরবারীর কাছে নত হতে হবে ও শহরটি লুট করা হবে। আর তৃতীয়টি হলো– যদি কোনো শহরের সেনাবাহিনী ও বেসামরিক নাগরিকরা মিলে মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে হেরে যায়, তাহলে মোঙ্গলরা শহরের প্রতিটি সেনা ও সাধারণ নাগরিককে হত্যা করবে এবং অমানবিক পাশবিকতার চিহ্ন রেখে যাবে। ইরাক থেকে চীন পর্যন্ত এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকার অনেক ছোটো-বড়ো শহর মোঙ্গলদের এ ধরনের বর্বরতার চিহ্ন আজও বয়ে বেড়াচ্ছে। মোঙ্গলদের এই তিন কৌশল ও বর্বর মানসিকতার কারণেই তারা গোটা এশিয়াকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে বিরাট একটি সাম্রাজ্য দখল করতে সক্ষম হয়।

মুসলিম সাম্রাজ্যের যে এলাকাটি মোঙ্গলদের একেবারে গা ঘেঁষে ছিল, তা হলো খাওয়ারিজম। এই সাম্রাজ্যটি সেলজুকদের নানা ভগ্নাংশের ওপর ভর করে তৈরি হয়েছিল। গোটা পারস্য সাম্রাজ্য তখন একীভূত হয়ে শাহ মুহাম্মাদের অধীনে (১২০০-১২২০) পরিচালিত হচ্ছিল। শাহ মুহাম্মাদ তুর্কি বংশোদ্ভূত হলেও তিনি বড়ো হয়েছেন পারস্য সংস্কৃতির আবহে। তার সময়ে এসে আব্বাসীয় খিলাফত– যারা এতদিন অনেকটাই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিলেন– পুনরায় নিজেদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। আব্বাসীয়রা নির্জীব হিসেবে প্রায় এক শতাব্দী পড়ে থাকার পর নাসির নামক একজন খলিফা আব্বাসীয় খিলাফতের দায়িত্বে আসেন, যিনি বাগদাদের বাইরে ইরাকের অন্যান্য স্থানে এবং পারস্যের কিছু অংশে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। শাহ মুহাম্মাদ আব্বাসী খলিফার এই উদ্যোগকে মেনে নেননি। কেননা, তিনি নিজেও মুসলিম সাম্রাজ্যে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। যাহোক, আব্বাসীয় খলিফা নাসিরের বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে শাহ মুহাম্মাদ তার ক্রীতদাস সেনাদের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এই সেনারা আগে থেকেই আব্বাসীয়দের মোকাবিলা করতে গিয়ে যুদ্ধের ভারে ক্লান্ত ছিল। তাই তারা নতুন করে আর কোনো বাহিনীর আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করার মতো সক্ষম ছিল না। আর সেই সুযোগে ১২১৯ সালে চেঙ্গিস খানের বাহিনী শাহ মুহাম্মাদের খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

খাওয়ারিজমরা এরপরও মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগে মোঙ্গলদের একটি বণিক দল অগ্রগামী দল হিসেবে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করা মাত্রই গুপ্তচর সন্দেহে তাদের হত্যা করা হয়। চেঙ্গিস খান এই হত্যাকাণ্ডকে মোটেও ভালোভাবে নেননি। ফলে পরের বছরই মোঙ্গলরা প্রথমবারের মত মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। প্রথমেই তারা পারস্য, ইরাক ও সিরিয়াতে থাকা মুসলিম সভ্যতার নানা নিদর্শন ধ্বংস করতে শুরু করে। মোঙ্গলরা নিজেদের সামরিক দক্ষতার পাশাপাশি চীন থেকে আমদানি করা নানা ধরনের যুদ্ধাস্ত্র এই অভিযানে ব্যবহার করে। ফলে বেশ দ্রুততম সময়ের মধ্যেই পারস্যের পূর্বাঞ্চল এবং প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা ইমাম বুখারি রহ.-এর স্মৃতি বিজড়িত বুখারা শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। প্রাচীন বলখ এলাকারও একই পরিণতি হয় এবং সেখানে সংরক্ষিত পুরোনো প্রচুর গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি পার্শ্ববর্তী অক্সাস নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। মোঙ্গলরা নিজেরা মূর্খ হওয়ায় মুসলিমদের লেখা বই ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা সৃষ্টির বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। তারা ছিল যোদ্ধা, আর তারা যুদ্ধ ছাড়া কিছুই বুঝত না। এক পর্যায়ে যুদ্ধ জয় করতে করতে তারা যখন আজকের ইরান ও আফগানিস্তানে পৌঁছে গেল, ততদিনে তারা বিশাল বিশাল অনেক শহর রীতিমতো শূন্য করে ফেলেছে। সে সময়ের মুসলিম ইতিহাসবিদদের তথ্য থেকে জানা যায়, মোঙ্গলরা নিশাপুরে ১৭ লাখ মানুষ এবং হিরাতে আরও ২০ লাখ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। এই সংখ্যাটি কম-বেশি হতে পারে, তবে এরকম বিশাল সংখ্যা ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দেখে বোঝা যায়, মোঙ্গলরা কতটা নৃশংস ও বর্বর মানসিকতা নিয়ে সামরিক অভিযানগুলো পরিচালনা করেছিল। ৬শ বছর ধরে তিলে তিলে মুসলিমরা যে বিশাল সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, মোঙ্গলরা মাত্র কয়েক সপ্তাহে তা রীতিমতো নিঃশেষ করে দিয়েছিল। ১২২২ সালে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। চেঙ্গিস খান এরপর আর মুসলিম সাম্রাজ্যের গভীরে অগ্রসর হতে চাননি। তিনি খাওয়ারিজম থেকে পুনরায় মঙ্গোলিয়া ফিরে যান এবং ১২২৫ সালে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর মুসলিমরা একটু হলেও যেন স্বস্তি পায়। কেননা, চেঙ্গিস খানের উত্তরাধিকারী তার ছেলে ওগেদাই মুসলিম সাম্রাজ্য নয় বরং উরাল পর্বতমালা পাড়ি দিয়ে ইউরোপ জয় করতেই বেশি আগ্রহী ছিল। তার নেতৃত্বে মোঙ্গলরা ইউরোপ জয়েও বেশ সফলতা দেখায় এবং ১২৩৭ সালে মোঙ্গল বাহিনী রাশিয়া পাড়ি দিয়ে হাঙ্গেরি ও জার্মানিতে পৌঁছে যায়। ইউরোপে খ্রিষ্টান যত শাসক ছিল, তারা মোঙ্গলদের

এই আগ্রাসনে ভয় পেয়ে যায়। তারা আতঙ্কিত ছিল, মোঙ্গলরা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের যে বেহাল অবস্থা করেছে, ইউরোপের অবস্থাও তেমনটাই করে দেয় কি না। মোঙ্গলরা মুসলিম সাম্রাজ্যে যেমন হুট করে আগ্রাসন থামিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি করে ১২৪১ সালে ওগেদাইয়ের মৃত্যুর পর মোঙ্গলদের ইউরোপ জয়ের মিশনও বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য খ্রিষ্টানরা তখনও আরেকটি ক্রুসেড সম্পন্ন করে জেরুসালেম জয় করতে বেশি আগ্রহী ছিল। আর তা বাস্তবায়ন করার জন্য তাদের অন্য কোনো পরাশক্তির সহযোগিতা দরকার ছিল। এক্ষেত্রে মোঙ্গলরা তাদের জন্য যথেষ্ট সহায়ক ছিল। তা ছাড়া মোঙ্গল নিয়ন্ত্রিত এলাকার ভেতর দিয়ে যাওয়াও ইউরোপীয়দের জন্য ছিল সুবিধাজনক। কেননা, এরই মধ্যে চেঙ্গিসের অনেক বংশধর এসব এলাকার খ্রিষ্টানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিল। ফলে খ্রিষ্টানরা বারবার মোঙ্গলদের অনুরোধ করে যাচ্ছিল, যাতে তারা মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। খ্রিষ্টানরা নিজেদের স্বার্থ মোঙ্গলদের দিয়ে বাস্তবায়ন করাতে চাইছিল। মোঙ্গলরাও সেই ফাঁদে পা দেয় এবং খ্রিষ্টানদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১২৫৫ সালে তারা মুসলিম সাম্রাজ্যে নিজেদের ষোলো আনা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভিযান শুরু করে।

এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মোঙ্গল সেনাপতি হালাকু খান। তিনি বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টীয় উগ্রবাদীদের চিন্তায় প্রভাবিত হওয়ায় ভীষণ রকম মুসলিমবিদ্বেষী ছিলেন। মোঙ্গলরা হালাকুর নেতৃত্বে ১ লাখ সেনার বিশাল এক বাহিনী গড়ে তোলে। আর্মেনিয়ার খ্রিষ্টানরা ও ক্রুসেডারদের বেশ কিছু গ্রুপও এতে যোগ দেয়। অন্যদিকে, মুসলিমরা এ জাতীয় আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তিন দশক আগে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে মোঙ্গলদের আক্রমণের পর থেকেই মুসলিম সাম্রাজ্যের এই অংশটি এমনিতেই ভগ্নদশায় পড়েছিল। ইরাকের ওপরও আব্বাসীয়দের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারা মূলত অ্যাসাসিনদের মোকাবিলাতেই ব্যস্ত সময় পার করছিল। অন্যদিকে, ১২৫০ সালে এসে মামলুকদের হাতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবির বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত আইয়ুবি রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। যদিও এই মামলুকরা একসময় আইয়ুবিদের অধীনেই ক্রীতদাস সেনা হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। পরবর্তী সময়ে মামলুকরা মিশরে মামলুক সালাতানাত প্রতিষ্ঠা করে। মুসলিমদের এই অনৈক্য আর বিভাজনের মুখে তারা আবারও বহিঃশক্তির আগ্রাসনের শিকার হয়, আর সেই আগ্রাসনের হাত ধরে মুসলিমদের ওপর আরও একবার ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে।

মোঙ্গলরা প্রথমে পারস্যে প্রবেশ করে এই সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেয়। তারা অ্যাসাসিনদের ওপর সর্বগ্রাসী আক্রমণ পরিচালনা করে। অ্যাসাসিনদের ঘাঁটি ছিল আলামুতে। এর আগে সুন্নিরা বহুদিন আলামুত জয়ের চেষ্টা করেও পারেনি। কিন্তু হালাকু ১২৫৬ সালে এই আলামুতকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। অ্যাসাসিনদের এই পতন দেখে সুন্নি মুসলিমরা হয়তো আনন্দ পেত, কিন্তু সে সুযোগ তারা পায়নি। কেননা, অ্যাসাসিনদের শেষ করার পরই হালাকু খান চোখ ফেরায় বাগদাদের দিকে, যা ৭৫০ সাল থেকে মুসলিম খিলাফতের রাজধানী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল।

সেসময় আব্বাসীয় খলিফা ছিলেন আল মুতাসিম। তিনি মোঙ্গলদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হননি। মুসলিমরা এর আগে কখনও কোনো শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি; শহরও ত্যাগ করেনি। এমনকি ফাতেমীয় ও ক্রুসেডারদের যখন দৌরাত্ম্য ছিল তখনও নয়। মুসলিমরা তখনও আল্লাহর সাহায্য প্রত্যাশা করত এবং ভাবত, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের শত্রুর হাত থেকে হেফাজত করবেন। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তখন মুসলিমরা সেই মানে বা অবস্থানে ছিল না যে, তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার সে পর্যায়ের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বা সংযোগ থাকবে। তারপরও ১২৫৮ সালে যখন মোঙ্গলরা বাগদাদে পৌঁছে গেল, মুসলিমরা তখনও আশাবাদী ছিল। তবে এবার আর কোনো আলৌকিক সাহায্য এসে মুসলিমদের রক্ষা করল না। আশেপাশের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র যারা ছিল তারাও কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো না। আর বাগদাদের মাটিতেও এমন কোনো সাহসী বীর দেখা যায়নি, যে কিনা মোঙ্গলদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধের ডাক দিতে পারে। ফলে মাত্র ১ সপ্তাহ অবরোধ করে রাখার পরই মোঙ্গলরা বিজয়ী হয়ে যায়। ১২৫৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি হালাকুর সেনাবাহিনী শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ দখল করে নেয়।

বাগদাদের পতন ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নেতিবাচক ও মর্মান্তিক ঘটনা। মোঙ্গলরা অন্য সব শহরে যেমন গণহত্যা চালিয়েছিল, ঠিক একইভাবে বাগদাদের পতনের পর সেখানেও গণহত্যা শুরু করে। বাগদাদে সে সময় প্রায় ১০ লাখ মুসলিম বসবাস করত। তাদের প্রায় সবাইকেই মোঙ্গলরা হত্যা করে। শুধু শহরের খ্রিষ্টান নাগরিকরা এই গণহত্যার হাত থেকে রেহাই পায়। মানুষের রক্তে শহরে বয়ে যায় রক্তের স্রোত। খলিফা আল মামুন এর আগে যে বায়তুল হিকমাহ নামক বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন, তা সম্পূর্ণভাবে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সকল বই পার্শ্ববর্তী টাইগ্রিস নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। কালির কলমে লেখা বইগুলোর সেই কালি টাইগ্রিস নদীর পানির সাথে মিশে গোটা নদীকেই কালো বানিয়ে দেয়। মুসলিমরা কয়েকশ বছর ধরে গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব এবং আইনের ওপর যে কাজগুলো করেছিল, এক নিমিষেই তা চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। এই হারানোর পরিমাণটি এত বেশি যে আজকের সময়ে এসে আমরা সোনালি যুগ বলতে ইবনে হাইসাম, আল বিরুনি ও ইবনে সিনার দুয়েকটি কাজ ছাড়া আর তেমন কিছুই খুঁজে পাই না। এই মনীষীদেরও অন্য কোনো কাজ আর চিহ্নিত করা যায় না। আর সেসময়ে জানা-অজানা আরও যত বিদ্বান ও জ্ঞানী তাদের অনন্যসাধারণ কীর্তি রেখে গেছেন, সেগুলোরে তো কোনো হদিসই নেই। সেই বইগুলো, জ্ঞানের সেই নিদর্শনগুলো আমরা আর কখনোই পড়তে পারব না।

বাগদাদ ধ্বংস করার পর খলিফা আল মুতাসিমকে হালাকুর সেনারা আটক করে। তাকে তারই ব্যবহৃত একটি দামি কার্পেটে মুড়িয়ে সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সেনারা তাকে ঘোড়া দিয়ে পদপিষ্ট করে হত্যা করে। আব্বাসীয় খিলাফতের কোনো অস্তিত্বই আর থাকত না, যদি তাদের অপর এক বংশধর সে সময়ে মিশরে ক্ষমতায় না থাকত। আব্বাসীয় খিলাফত মিশরে ১৫১৭ সাল পর্যন্ত মামলুকদের অধীনে টিকে ছিল। যদিও তখন খলিফার হাতে তেমন কোনো ক্ষমতা ছিল না। তারা নামেই শুধু শাসক বা খলিফা ছিলেন। বাগদাদের পতন শুধু একটি শহরের জয়-পরাজয়ের ইতিহাস নয়; এর মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রস্থলের পতন হয়। এরপর আর কখনও মুসলিম সাম্রাজ্য আগের সেই গৌরবময় অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি।

বাগদাদ জয় করেই থেমে যাওয়ার কোনো অভিলাষ মোঙ্গলদের ছিল না। এরপর তারা সিরিয়া, দামেস্ক ও আলেপ্পোও দখল করে নেয়। আলেপ্পো আর দামেস্ক দখল করে নেওয়ায় খ্রিষ্টানরা খুবই উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়। দামেস্কের সবচেয়ে বড়ো মসজিদে খ্রিষ্টানরা বিশাল সমাবেশেরও আয়োজন করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, মোঙ্গলরা সহসা মিশরও দখল করে নেবে এবং জেরুসালেমসহ মুসলিম সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ জয়ে মোঙ্গলদের কেউ থামাতে পারবে না। কিন্তু তেমনটা হয়নি। ফিলিস্তিনের উত্তরাঞ্চলে ১২৬০ সালে সংঘটিত এক যুদ্ধে মামলুক সুলতানের হাতে মোঙ্গলরা পরাজিত হয় এবং তাদের বিজয়রথ সেখানেই থেমে যায়। মামলুক সুলতান বাইবার্স সে যুদ্ধে মোঙ্গলদের অশ্বারোহী বাহিনীর কৌশলই আবার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন এবং কাঙ্ক্ষিত জয় লাভ করেন। মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রবেশের পর এই প্রথম কোনো যুদ্ধে মোঙ্গলরা পরাজিত হলো। এর ফলে সে যাত্রায় মিশর এবং মুসলিমরা নতুন করে বড়ো ধরনের ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়।

মোঙ্গলরা এরপরও বেশ কয়েকবার নানা স্থানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, যদিও এর বেশিরভাগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা, তখন রাশিয়াতে বার্কি খান নামে মোঙ্গলদের যে শাসক ছিলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মামলুকদের সাথে জোট গঠন করে হালাকুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। মুসলিম বার্কি আর পৌত্তলিক হালাকুর মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব মুসলিমদের স্বস্তি এনে দিয়েছিল। ১৩ শতকের শেষে এসে মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে, আর তাদের সামরিক অভিযানও স্থায়ীভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। ফলে মোঙ্গলদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে মুসলিম সাম্রাজ্য রক্ষা পায় ঠিকই, কিন্তু মুসলিমদের কয়েকশ বছরের যে অসামান্য গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি ছিল, তখন তার মাত্র ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট ছিল। পারস্য ও ইরাক রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আর সিরিয়া ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি এলাকা। তখন শুধু মক্কা আর মদিনাই মোঙ্গলদের হাত থেকে সুরক্ষিত ছিল। মুসলিমদের ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে হতাশাজনক সময়। এমনকি মুসলিমদের বেহাল অবস্থা দেখে অনেকেই ভেবেছিল, কিয়ামত বোধ হয় অতি সন্নিকটে।

১৩ শতকে মুসলিমদের এই শোচনীয় পতনের পরিপ্রেক্ষিতে মারাত্মক কিছু ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন সামনে চলে এলো। কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগল যে, ইসলামের ওপর আমরা ঈমান এনেছি, তা কি আসলেই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত? নাকি ত্রুটি ইসলামের মধ্যেই? কেননা, আবু বকর η-এর মাধ্যমে খিলাফতের যে সিলসিলা শুরু হয়েছিল, তখন তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। আর মুসলিমরা যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংশয়ে পড়েছিল, তা হলো– ইসলামের এই পতন কোনো আহলে কিতাবদের হাত দিয়ে হয়নি, হয়েছে পৌত্তলিক মোঙ্গলদের মাধ্যমে। ইসলাম যদি এতটাই নিখুঁত হয়, ত্রুটিমুক্ত হয়, তাহলে এসব পৌত্তলিকের অনুসারীরা কীভাবে ইসলাম অনুসারীদের এতটা বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিতে পারে?

সাধারণ মুসলিমদের এসব সংশয়ের উত্তর দিতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর (১২৬৩-১৩২৮) নেতৃত্বে একদল সচ্ছ প্রজ্ঞার অধিকারী আলিম দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা বলেন, ইসলামের কোথাও কোনো ভুল নেই। সমস্যা হলো, মুসলিমরা তাদের প্রত্যাশিত মান এবং নির্ধারিত অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাই মোঙ্গলদের হাতে মুসলিমরা নাস্তানাবুদ হয়েছে। ঠিক ২০০ বছর আগে ইমাম গাযালি রহ. একই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুসলিমরা নানা অজুহাতে নতুন নতুন যে বিষয়গুলো ধর্মীয় ইস্যুতে সংযোজন (বিদআত) করছে, তা প্রকারান্তরে রাসূল γ-এর চিন্তাধারা ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক।

যদিও ইবনে তাইমিয়া একজন সুফি ছিলেন, তারপরও তিনি অনেক সুফিরই ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ ও প্রথার তীব্র সমালোচনা করেন। একইসাথে তিনি সেসব শাসকেরও সমালোচনা করেছেন, যারা ইসলামের নামে ক্ষমতায় এলেও আদতে ইসলামি অনুশাসন সঠিকভাবে অনুসরণ করেনি। ফলে ইবনে তাইমিয়ার সাথে মোঙ্গল ও মামলুক উভয় শ্রেণিরই তিক্ত সম্পর্ক তৈরি হয়। তাকে বেশ কয়েকবার কারাবন্দি করা হয় এবং এভাবেই দামেস্কে এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি থাকা অবস্থাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তার চিন্তা ঠিকই রয়ে যায়। শুধু সে সময়ের জন্যই নয়; বরং বর্তমানের অনেক মুসলিমও ইবনে তাইমিয়ার এই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয় যে, মুসলিমরা যদি ইসলামের প্রকৃত আদর্শ ও চেতনাকে সত্যিকারভাবে ধারণ করতে পারে, তাহলে একদিন তারা আবারও এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হতে পারবে।

অবশেষে ইসলামি সভ্যতার সেই কাঙ্ক্ষিত উত্থানটি হলো। এর আগে অক্সাস নদীর তীর থেকে ইসলামের উত্থান হলেও এবার ইসলাম জেগে উঠল মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমানা থেকে, যেখানে তুর্কি মুসলিম সেনারা দীর্ঘদিন থেকেই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নিতে বাইজেন্টাইনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

অষ্টম অধ্যায়

আন্দালুস

ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাস নিয়ে যখনই কথা বলা হয়, তখন মূলত মনোযোগ দেওয়া হয় মুসলিম বিশ্বের মূল এলাকার দিকে। যা নীলনদ থেকে শুরু করে অক্সাস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যার মধ্যে ছিল মিশর, সিরিয়া, আরব উপদ্বীপ, ইরাক ও পারস্য। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসকে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে এর বাইরের গণ্ডির আলোকেও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কেননা, এক সময়ে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ থেকে আজকের স্পেন হয়ে পর্তুগাল পর্যন্ত ইসলাম প্রবেশ করেছিল এবং খ্রিষ্টান ইউরোপের সাথে তাদের একটি ভিন্ন ধারার সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। এ কারণে ইউরোপে তৈরি হয়েছিল একটি জটিল ও বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতিও, যার একদিকে ছিল মুসলিম আর অন্যদিকে পশ্চিমা ইউরোপীয়রা।

স্পেনে ইসলাম

সপ্তম শতকে উমাইয়ারা উত্তর আফ্রিকা জয় করে নেয়। এরপর মুসলিমরা একটু ধীরে চলো নীতি অনুসরণ করে। কেননা, আটলান্টিক মহাসাগর আর ভূমধ্যসাগর– মুসলিম বাহিনীর জন্য একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাই মুসলিমরা ইতোমধ্যে যেসব এলাকা জয়

করেছিল, সেগুলোর উন্নয়নে মনোযোগী হয়। সেখানকার স্থানীয় মানুষদের ইসলাম গ্রহণে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে। তারপর ৭১০-এর দশকে গিয়ে আবার সামরিক অভিযানের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মুসলিমরা তখন আইবেরিয়া উপদ্বীপ পার হয়ে আরও ভেতরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে।

কেন মুসলিমরা আবারও সামরিক অভিযানে মনোনিবেশ করল তার কারণ নিয়ে বিতর্ক আছে? যারা উভয় দিকের ইতিহাস জানেন, তারা জানেন যে, মুসলিমরা পৃথিবীর সকল স্থানে কুরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়াকে নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা নিয়েই তা করতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে, সেখানকার খ্রিষ্টান অধিবাসীরা মনে করত যে, ভিসিগথদের অন্যায় ও অনৈতিক আচরণের কারণে স্রষ্টা তাদের ওপর নাখোশ হয়ে তাদের জন্য শাস্তি হিসেবে মুসলিমদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু এই ধর্মীয় কারণের বাইরে আরও কিছু কারণ ছিল। যেমন, রডারিক ও ভিসিগথিকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলায় উভয়েরই জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল। ফলে আফ্রিকা হয়ে যখন মুসলিমরা খ্রিষ্টান ভূখণ্ডে প্রবেশ করল এবং গুয়াডালেটের ময়দানে যখন মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা মুখোমুখি হলো, তখন অনেক অভিজাত খ্রিষ্টান নেতা তাদের অধীন সেনাদের মুসলিমদের সাহায্য করার নির্দেশনা দিয়েছিল। ভিসিগথরা এতটা অজনপ্রিয় ছিল যে, গুয়াডালেটের যুদ্ধের পর মুসলিমরা সে এলাকায় প্রবেশ করলে অনেকগুলো শহর কোনো ধরনের প্রতিরোধ করার কোনো চেষ্টা না করে তাদের সমর্থন করেছিল। মুসলিমরা শেষ পর্যন্ত বাধা পেল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা থেকে। তবে তা কোনো ভিসিগথিকদের পক্ষ থেকে নয়; বরং আরেকটি সম্প্রদায় থেকে— যারা আগে থেকেই স্বাধীন হওয়ার জন্য লড়াই করছিল। আর ভিসিগথিকদের হাতে যে শহরগুলো ছিল, সেগুলো খুব সহজেই স্বায়ত্তশাসনের শর্তে মুসলিমদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর মুসলিমরা স্থানীয় জনগণকে ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা, সুবিধা ও সম্মান দিত— যা তারা ভিসিগথিকদের শাসনামলে পায়নি।

ভিসিগথিকদের ভূমি জয় করার পর মুসলিমরা সেখানে বসবাস শুরু করে। তবে এর আগে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এলাকা জয় করার পর খলিফারা যেভাবে সুন্দরভাবে শহরটিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতেন, সেনা সদস্যদের প্রতিরক্ষা ক্যাম্পগুলোর অধীনেই রাখতেন, আন্দালুসে তা হয়নি। এ এলাকায় মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাজটি হয়েছিল অনেকটা এলোমেলোভাবে। মুসলিমরা নিজেদেরকে নির্দিষ্ট কোনো ব্যারাকে বা ক্যান্টনমেন্টের মতো এলাকায় আটকে রাখতে চাইল না; বরং তারা নিজেরাই জমি-জমা কিনে সম্পত্তির মালিক হতে শুরু করল। বার্বার যেসব অভিবাসী মুসলিমরা সে বাহিনীতে ছিল, তারা বসত গড়ল স্পেনের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে। কারণ সে এলাকাটি ছিল তৃণভূমি, যা অনেকটাই উত্তর আফ্রিকার তাদের আদি বসত এলাকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে, সে বাহিনীতে আরব বিভিন্ন উপজাতির যে সদস্যরা এসেছিল তারা অধিকাংশই ইয়েমেন থেকে এসেছিল। আর তারা খুব ভালো কৃষিকাজও জানত। এ কারণে তারা নিজেদের জন্য বেছে নিল উর্বর দক্ষিণাঞ্চল, কর্ডোভা, ভ্যালেন্সিয়া ও জারাগোজার মতো মূল শহরগুলো। আরব ও বার্বারদের অনেকেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হলো। ফলে সেখানে নতুন একটি জাতিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হলো, যাদের রক্তে আরব, বার্বার ও হিসপ্যাসিক সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল।

উমাইয়া শাসন

মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর প্রথম কয়েক যুগে বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে আন্দালুস খুবই কম ঘটনাবহুল এবং স্থিতিশীল এলাকা হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছিল। কিন্তু ৭৫০-এর দশকে যখন উমাইয়াদের উৎখাত করে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন থেকেই সেখানেও সমস্যার সূত্রপাত হয়। সিরিয়ায় বসবাসরত উমাইয়া রাজবংশের অধিকাংশ সদস্যকেই হয় হত্যা করা হয়, নতুবা জেলে বন্দি করা হয়। শুধু আবদুর রহমান নামক ২০ বছর বয়সি এক উমাইয়া রাজপুত্র এই নিপীড়ন থেকে বেঁচে যান। তিনি দামেস্ক থেকে পালিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য ধরে ছুটতে থাকেন। তার প্রত্যাশা ছিল কেউ না কেউ উমাইয়া বংশের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে মর্যাদা দেবে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। তার মা ছিলেন বার্বার গোত্রীয়। তাই তিনি উত্তর আফ্রিকা পৌঁছে সেখানকার বার্বারদের কাছে বেশি সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন। এভাবে আব্বাসীয় চরদের চোখ এড়িয়ে তিনি ৭৫৫ সালে আন্দালুসে পৌঁছতে সক্ষম হন এবং সেখানেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে উমাইয়া সাম্রাজ্যের নামে শাসন শুরু করেন। কর্ডোভাকে তিনি তার শাসন এলাকার রাজধানী ঘোষণা করেন। তার সাম্রাজ্যটি আব্বাসীয় শাসনের কেন্দ্রবিন্দু বাগদাদ থেকে অনেক দূরে পরিচালিত হচ্ছিল। আর সিরিয়া থেকে এসে অনেক অনেক দূরে অভিবাসিত হয়ে তিনি এই সাম্রাজ্যটি চালু করেছিলেন বলে স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে আদ-দাখিল বা ইমিগ্র্যান্ট বা অভিবাসী বলেই অভিহিত করত।

আবদুর রহমান আদ-দাখিলের প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্য তার জীবনাবসানের পর পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বহুমুখী সংস্কৃতির মিলনমেলায় পরিণত হয়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলিমরা এখানে আসতে থাকে। ফলে বিভিন্ন এলাকার সংস্কৃতি এসে এখানে মিশে যায়। অন্যদিকে, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে বিপুল সংখ্যক হিসপ্যানিক জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করে। ৯৫০-এর দশকে এসে গোটা উপদ্বীপের অর্ধেকেরও বেশি জনগোষ্ঠী মুসলিম হয়ে যায়। আর ১২ শতকে এসে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী হিসেবে টিকে থাকে। আরব, বার্বার আর হিসপ্যানিকরা মিলে নতুন একটি মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হয়, যেখানে নানা ধরনের সংস্কৃতি ও মানবীয়

বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে। এটাই পরবর্তী সময়ে আন্দালুসিয়ান সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত হয়। এমনকি আন্দালুসে বসবাসরত খ্রিষ্টানরাও এই আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তারা নিজেরাও আরবি ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য শিখতে শুরু করে। সে কারণে আজও স্প্যানিশ ভাষায় আরবি ভাষার প্রবল প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ইহুদিরাও আন্দালুসিয়ার এই বৈচিত্র্যময় সমাজ থেকে অনেক সুবিধা পায়। মুসলিমরা ইউরোপে পৌঁছানোর আগপর্যন্ত গোটা ইউরোপে ইহুদিরা খুবই অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল। তখনকার ক্ষমতাধর খ্রিষ্টান এবং পৌত্তলিকরা ইহুদিদের বিরাট বড়ো হুমকি হিসেবেই বিবেচনা করত। কিন্তু মুসলিম স্পেনে ইহুদিদের নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং তারা সেখানে সমাজের একটি গ্রহণযোগ্য অংশ হিসেবেই সুযোগ-সুবিধাদি পেতে শুরু করে। মুসলিম স্পেনে এই আনুকূল্যের সুযোগ নিয়েই ইহুদিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হয়। সে আমলেই মাইমোনাইড নামক ইহুদি দার্শনিকের জন্ম হয়, যাকে আজ অবধি ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও প্রভাবশালী দার্শনিক হিসেবে মনে করা হয়।

রাজধানীতে একটি বড়ো মসজিদ করতে হবে– এই মনোভাব থেকেই উমাইয়া শাসনামলে কর্ডোভার বড়ো মসজিদটি প্রায় ২০০ বছর সময় নিয়ে নির্মাণ করা হয়। এতে ৮৫৬টি কলাম বা খুঁটি রয়েছে, যার অনেকগুলোই রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

৯১২ থেকে ৯৬১ সাল পর্যন্ত তৃতীয় আবদুর রহমানের আমলে স্পেনে উমাইয়া শাসনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উত্থান ঘটে। তিনি প্রায় অর্ধশত বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং নিজেকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা দাবি করেছিলেন। যদিও আইবেরিয়ান উপদ্বীপের বাইরে তার আধিপত্য ছিল না। তবে তিনি উমাইয়া শাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ায় তৎকালীন সময়ে উত্তর আফ্রিকায় ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী হওয়া ফাতেমীয়দের জন্য বিরাট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ান। অন্যদিকে, তুর্কি সেনাপতিদের মাত্রাতিরিক্ত উত্থানে আব্বাসীয় খলিফারাও বাগদাদে নিজেদের প্রাসাদে কার্যত বন্দি হয়েই দিন পার করছিলেন। অপরদিকে ফাতেমীয় আর ইসমাইলিয়াদের মাধ্যমে শিয়ারাও সুন্নি মুসলিমদের জন্য একটি রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

আল মামুনের মতোই তৃতীয় আবদুর রহমান চিত্রকলা ও বিজ্ঞানের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এমন বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই অটোম্যান সম্রাট সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিশেন্টের মধ্যে। যাহোক, আবদুর রহমানের সময় শুধু কর্ডোভাতেই ছয়শরও বেশি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে লাইব্রেরি ছিল তাতে বইয়ের সংখ্যা ছিল চার লাখেরও বেশি। নানা ভাষার নানা বই এ পাঠাগারে ছিল। শহরে ছিল অসংখ্য দোকান ও বাণিজ্যকেন্দ্র। সেখানে যেসব পণ্য পাওয়া যেত গোটা ইউরোপেই ছিল তার কদর। কর্ডোভায় উৎপাদিত চামড়া, সিল্ক, কাগজ, উল, ক্রিস্টাল প্রভৃতি গোটা ইউরোপে এবং মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত।

কর্ডোভা ছিল বিশ্বমানের একটি শহর, যা অনুন্নত ও শিক্ষাহীন ইউরোপের সাথে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির মুসলিম বিশ্বের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করত। ইউরোপের মধ্যে যারা উচ্চ শিক্ষিত হতে চাইত, তারা আন্দালুসে গমন করত। কেননা, সেখানেই বড়ো বড়ো পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ সব লাইব্রেরির সুযোগ পাওয়া যেত। এমনকি দশম শতকের বিখ্যাত পোপ দ্বিতীয় সিলভিস্টারও তার যৌবনকালে আন্দালুস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের অনবদ্য সব আবিষ্কার দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যখন ইতালি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেখানকার লাইব্রেরিতে যে বইগুলো ছিল সেসবই ছিল কর্ডোভার এই লাইব্রেরিগুলোর ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ সংস্করণ। মুসলিম স্পেন হলো সে স্থান, যার মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের চিন্তা ও দর্শনগুলো ইউরোপে প্রবেশ করে।

কর্ডোভার বিস্ময়কর সৌন্দর্য কেবল এর জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তৃতীয় আবদুর রহমান এবং তার পূর্বসূরি শাসকরা আন্দালুসে নান্দনিক সৌন্দর্যের সব মসজিদ, প্রাসাদ এবং নানা রকম স্থাপনা নির্মাণেও আগ্রহী ছিলেন। কর্ডোভার গ্র্যান্ড মসজিদটি আজও সে নান্দনিকতার নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবদুর রহমান আদ-দাখিল এই মসজিদটির নির্মাণ শুরু করলেও পরবর্তীকালে ৯ম ও ১০ম শতকের অন্যান্য শাসকদের সময়ে মসজিদটির ব্যাপক সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয় এবং কয়েক হাজার মুসল্লি ধারণ করার মতো আকৃতি দেওয়া হয়। এই মসজিদটির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এর সবুজাভ খুঁটিগুলো, যার ওপরে ছিল লাল ও সাদা পাথরের মিশ্রণে তৈরি তোরণ। ইউরোপে এই ধরনের স্থাপত্যের আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। কর্ডোভার মসজিদকে ইউরোপের দ্বিতীয় যে নান্দনিক স্থাপনার সাথে তুলনা করা যায়, সেটাও মুসলিমদের হাতেই তৈরি। তা হলো কনস্টান্টিনোপল তথা ইস্তাম্বুলে অবস্থিত হাজিয়া সোফিয়া। খ্রিষ্টানদের চার্চগুলো তখন যে ধরনের হতো তার সাথে মুসলিমদের এই মসজিদগুলোর কোনো মিল ছিল না; বরং মসজিদগুলোতে ক্যালিওগ্রাফি ও জ্যামিতিক নানা নকশার প্রতিফলন ঘটত। মসজিদের দেওয়ালে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে ক্যালিওগ্রাফিক ডিজাইনে লেখা হতো। তৎকালীন মুসলিম-অমুসলিম সকলেই গভীরভাবে অনুধাবন করত, কুরআনই মুসলিম শিল্পকর্ম ও সাহিত্যিক উৎকর্ষতার সবচেয়ে বড়ো নিয়ামক। তাই নান্দনিক এই মসজিদগুলোতে কুরআনের আয়াতই শোভা পাওয়া উচিত। মসজিদ ছাড়াও তৎকালীন আরও নানা স্থাপনাতেই এই নান্দনিকতার দেখা পাওয়া যেত।

তৃতীয় আবদুর রহমান কর্ডোভার বাইরে মদিনাতুজ জাহরা নামক অপূর্ব এক শহর প্রতিষ্ঠা করেন, যা সে সময়ের সবচেয়ে সুন্দর শহর হিসেবে স্বীকৃত হয়। প্রতিদিন বিশ্বের দূরবর্তী স্থান থেকেও অগণিত মানুষ এই শহর দেখতে আসত। আন্দালুসে যারাই কোনো কাজে আসত, তারা এই শহরটি ঘুরে দেখার সুযোগ হারাতে চাইত না। আর শুধু এক কর্ডোভাতেই এত সব নান্দনিক স্থাপনা থাকার কারণে ইউরোপের লোকেরা কর্ডোভাকে 'অরনামেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বা পৃথিবীর অলংকার নামে সম্বোধন করত।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, জ্ঞান ও নান্দনিক স্থাপত্যে আন্দালুসের এই উৎকর্ষতা এই শহরের মানুষের জন্য বেদনার কারণও হয়েছিল। তারা এতটাই বিলাসিতা ও আত্মতৃপ্তিতে ডুবেছিল যে, যখন সেখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলো, তখন নাগরিকেরা তাদের আয়েস ছেড়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে যেতে চাচ্ছিল না। কর্ডোভার শাসকরা শত চেষ্টা করেও উত্তর থেকে আসা খ্রিষ্টান সেনাদের মোকাবিলা করার জন্য শহরের নাগরিকদের যুদ্ধের ময়দানে টেনে নিয়ে যেতে পারল না। আন্দালুসের নাগরিকরা নিজেদের প্রমোদ জীবন ছেড়ে মুসলিম স্পেনের রক্ষায় এগিয়ে যেতে মোটেই আগ্রহী ছিল না।

১১ শতকের শুরুতে উমাইয়া ও তাদের সমর্থকদের ক্ষমতা নিয়ে ব্যাপক লড়াই ও সংঘাত শুরু হয়। ফলে বহিঃশত্রুকে মোকাবিলা করার চেয়ে শহরের অভিজাত সম্প্রদায় কর্ডোভাতেই নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘায়েল করতে বেশি উৎসাহী ছিল। এমনকি নিজেদের খায়েশ পূরণের জন্য তারা উত্তরের খ্রিষ্টান এবং আফ্রিকার বার্বারদেরও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টায় রত ছিল। এরই অংশ হিসেবে ১০০৯ সালে দ্বিতীয় সুলাইমান তার প্রতিপক্ষ উমাইয়া নেতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তার বাহিনীতে সিংহভাগ সদস্যই ছিল খ্রিষ্টান ক্যাস্টিলিয়ান গোত্রের এবং বার্বার সম্প্রদায়ের। দ্বিতীয় সুলায়মান নিজেকে খলিফা হিসেবেও দাবি করেন। পরের বছর সুলায়মানের প্রতিপক্ষরা আবার তাকে কাবু করার জন্য কর্ডোভা আক্রমণ করে। আবার তার পরের বছর সুলায়মান নিজের অবস্থানকে সংহত করতে আক্রমণ পরিচালনা করেন। এভাবে বছরের পর বছর নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ চলতে থাকে। ১০ম শতকে যে কর্ডোভা ছিল স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ, তা কয়েক বছরের গৃহযুদ্ধের কারণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১০১০ ও ২০-এর দশকের মধ্যে আন্দালুসের একতা ও সংহতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। এক আন্দালুসকে ভেঙেই অনেকগুলো রাজনৈতিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়, যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্র বা প্রদেশকে তাইফা হিসেবে অভিহিত করা হতো।

বার্বার সংস্কারক ও তাইফার যুগ

একাদশ শতকের অধিকাংশ সময় জুড়েই আন্দালুসে এই তাইফা শাসনামল অব্যাহত থাকে। তাইফা শব্দটি এসেছে কুরআন থেকে, যেখানে মুসলিমদের দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী তাইফার (ধারা, গ্রুপ বা সম্প্রদায়) মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এই যুগটায় সে অর্থে শান্তির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আরব, বার্বার আর আইবেরিয়ান উপদ্বীপের মুসলিমরা উমাইয়া শাসকদের হটিয়ে তদস্থলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে, নিজেদের মধ্যে বিভেদ, সংঘাত আর সংঘর্ষ যেন লেগেই ছিল। উমাইয়া শাসনামলে যে শহরগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডা এবং জারাগোজা– এগুলো সবই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ছোটো ছোটো অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একসময়ের সমৃদ্ধ আন্দালুস অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটি জনপদে পরিণত হয়ে গেল। সেসময়ের বিখ্যাত ফকিহ, ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক ইবনে হাজম তাঁর বিভিন্ন লেখায় সে বিপর্যয়গুলোর বর্ণনা লিখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আন্দালুসে আমির-ওমরারা ক্ষমতার পারস্পরিক যে লড়াইয়ে নেমেছিল, তা গোটা আইবেরিয়ার মুসলিমদের জন্যই নির্মম পরিহাস হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, মুসলিমদের এই অহেতুক প্রতিযোগিতায় যদি কারও ফায়দা হয়েই থাকে, তাহলে তা হয়েছিল উত্তরের খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর। ৮ম শতকের শুরুতেই আইবেরিয়ার বড়ো এলাকাকেই মুসলিমরা জয় করে নিয়েছিল। তবে একেবারে উত্তরাঞ্চলের কিছু এলাকা ছিল মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেখানেই খ্রিষ্টানরা ছোটো ছোটো রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। আর চারপাশে পাহাড় দিয়ে বেষ্টিত হওয়ায় সে রাষ্ট্রগুলো বেশ সুরক্ষিতও ছিল। যত দিন আন্দালুস একত্রিত ছিল, খ্রিষ্টানরা চুপটি মেরেই ছিল। কিন্তু আন্দালুস কয়েকটি ভাগে ভাগ হওয়ার পর থেকে খ্রিষ্টানরা চেষ্টা করল তার সুবিধা নেওয়ার।

বেশ কয়েকজন তাইফা রাজা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের কাবু করার জন্য খ্রিষ্টান সেনাবাহিনীর সাহায্য চেয়ে বসল। এ ধরনের কৌশল গ্রহণ করায় মুসলিম মনীষী ও ধর্মপরায়ণ মানুষেরা বেশ কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু তাইফার রাজাদের কাছে নিজেদের ক্ষমতা আর আধিপত্য বাড়ানোর চেয়ে আর কিছুই তখন বড়ো হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, মুসলিমদের সহায়তা করার বিনিময়ে খ্রিষ্টান নানা সম্প্রদায় বিশেষত ক্যাস্টাইল, লিয়ন ও নাভারেরা ধনে-সম্পদে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। তাদের রাজ্যও ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, টলেডোতে যে মুসলিম তাইফা রাজা ছিলেন তিনি জারাগোজা তাইফাকে শায়েস্তা করার জন্য খ্রিষ্টান নাভারে সম্প্রদায়কে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেছিলেন। আবার জারাগোজার মুসলিম রাজা ঠিক একইভাবে খ্রিষ্টান ক্যাস্টাইল সম্প্রদায়কে অর্থ দিয়েছিলেন টলেডোর সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে আক্রমণ করার জন্য। মুসলিম আন্দালুসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ইতিহাস হলো, মুসলিমরা তার আরেক ভাইকে শায়েস্তা করার জন্য খ্রিষ্টানদের অর্থসাহায্য দিচ্ছিল। পরিণামে গোটা এলাকাতেই মুসলিমরা নিজেদের অধিকৃত ভূমিগুলো হারিয়ে ফেলল আর খ্রিষ্টানরা সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠল।

১০৮৫ সালে মুসলিম টলেডো খ্রিষ্টানদের কাছে পরাজিত হয়, যা একটি ঐতিহাসিক কৌশলগত লোকসান হিসেবে বিবেচিত হয়। আইবেরিয়ার কেন্দ্রস্থলের ঠিক ডানেই টলেডো নামক এলাকাটি খ্রিষ্টানরা নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়ায় এটা স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা চাইলে যেকোনো দিকেই আক্রমণ চালাতে পারে। এমনকি একেবারে দক্ষিণস্থ তাইফাতেও আক্রমণ চালানো তাদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। এ পর্যায়ে এসে মুসলিম তাইফা রাজাদের যেন ঘুম ভাঙল। তারা বুঝতে পারল যে, তারা এককভাবে খ্রিষ্টানদের আর পরাজিত করতে পারবে না, তাই তারা মুসলিম বিশ্বের কাছে সাহায্য কামনা করল। আর সে সাহায্যটি অবশেষে এলো আফ্রিকার একটি ঐতিহ্যিক ইসলামি আন্দোলন থেকে, যার নাম ছিল মুরাবিতুন।

মুরাবিতুন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল মরক্কোর দূরবর্তী মরুভূমি এলাকায়। উত্তর আফ্রিকা আর পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যবর্তী বাণিজ্যিক রুটের কাছেই এ আন্দোলনের বিকাশ হয়। এ এলাকার অধিকাংশ মানুষ বার্বার সম্প্রদায়ের। ৭ম শতকে যখন ইসলাম উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করে, তখন থেকে এ বার্বার সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলামের ছায়াতলে আসতে শুরু করে। একাদশ শতকের মধ্যে প্রায় সকল বার্বারই মুসলিম হয়ে যায়। তবে ইসলাম প্রবেশের আগে বার্বারদের মধ্যে যেসব প্রথা ও অনুশাসন প্রচলিত ছিল, মুসলিম হওয়ার পরও সেগুলোর অনেক কিছুই আগের মতো অব্যাহত থাকে। যদিও আরব উপদ্বীপে ইসলামপূর্ব যুগে গোত্রগুলোর মধ্যে যে বিবাদ ও বিভেদ ছিল, বার্বারদের মধ্যে তা তেমন বেশি ছিল না। যাহোক, একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিন নামক এক ব্যক্তি বার্বারদের ইসলামের মূল শিক্ষার দিকে নিয়ে আসার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করেন। তিনি তার আন্দোলনের নাম দেন 'মুরাবিতুন' অর্থাৎ যারা কোনো কিছুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে। এ আন্দোলনের মূল চেতনা ছিল কুরআনের সে আয়াত, যেখানে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের রুজ্জুকে আঁকড়ে ধরার আদেশ করা হয়েছে। যদিও পশ্চিমা ইতিহাসে বিশেষ করে স্পেন ও ব্রিটিশরা এ আন্দোলনকে 'আল মুরাবিদ' নামে বিকৃত করার চেষ্টা করে। এ আন্দোলনের মূল চেতনা খুব সরল ও স্পষ্ট হওয়ায় তা বেশ কম সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে যায়। ইবনে ইয়াসিন ঘোষণা করেন যে, মুরাবিতুন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ৩টি : এক. সততাকে উৎসাহ দেওয়া, দুই. অন্যায্য ও অনাচারকে প্রত্যাখ্যান করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং তিন. ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কর নিশ্চিহ্ন করা।

চেতনাগত দিক থেকেই জনসমর্থন পাওয়ায় মুরাবিতুন আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। মুরাবিতুনদের সরল জীবনযাপন এবং মৌলিক ধর্মীয় বার্তাগুলো বার্বারদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। তারা এর মধ্যে আবার রাসূল γ-এর রেখে যাওয়া ইসলামের বার্তা ও আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পায়। ৭ম শতকে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেমন আরব আর আফ্রিকার লোকেরা পঙ্গপালের মতো ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই দলে দলে বার্বাররা মুরাবিতুন আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। এই আন্দোলন ১০৮০'র দশকে উত্তর আফ্রিকা থেকে পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সাহারা মরুভূমিতে এর বিকাশ ইঙ্গিত করে যে, মুসলিম স্পেনের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য অনেকটাই আলাদা। যেখানে আন্দালুসের মুসলিমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী আরাম-আয়েশ আর বিলাসিতায় মত্ত ছিল, সেখানে মুরাবিতুনরা একেবারেই মরুভূমির ওপর সরল, সাধাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাদের জীবনে বিলাসিতার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। বার্বার যোদ্ধারা সব সময়ই ছিল খুব আক্রমণাত্মক যোদ্ধা আর আন্দালুসের তাইফা রাজারা বার্বারদের এই যোগ্যতা সম্পর্কে বেশ ভালোই অবগত ছিল।

"যদি মুমিনদের দুই দল (তাইফা) যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসবে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।"

– সুরা আল-হুজুরাত : আয়াত ৯

যখন এভাবে খ্রিষ্টান পরাশক্তিগুলো মুসলিমদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তখন মুসলিম তাইফা রাজারা বাধ্য হয়েই মুরাবিতুনদের কাছে সাহায্য চায়। ষষ্ঠ আলফানসোর নেতৃত্বে ক্যাস্টাইলরা সেভিল শহরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। সেভিলে ছিল মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক কার্যক্রমের অন্যতম একটি কেন্দ্রস্থল। সেভিলের রাজা, আশেপাশের আইবেরিয়ান অঞ্চলের আরও কিছু রাজা এবং মুরাবিতুন মিলে একটি একীভূত মুসলিম বাহিনী গঠন করেন। ইউসুফ বিন তাশফিনের নেতৃত্বে মুরাবিতুনরা ১২ হাজার সেনা নিয়ে জিবরাল্টার প্রণালি অতিক্রম করে। ৩৭৫ বছর আগে ইবনে জিয়াদ এই পথ দিয়ে এসেই আইবেরিয়াকে ইসলামের আওতায় নিয়ে এসেছিলেন। ইউসুফ বিন তাশফিনও একই কৌশলে অগ্রসর হচ্ছিলেন, যদিও তার মধ্যে সাম্রাজ্য জয় করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। তিনি আন্দালুসের মুসলিম রাজাদের অনুরোধে এসেছিলেন এবং তার মনে আন্দালুসকে মুরাবিতুন সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে যাওয়ার কোনো চিন্তাই ছিল না। ইউসুফ বিন তাশফিনের সেনারা সেভিলের মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে বাডাজোসের কাছে ১০৮৬ সালের অক্টোবরে আলফানসোর বাহিনীর বিরুদ্ধে জাল্লাকার যুদ্ধে মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে ক্যাস্টাইল খ্রিষ্টানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আলফানসো মুসলিমদের অধিকৃত ভূমি ছেড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং সে যাত্রায় মুসলিম স্পেন বেঁচেও যায়। কিন্তু ইউসুফ বিন তাশফিনের যেহেতু সাম্রাজ্য বিস্তারের কোনো পরিকল্পনা ছিল না, তাই তিনি

খ্রিষ্টানদের আর তাড়া না করে তার অধিকাংশ সেনা নিয়েই আবার উত্তর আফ্রিকা ফিরে যান। যেখানে আন্দালুসের তাইফাদের মতো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ ছিল না।

যদিও মুরাবিতুনরা আন্দালুসের স্থানীয় বাসিন্দা ছিল না, তা সত্ত্বেও তারা আন্দালুসে আসার পর বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তারা জ্ঞান আহরণের জন্য স্থানীয় মুসলিম মনীষীদের ওপরই বেশি নির্ভর করত এবং তাদেরই সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। পাশাপাশি তারা জনগণের ওপর থেকে করের বোঝাও অনেকটাই হ্রাস করে, যা তাদের জনপ্রিয়তাকে আরও বৃদ্ধি করেছিল।

তবে এত চেষ্টা করেও দ্বন্দ্ব ও ঝামেলা থেকে মুরাবিতুনরা মুক্ত থাকতে পারেনি। ১০৮৮ সালে ইউসুফ বিন তাশফিনকে আবারও আলফানসোর আরেকটি বাহিনী মোকাবিলার জন্য আন্দালুস থেকে আবেদন জানানো হয়। এবারও একতাবদ্ধ মুসলিম বাহিনী গঠনের কথা বলা হয়, ইউসুফ বিন তাশফিন আবারও আন্দালুসে গমন করেন। কিন্তু এ যাত্রায় ইউসুফ বিন তাশফিনের অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না। ক্রমাগতভাবে একেক সময় একেক তাইফার রাজারা তার কাছে গিয়ে অপর কোনো এক তাইফার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে থাকে এবং প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য বিন তাশফিনের সহযোগিতা কামনা করতে থাকে। ফলে এবারে তার অভিযানটি প্রথমবারের মতো সফল হয়নি। ইউসুফ বিন তাশফিন বিরক্ত হয়েই আফ্রিকা ফিরে যান এবং আন্দালুসের সাথে কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক কর্মকাণ্ডে আর সম্পৃক্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু তাইফা রাজাদের দুর্বলতা আর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগে ষষ্ঠ আলফানসো আবারও সামরিক প্রস্তুতি শুরু করলে ফের বিন তাশফিনের সাহায্য চাওয়া হয়। ইউসুফ বিন তাশফিন অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৃতীয়বারের মতো আন্দালুসে আসেন। তবে এবার তিনি ইমাম গাযালির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দালুসের জন্য একটি ফতোয়া জারি করেন। তিনি ঘোষণা করেন, তাইফা রাজারা সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তারা শাসনকার্য পরিচালনায় অযোগ্য এবং তাদের অপসারণ এখন সময়ের দাবি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১০৯০ সালে মুরাবিতুনরা আন্দালুসে অভিযান শুরু করে। এবার ইবনে তাশফিন নিজেই তাইফা যুগের অবসানে মাঠে নামেন। তাইফা রাজারা মোটেই বার্বার জাতিগোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা ছাড়তে রাজি ছিল না। বরং তারা মুরাবিতুনকে মোকাবিলা করার জন্য আশপাশের খ্রিষ্টান বাহিনীগুলোর কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করে বসে। আর খ্রিষ্টানদের শরণাপন্ন হওয়ায় তাইফা রাজাদের ব্যাপারে আন্দালুসের আলিম সমাজ আর সাধারণ জনগণের যে সংশয় ছিল তা আরও পাকাপোক্ত হয়। তারা বুঝে যায় যে তাইফা রাজারা শুধু নিজেদের ক্ষমতা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, মুসলিম নাগরিক ও ভূখণ্ড রক্ষা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। ফলে আন্দালুসিয়ার স্কলাররা মুরাবিতুনদের পক্ষে নতুন এক আন্দোলন গড়ে তোলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনা। ফলে মোটামুটি রক্তপাতহীনভাবেই ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। তাইফা রাজাদের যেহেতু উৎখাত করা হয়, তারাও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে নির্বাসনে চলে যায়। ফলে তারা আর আন্দালুসকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগও তেমন একটা পাচ্ছিল না।

পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে সমস্ত তাইফা রাজারাই মুরাবিতুনদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। শুধু জারাগোজার রাজা তা করেনি। তিনি বার্বার মুরাবিতুনদের আধিপত্য স্বীকার করে তাদের সাথে এক ধরনের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইউসুফ বিন তাশফিন এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা আন্দালুস থেকে ঘানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যার আয়তন ছিল ৩ হাজার কিলোমিটার। ইবনে তাশফিনের সাম্রাজ্যে দায়িত্বপ্রাপ্তরা একাদশ শতকের সবচেয়ে যোগ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়।

আন্দালুসিয়ানরা যেভাবে মুরাবিতুনকে গ্রহণ করেছিল তা ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। কিছু যাযাবর বার্বার তাদের রক্ষণশীল চিন্তা দিয়ে ৪শ বছরের প্রতিষ্ঠিত একটি সভ্যতাকে খুব সহজেই জয় করে নিজেদের দখলে নিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এখানে ইসলামের একটি চিরায়ত বাস্তবতাকেই যেন আমরা নতুন করে দেখি। যখনই কোনো মুসলিম সাম্রাজ্য রাজনৈতিকভাবে ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং সেখানে বহিঃশত্রুর আগ্রাসন ঘটে তখন একজন নেতার একক নেতৃত্বই মুসলিমদের বড়ো কোনো সংকটের হাত থেকে হেফাজত করে। এই ধরনের বাস্তবতার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির সময়ে। তখন তার একক নেতৃত্বে সিরিয়া আর মিশরকে একই সাম্রাজ্যের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয় এবং এর ফলে হানাদার ক্রুসেডাররা পরাজিত হয়।

রাজনীতি ছাড়া অন্য বিষয়গুলোর কথা যদি বলি, আন্দালুসিয়ানরা স্প্যানিশ খ্রিষ্টানদের তুলনায় বার্বার সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নিজেদের বেশি সম্পৃক্ত করতে পেরেছিল। পাশাপাশি ইসলামের মূল শিকড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার যে দাওয়াত, অযৌক্তিক আইন বাতিল এবং করের বোঝা কমানোর জন্য মুরাবিতুনদের আন্তরিক প্রচেষ্টা আন্দালুসের মানুষদের বেশি আকৃষ্ট করেছিল।

আন্দালুসিয়ানদের কাছ থেকে যতই সাহায্য বা সমর্থন পাক না কেন মুরাবিতুনরাও উত্থান-পতনের মানব ইতিহাসের অনিবার্য বাস্তবতা অতিক্রম করতে পারেনি। ইউসুফ বিন তাশফিনের সময়ে তারা আইবেরিয়ার মুসলিম ভূমির অনেকাংশই আয়ত্তে নিতে পেরেছিল। কিন্তু এর বেশ আগেই তাইফা যুগে মুসলিম রাজ্য টলেডো খ্রিষ্টানদের কাছে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, সেটাকে কোনোভাবেই মুরাবিতুনরা আর পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। অন্যদিকে, খ্রিষ্টান রাজ্যগুলো মুরাবিতুনদের উত্থানে একটু থেমে গিয়েছিল, যদিও তারা মোটেও নিশ্চিহ্ন হয়নি।

ইউসুফ বিন তাশফিনের পর মুরাবিতুনদের দায়িত্বে আসে তারই সন্তান আলী (১১০৬-১১৪৩), যিনি তার পিতার মতো ততটা যোগ্য ছিলেন না। যদিও তিনি নিষ্ঠার দিক থেকে ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় তার পিতা ইবনে তাশফিনের মতো পারদর্শী ছিলেন না। একাদশ শতকের শেষে যখন মুরাবিতুনরা প্রথম আন্দালুসে প্রবেশ করে, তখন তাদের জনপ্রিয়তা পাওয়ার একটা বড়ো কারণ ছিল– জনগণ মনে করেছিল যে, মুরাবিতুনরা খ্রিষ্টানদের সমূলে উচ্ছেদ করতে পারবে। কিন্তু ১২ শতকে গিয়ে যখন মুরাবিতুনরা তা করতে পারল না, অধিকন্তু খ্রিষ্টানরাও ভেতরে ভেতরে আবারও শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করল, তখন মুরাবিতুনরা আন্দালুসে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ল। পুরোনো উমাইয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী কর্ডোভাতে মুরাবিতুনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলো। কেননা, সেখানকার স্থানীয়রা বিদেশি মুরাবিতুন শাসকদের ব্যাপারে ক্রমশ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল।

মুরাবিতুনদের পতন প্রকৃতপক্ষে শুরু হলো উত্তর আফ্রিকা থেকে, যেখান থেকেই তাদের উত্থানের সূচনা হয়েছিল। আটলাস পর্বতমালার ওপারে আরেকটি বার্বার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। যা ক্রমান্বয়ে মুরাবিতুনদের রাজধানী মারাকেশের ওপর ছায়া ফেলতে শুরু করল। এই আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের মুয়াহিদুন বা তাওহিদপন্থি হিসেবে দাবি করত। নয়া এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন ইবনে তুমার্ত। তিনি ঘোষণা করলেন, মুরাবিতুনরা ইসলামের সঠিক অনুশীলন থেকে দূরে সরে গেছে এবং আন্দালুসিয়ানদের বিলাসিতার লোভ তাদের পেয়ে বসেছে। ফলে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মুয়াহিদুনরা ধর্মীয় দিক থেকেও খুব রক্ষণশীল চিন্তাধারা লালন করত। তাদের বক্তব্য ছিল, উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসে ইসলামের নামে অনেক কিছু নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে, যা ইসলামের মূল চেতনা বিরোধী। ১১২০-৩০ সালের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক মুরাবিতুন কর্মী এই মুয়াহিদুন আন্দোলনে যোগ দেয়। ১১৪৭ সালে এ মুয়াহিদুনরা এতটা শক্তি অর্জন করে যে, তারা প্রকাশ্যে মুরাবিতুনদের চ্যালেঞ্জ করে। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে তারা মারাকেশ শহর আক্রমণ করে। পরবর্তী এক বছরের মাথায় গোটা মরক্কো মুয়াহিদুনদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

মুরাবিতুনরা নিজেদের অতীতের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা নিয়ে মুয়াহিদুনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যাওয়ায় আন্দালুসকে সামরিকভাবে আর ততটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। আর সেটা আন্দালুসিয়ানদের ভেতরে অসন্তোষের জন্ম দেয়। ফলে ১১৪৪ সালে সেখানে আবারও তাইফা যুগের সূচনা হয়। এভাবে পুনরায় আইবেরিয়ান উপদ্বীপে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। তারা আবার মুসলিম রাষ্ট্রকে বিকিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে হলেও নিজেদের আধিপত্য সংহত করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর এ পরিস্থিতির সকল সুবিধা যায় খ্রিষ্টানদের পকেটে। তারা মুসলিমদের ঘায়েল করে ধীরে ধীরে নিজেদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করতে থাকে। আন্দালুসের জনগণ মুরাবিতুনদের আর চাচ্ছিল না, যদিও তাদের সামনে তেমন কোনো বিকল্প শক্তিও ছিল না। এবারও প্রথম তাইফা যুগের মতো তারা নিজেরা যুদ্ধে অংশ নিতে রাজি হলো না। তাই তাইফা রাজাদের সেই আগের বারের মতো খ্রিষ্টানদের কাছেই সামরিক সাহায্য প্রত্যাশা করতে হলো। এবার খ্রিষ্টানরা সেটা দিলো, তবে বেশ চড়া মূল্যের বিনিময়ে।

তারিক বিন জিয়াদ, ইউসুফ বিন তাশফিনদের পরবর্তী যুগে জন্ম নেওয়া মুয়াহিদুনদের তখন নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ইবনে তুমার্তের উত্তরসুরি আবদুল মুমিন। তিনি ১১৪৫ সালে আন্দালুসে প্রবেশ করেন। খ্রিষ্টান ও পর্তুগিজদের আগ্রাসনের পরিপ্রক্ষিতে তিনি আন্দালুসকে নিজের অধীনে নিতে চাইছিলেন। এক বছরের মধ্যেই মুয়াহিদুনরা মালাগা ও সেভিল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ১১৫০ সালে কর্ডোভা আর জায়িনও তাইফাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ১১৬৩ সালে যখন আবদুল মুমিন মারা যান, তখন স্পেনের যতটুকু অংশ ইসলামের ছায়াতলে ছিল, তার পুরোটাই ছিল মুয়াহিদুনদের কবজায়।

তখন স্পেনের মুসলিমদের অবস্থান ছিল উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে। অন্যদিকে, আইবেরিয়ান এ উপদ্বীপের মধ্য অঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলটি ছিল খ্রিষ্টান রাজাদের নিয়ন্ত্রণে। বিশেষত ক্যাস্টাইল, পর্তুগিজ ও আর্গাওনরা তখন এই অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণ করত। উমাইয়া শাসনামলে স্পেনের মুসলিমরা যে বিশাল কৃতিত্ব অর্জন করে, বড়ো বড়ো স্থাপনা নির্মাণ করে, সেগুলো তখন ছিল কেবলই স্মৃতি। আন্দালুসিয়ার মানুষ বুঝে ফেলেছিল, আইবেরিয়ান উপদ্বীপটির নিয়ন্ত্রণ কার্যত খ্রিষ্টানদের কাছেই চলে গেছে আর খ্রিষ্টানরা কখনোই জ্ঞানের প্রসার করতে বা সাম্রাজ্যকে এগিয়ে নিতে কার্যকর উদ্যোগ নেবে না। তারপরও তাদের খ্রিষ্টানদের দয়ার ওপরই বাঁচতে হবে।

মুয়াহিদুনদের উত্থান স্পেনে ইসলামের পুনর্জাগরণের পথ প্রশস্ত করে। তাদের দেখে আন্দালুসিয়ার মানুষরা আবার ইসলামি অনুশাসন অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়। সে সময় বেশ কিছু মুসলিম স্কলারও সামনে এগিয়ে আসেন। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮), যিনি পশ্চিমা বিশ্বে অ্যাভেরস নামে অভিহিত। সোনালি যুগের মুসলিম মনীষীদের ছায়ায় থাকা এই মানুষটি দর্শন থেকে শুরু করে পদার্থবিদ্যা এমনকি মনোবিজ্ঞান বিষয়েও অনেকগুলো মৌলিক রচনা করেন। সবচেয়ে স্থায়ী কাজটি তিনি করেছিলেন ফিকহের ওপর। তিনি মালিকি মাযহাবের অনুসারী হয়েও সকল মাযহাবের মধ্যেই তুলনামূলক আলোচনা করে একটি বই লিখেছিলেন, যার নাম *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ (The Distingguished Jurist's Primer)*। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে এই বইটি ফিকহ শাস্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক বই হিসেবে গণ্য হয়, যেখানে ইসলামের বিভিন্ন মাযহাবের মতপার্থক্যগুলোকে সুন্দর করে পর্যালোচনা করা হয়। ইবনে আরাবি এবং আবুল হাসান আশ-শাদিলির মতো সুফি-সাধকরাও এ সময়েই আবির্ভূত হন। তারা মুসলিমদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে তাগিদ দেন।

অনেকেই ধারণা করেন, আন্দালুসে এবং উত্তর আফ্রিকায় মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন দেখে তার বিকল্প হিসেবেই তারা মুসলিমদের আধ্যাত্মিকতার দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করেন।

মুয়াহিদুনরা মৌলিকভাবে মুরাবিতুনদের নীতিমালাকেই অনুসরণ করত। এরা দুই পক্ষই উত্তপ্ত মরুভূমির সন্তান। তারা উভয়ই তাদের অঞ্চলের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং সামাজিক অনাচারগুলোকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে আন্দোলনের সূচনা করে অগ্রসর হয়েছিল। দুই ধারাই আইবেরিয়া অঞ্চলে খ্রিষ্টানদের উত্থানকে বার বার সফলভাবে থামাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই দুটি মতাদর্শই সময়ের বিবর্তনে শেষ পর্যন্ত সফলতা ধরে রাখতে পারেনি। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মের সে চেতনা ও কর্মশক্তিকে যথার্থভাবে ধারণ করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে মুয়াহিদুনরা আন্দালুসে আর সফলতা পায়নি। কেননা, তাদের পারিবারিক বিরোধ ও গোত্রগত সংঘাত সকলের সামনে চলে আসে। দ্বাদশ শতকের পরবতী পর্যায়ে আন্দালুসে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়, যা খ্রিষ্টানদের আগ্রাসনের মুখে আরও প্রকটভাবে বেড়ে যায়। আর এবার বার্বারদের ভেতর থেকে কোনো ধর্মীয় আন্দোলনেরও সূচনা হয়নি, যা এর আগে দুই দুই বার আন্দালুসকে রক্ষা করেছিল।

গ্রানাডা

প্রায় এক শতাব্দী খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের বিভাজন ও আনুষাঙ্গিক দুর্বলতার ফায়দা হাসিল করে। এ পর্যায়ে তৎকালীন পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট নতুন করে একটি প্যান-ইউরোপীয়ান ক্রুসেডের ডাক দেন। ১২১২ সালে স্পেনিশ, পর্তুগিজ এবং ফরাসি খ্রিষ্টানরা এক হয়ে সিয়েরা মরেনা পর্বতমালার পাদদেশে সমবেত হয়। এ পর্বতমালাই ছিল আইবেরিয়া উপদ্বীপের খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের সীমান্তরেখা। ক্যাস্টাইল নেতা তৃতীয় আলফানসোর নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা মুয়াহিদুনদের মূল ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। পশ্চিমারা এই যুদ্ধকে বলে লাস নাভাস ডে টোলোসা, আর মুসলমানেরা বলে উকাব। এই যুদ্ধে মুসলিমরা শোচনীয়ভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। প্রায় ১ লাখ মুসলিম সেনা যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করে এবং আন্দালুসে মুয়াহিদুনদের ক্ষমতার মূল ভিত্তিই ধ্বসে যায়।

এই যুদ্ধে কেন মুসলিমরা হারলো সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো যুদ্ধের কঠিন পরিণতি। এই যুদ্ধের পরই মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণাধীন একেকটি শহর যেন খ্রিষ্টানদের পায়ে লুটিয়ে পড়তে থাকে। ১২২৮ থেকে ১২৪৮ সালের মধ্যে ভ্যালেন্সিয়া, সেভিল, বাডাজোস, মাজরোকা, মুর্সিয়া, জায়িন এবং অন্য আরও কয়েকটি শহর খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১২৩৬ সালে মুসলিম কর্ডোভারও পতন হয়। সেই শহরের বিশাল মসজিদ, অসংখ্য লাইব্রেরি, প্রাসাদ ও উদ্যান– কোনো কিছুই আগ্রাসী খ্রিষ্টানদের থামাতে পারেনি। খ্রিষ্টানরা শহরটি দখল করে নেওয়ার পরই কর্ডোভার বিশাল সেই মসজিদকে ক্যাথলিক ক্যাথেড্রালে পরিণত করা হয়। সে ক্যাথেড্রাল তথা সাবেক সে মসজিদের মাঝে বিরাট এক ঘণ্টা বসানো হয়। যে মসজিদটি মক্কার দিকে মুখ করে বানানো হয়েছিল, সেটা তা-ই থাকে, কিন্তু তাতে সব খ্রিষ্টান স্থাপনা বসানো হয়। মসজিদটির দেওয়াল আজও যেন মুসলিম ইবাদতকারীদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করে। কেননা, ক্যাথেড্রাল বানানোর পরও এখনও যদি কেউ তাতে প্রবেশ করে তাহলে এটাকে মসজিদই মনে হবে। স্থাপত্যের প্রতিটি পরতে পরতে আজও ইসলামের নিদর্শনই যেন বিরাজমান। পরবর্তীকালে ১৬ শতকে এসে রোমান সম্রাট একে ক্যাথেড্রাল হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। তবে স্থাপনাটি অবিশ্বাস্য সুন্দর হওয়ায় এর একটি অংশ সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

তবে মুয়াহিদুনদের পতনকেই আন্দালুসের সামগ্রিক পতন হিসেবে দেখা যাবে না। গ্রানাডার তৎকালীন মুসলিম আমির তখনও খ্রিষ্টানদের কবজায় যাননি। গ্রানাডায় আরব থেকে আসা নাসরিরা প্রায় দুই শতক ধরে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখে। এই নাসরিরা নিজেদের বনু খাযরাজ গোত্রের বংশধর বলে দাবি করত। বনু খাযরাজ হলো প্রথম দুটি গোত্রের মধ্যে একটি, যারা হিজরতের পর নবিজি ﷺ-কে মদিনায় স্বাগত জানিয়েছিল। আইবেরিয়ার নানা অঞ্চল থেকে যে মুসলিমরা তখন গ্রানাডা আসছিল, নাসরিরা সকলকেই স্বাগত জানাচ্ছিল। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিজরতের মতোই এই হিজরতও মুসলিমদের নতুন করে উজ্জীবিত করেছিল। যদিও এটা সত্য যে, গ্রানাডায় আশ্রয় নেওয়ার এই ঘটনাটি আইবেরিয়া উপদ্বীপে মুসলিমদের ক্ষমতা হারানোর ইঙ্গিতই বহন করে। গ্রানাডা ছিল আন্দালুসের মুসলিমদের সর্বশেষ অস্তিত্বের ঠিকানা।

কিন্তু গ্রানাডার নাসরিরা কখনও সে অর্থে পুরোপুরি স্বাধীন ছিল না। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, আন্দালুসের অন্য অনেক তাইফা খ্রিষ্টানদের কাছে স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেও নাসরিরা ক্যাস্টাইল খ্রিষ্টানদের হাতে একেবারে জিম্মি হয়ে পড়েনি। মুয়াহিদুনদের পতনের পর আবারও তাইফাদের মধ্যে বিভেদ ও সহিংসতার সেই পুরোনো রাজনীতি ফিরে আসে। মুসলিমরা বিভক্ত হয়ে পড়ায় ক্যাস্টাইলরা তাদের নিয়ে তেমন একটা দুশ্চিন্তার মধ্যেও ছিল না। তাদের একমাত্র ভাবনা ছিল গ্রানাডা নিয়ে। গ্রানাডার শাসকরাও খ্রিষ্টানদের সাথে আপস করেই টিকেছিল। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল– ক্যাস্টাইলদের প্রয়োজনে তারা সামরিক সহযোগিতাও প্রদান করবে। পাশাপাশি পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে থাকা অসংখ্য স্বর্ণখনি থেকে আহরিত স্বর্ণও তারা নিয়মিত ক্যাস্টাইলদের প্রদান করত। ফলে আন্দালুসে ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলিমদের শক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছিল আর খ্রিষ্টানরা ক্রমশই পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিল। এটাও ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি

নাসারিরা আন্দালুসের বেশ কয়েকটি শহর দখলে খ্রিষ্টানদের সাহায্যও করেছিল। অন্যদিকে, গ্রানাডার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত বহিরাগতরা, বিশেষ করে ইতালি থেকে আসা বণিকরা। এদিকে মুসলিম জগতের সাথে গ্রানাডার বাণিজ্য অনেকটা বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। গ্রানাডার সম্পদ থেকে শুধু যে ইউরোপীয়ান খ্রিষ্টানরা একাই ফায়দা তুলে নিচ্ছিল তা-ও নয়, আরও বিভিন্ন শক্তি এতে শামিল ছিল।

আইবেরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে আর আন্দালুসে যখন ইসলাম প্রায় নিঃশেষ হওয়ার মুখে, তখনও মুসলিমরা তাদের স্থাপত্য নিদর্শনের আরেকটি নমুনা রেখে যায়, যা ছিল মুসলিম স্পেনে তাদের সর্বশেষ স্মৃতিচিহ্ন। এর নাম হলো আল-হামরা। শহরের একটু উঁচু স্থানে আল-হামরা নির্মাণ করা হয়েছিল, যা নাসরি যুগের বহু আগে থেকেই শহরের দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আন্দালুসের বিভিন্ন স্থান থেকে যখন মুসলিমরা গ্রানাডায় আগমন করতে থাকে, তখন গ্রানাডার আমির এই দুর্গটিকে সুশোভিত করেন। দুর্গটিকেই তিনি প্রাসাদে রূপান্তরিত করেন। আল-হামরার এই সংস্কার কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে ছিল ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্য। উমাইয়াদের শৈলী, মুরাবিতুন ও মুয়াহ্হিদুনদের জ্যামিতিক শ্রেষ্ঠত্ব, গ্রানাডার অভিনবত্ব এবং খ্রিষ্টানদের স্থাপত্য জ্ঞান সবকিছুকেই আল-হামরা নির্মাণে কাজে লাগানো হয়। এর ভেতরে অনেক বাগান ও ঝরণাধারা নির্মাণ করা হয়, যা সকলকে আবার যেন কর্ডোভা আর সেভিলের সোনালি মুসলিম অতীতকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আল-হামরা শুধু যে ইসলামের আগের যুগের স্থাপত্যের মতো করে নির্মাণ করা হয়েছিল তা নয়; বরং আল-হামরার স্থাপত্যকৌশলটি পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্ব ও ইউরোপেও ব্যবহার করা হয়েছিল। ক্যাস্টিলিয়ানরা পরবর্তী সময়ে সেভিলে যে আল-কাজার বানিয়েছিল, তার পুরোটাই ছিল মুসলিমদের আল-হামরার অনুকরণ। উত্তর আফ্রিকায় যে স্কুল ও মসজিদগুলো নির্মিত হয়েছিল, সেগুলোও আল-হামরার নকশা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আল-হামরার সবচেয়ে বড়ো নির্মাণবৈশিষ্ট্য ছিল এর মূল বার্তা, যেটা আল-হামরার চূড়ায় লেখা হয়েছিল। কথাটি ছিল, *লা গালিব ইল্লাল্লাহ* অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো বিজয়ী নেই। এটা ছিল মুসলিম আন্দালুসের সকল কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত চেতনা। এমনকি পরবর্তী সময়ে শত্রুরা যখন গ্রানাডা ঘেরাও করে ফেলে, তখনও মুসলিমদের মনে এই বিশ্বাসটাই লুক্কায়িত ছিল যে, ইসলাম রাজনৈতিকভাবে আন্দালুসে অনেকভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেও আল্লাহ তায়ালা কখনও মুসলিমদের চূড়ান্ত পতনের মুখে ফেলবেন না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো, ১৪৯২ সালে যখন খ্রিষ্টানরা গ্রানাডা দখল করে নেয়, তখনও এর চূড়ায় সে কথাটি ঠিকই লেখা ছিল। কিন্তু মুসলিমদের যে সাহসী ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা থাকার কথা ছিল, সেটা ছিল না।

আন্দালুসের চারপাশের পতনের মধ্যে গ্রানাডা একমাত্র মুসলিম নিয়ন্ত্রণাধীন হিসেবে টিকে ছিল। তবে গ্রানাডার চারপাশের রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত খারাপ হচ্ছিল, যা গ্রানাডাকে চূড়ান্ত পতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। নাসরিদের জন্য ক্যাস্টাইলদের হুমকি ছিল একটা সংকট। প্রতি বছর ক্যাস্টাইলদের খাজনা দিতে গিয়ে খ্রিষ্টানরা শক্তিশালী হলেও গ্রানাডা ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে পড়ছিল। অন্যদিকে, উত্তর আফ্রিকায় তখন মারিনি নামক আরেকটি বার্বার গোত্রের উত্থান হয়। তারাও গ্রানাডার জন্য সংকট হিসেবে দেখা দেয়।

চারপাশের এত প্রতিকূলতার মধ্যে গ্রানাডা কিছু কাল স্থিতিশীল থাকতে পেরেছিল। কেননা, ভৌগোলিকভাবে গ্রানাডার চারপাশে ছিল পর্বতমালা আর অসংখ্য দুর্গ। এ কারণে আন্দালুসের অন্য সব শহরের পতনের পরও গ্রানাডা টিকে ছিল। তবে মুসলিম স্পেনের সর্বশেষ এই বাতিঘরের পতনটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণে হয়নি; বরং হয়েছিল নিজেদের মধ্যকার বিভাজনের কারণে। ১৪৮০ সালের দিকে গ্রানাডায় ব্যাপক প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। আমির আবুল হাসানকে তারই সন্তান ৭ম মুহাম্মাদ ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেন এবং ১৪৮২ সালে নিজেই ক্ষমতায় আসীন হন।

৭ম মুহাম্মাদ যখন তার পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, তখন ক্যাস্টাইলরা আর সুযোগ নিতে দেরি করেনি। মুসলিমদের বিভাজনের সুযোগ নিয়ে তারা বেশ কয়েকটা দুর্গ দখল করে নেয়, যা গ্রানাডার নিরাপত্তাকবচ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ১৪৫৩ সালে অটোম্যানরা কনস্টান্টিনোপল জয় করার জন্য যে কামান ব্যবহার করেছিল এবং যার মাধ্যমে তারা পূর্ব ইউরোপে ইসলামের অভিযাত্রা শুরু করেছিল, সেই কামান ব্যবহার করেই খ্রিষ্টানরা পশ্চিম ইউরোপ থেকে ইসলামকে বিলুপ্ত করার উদ্যোগ নেয়। এর আগে যতবার খ্রিষ্টানরা আন্দালুসের মুসলিমদের আক্রমণ করেছে ততবারই উত্তর আফ্রিকা থেকে বার্বাররা এসে তাদের দ্বীনি ভাইদের রক্ষা করেছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে যখন আন্দালুসের মুসলিমরা বিপদে পড়ে গেল, তখন আর তাদের উদ্ধার করার মতো কেউ ছিল না। উত্তর আফ্রিকায় তখন গৃহযুদ্ধ চলছিল। তাই সেখানকার শাসকরা নিজেদের সমস্যা নিয়েই ছিলেন ব্যস্ত। গ্রানাডা মিশরের মামলুকদের কাছেও সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু তারা তেমন কোনো সাহায্য করতে পারেনি। খ্রিষ্টানদের মোকাবিলার জন্য গ্রানাডার অন্তর্কলহের অবসান জরুরি ছিল, যদিও বাস্তবে তা ছিল রীতিমতো অসম্ভব।

৭ম মুহাম্মাদের নেতৃত্ব গ্রানাডার জন্য দুঃখ বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। খ্রিষ্টানরা ১৪৮৬ সালে ৭ম মুহাম্মাদকে গ্রেফতার করে। সে সুযোগে তার বাবা পুনরায় সিংহাসনটি পুনরুদ্ধার করেন। এক বছর পর খ্রিষ্টানদের আনুগত্য করার শর্তে ৭ম মুহাম্মাদকে মুক্তি দেওয়া হয়। খ্রিষ্টানদের সামরিক সহযোগিতা নিয়ে তিনি আবার গ্রানাডায় নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে গ্রানাডায় আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয় আর এ যাত্রায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তারই চাচা। অন্যদিকে, ক্যাস্টাইলরা মুহাম্মাদের চাচার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। এই যুদ্ধে ৭ম মুহাম্মাদ কারও পক্ষেই কাজ করেননি। আর তার নিষ্ক্রিয়তার সুযোগেই খ্রিষ্টানরা গ্রানাডার বৃহৎ অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। সে মুহূর্তে অবশ্য খ্রিষ্টানদের আর মুহাম্মাদের সাহায্যের তেমন একটা দরকারও ছিল না। বিখ্যাত ক্যাথলিক শাসক ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা উদ্যোগ নিয়ে

খ্রিষ্টানদের দুই গ্রুপ অর্থাৎ ক্যাস্টাইল ও অ্যারাগনদের একত্রিত করে, যাতে উত্তর স্পেনে তারা নির্বিঘ্নে অভিযান চালাতে পারে। যেহেতু স্পেনের বড়ো অংশই তত দিনে খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণে তাই তারা গ্রানাডাকে আর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে দেখতে চাচ্ছিল না। যদিও ৭ম মুহাম্মাদ তার পূর্বসূরিদের মতোই খ্রিষ্টানদের অব্যাহতভাবে কর দিয়ে যেতে চাইছিলেন, তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টানরা আর গ্রানাডার পৃথক মুসলিম অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারছিল না।

১৪৯০-৯১ সালে গ্রানাডা চূড়ান্ত পতনের জন্য অপেক্ষমাণ, নাগরিকরা শহরের ভেতরে অনেকটাই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছিল। বাইরের জগতের সাথে তাদের যোগাযোগ এবং জীবনধারণের উপকরণগুলোর সরবরাহ অনেকটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শহরে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল প্রচুর। আর স্থানীয়রা ডুবে গিয়েছিল হতাশায়। যেহেতু তারা উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাচ্ছিল না, তাই গ্রানাডার একার পক্ষে সংখ্যায়, সামরিক প্রযুক্তিতে উৎকর্ষতায় থাকা স্প্যানিশদের মোকাবিলা করা কঠিন ছিল। আর ৭ম মুহাম্মাদ সেটা খুব ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৯১ সালের ২৫ নভেম্বর তিনি ক্যাথলিকদের সাথে আপস করার জন্য তার মন্ত্রীকে প্রেরণ করলেন। ১৪৯২ সালের জানুয়ারির ১ তারিখে গ্রানাডাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্প্যানিশদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেদিন খুব ভোরে শহরের সব বড়ো বড়ো স্থাপনা ও আল-হামরার নিয়ন্ত্রণও মুহাম্মাদ স্প্যানিশদের কাছে হস্তান্তর করেন। তাই শহরের নাগরিকরা যখন সকালে ঘুম থেকে উঠল তারা শেষ বারের মতো 'লা গালিব ইল্লাল্লাহ' লেখা পতাকাটিকে উড়তে দেখল। কিছু সময় পরই সেই পতাকা নামিয়ে সেখানে ক্যাস্টিলিয়ান খ্রিষ্টানদের পতাকা ওড়ানো হয়। এর মাধ্যমে অর্থে, বিত্তে, জ্ঞানে আর স্থাপত্যে শ্রেষ্ঠতম একটি মুসলিম সভ্যতার চূড়ান্ত পতন ঘটল।

গ্রানাডার সর্বশেষ আমির ৭ম মুহাম্মাদ– যার অক্ষমতা আর নাফরমানির কারণেই শহরটি হাতছাড়া হয়, তিনিও কিন্তু শহরে থাকতে পারেননি। তাকেও নির্বাসনে চলে যেতে হয়। কথিত আছে, যাওয়ার সময় তিনি বারবার তার প্রিয় শহরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিলেন আর কাঁদছিলেন। তার মা তখন তাকে বলেন, "মেয়েদের মতো তোমার প্রিয় শহরের জন্য কান্না করো না। কেননা, যখন তোমার সময় ছিল, তখন তুমি পুরুষের মতো গর্জে উঠে তাকে রক্ষা করতে পারোনি।"

মরিসকো

আন্দালুসের রাজনৈতিক ইতিহাসের যবনিকাপাত ঘটে ১৪৯২ সালে। কিন্তু সেখানেই যে স্পেনের মুসলিমদের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘটে তা বলা যাবে না। আইবেরিয়া উপদ্বীপে তখন জনসংখ্যা ছিল ৭০-৮০ লাখ, যার মধ্যে প্রায় ৬ লাখ ছিল মুসলিম। আর এর অধিকাংশই ছিল গ্রানাডায়। ক্যাথলিকরা শাসনের সুযোগ পেলেও তাদের পক্ষে এক ঝটকায় এত বিপুল সংখ্যক মুসলিমকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। আইবেরিয়ার অনেক এলাকা তখনও স্থানীয় অর্থনীতি পরিচালনার জন্য মুসলিমদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তা ছাড়া মুসলিমদের বের করে দিয়ে খ্রিষ্টান জনগণ দিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করবে এ পরিমাণ খ্রিষ্টানও তখন ছিল না। তাই ইসাবেলা ও ফার্ডিনান্ড প্রথমদিকে অনেকটা বাধ্য হয়ে মুসলিমদের প্রতি কিছুটা সহনশীল আচরণ করে। তবে নিজ ধর্মের শাসক না থাকায় মুসলিমরা সামাজিকভাবে হেয় হলেও তখনও তারা নিজেদের মতো করে ইসলাম চর্চা করতে পারছিল।

১৪৯২ সালে স্প্যানিশরা স্পেন থেকে সব ইহুদিকে উচ্ছেদ করে। পরবর্তী সময়ে অটোম্যান সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ তার সেনাবাহিনীকে আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে স্পেন থেকে আগত ইহুদি উদ্বাস্তুদের সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়। সে কারণেই বিংশ শতকের আগপর্যন্ত ইস্তাম্বুলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইহুদি বসবাস করতে পেরেছিল।

তার মানে এটাও নয় যে, খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কোনো চেষ্টা চালায়নি। কোনো মুসলিম যদি স্বেচ্ছায় খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করত তাহলে তাদের স্বর্ণমুদ্রা, ঘোড়াসহ নানা ধরনের দামি উপকরণ উপহার হিসেবে দেওয়া হতো। নিরুপায় ও হতাশাজনক অবস্থায় এসবের লোভে পড়ে ১৪৯২ সালের পর বহু মুসলিম খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণও করে। তবে খ্রিষ্টানরা পরবর্তীকালে বিস্মিত হয়ে পড়েছিল এটা দেখে, এভাবে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণকারী অনেকেই তাদের উপঢৌকনগুলো গ্রহণ করার পর আবার ঠিকই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ত, কুরআন তিলাওয়াত করত। যেহেতু মুসলিমদের যারা বাহ্যিকভাবে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা উপহার গ্রহণ করতে যতটা সক্রিয়, খ্রিষ্টান ধর্ম পালনে ততটা সক্রিয় ছিল না, তাই ক্যাথলিকরা মুসলিমদের ব্যাপারে আরও কঠোরতার সিদ্ধান্ত নিল।

১৪৯৯ সালে ফ্রান্সিসকো জিমেনেজ ডে সিজনেরজ নামে এক পাদরিকে আর্চ বিশপ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের প্রয়াস বৃদ্ধি করেন। মুসলিমদের মধ্যে যারা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছিল না তাদের ওপর তিনি ভয়াবহ নিপীড়ন চালাতেন। তার বক্তব্য ছিল, "এসব বিধর্মীরা যদি মুক্তির পথে স্বেচ্ছায় না আসে, তাহলে এগুলোকে টেনেহিঁচড়ে সঠিক পথে আনা হবে।" ফলে মুসলিমদের মধ্যে এই নিপীড়কের বিরুদ্ধে জন্ম নিল বিদ্রোহ। গ্রানাডার মুসলিমরা খ্রিষ্টান শাসকদের অধীনে আছে ততদিনে প্রায় ৮ বছর। কিন্তু সেবারই

তারা প্রথম খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করল। তাও সেই আর্চবিশপের কারণে। মুসলিমরা গ্রানাডার সড়ক অবরোধ করল এবং ঘোষণা দিলো যে, তারা ডে সিজনেরজের নীতির কাছে মাথা নত করবে না।

মুসলিমদের এই বিদ্রোহ ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের সামনে মুসলিম সম্প্রদায়কে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়। মুসলিম বিদ্রোহীদের দুটো উপায় বাতলে দেওয়া হয়। হয় তাদের মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে আর না হয় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে হবে। আর খ্রিষ্টান হয়ে গেলে তাদের ক্ষমাও করে দেওয়া হবে। নিরুপায় হয়ে প্রাণ বাঁচাতে অনেক মুসলিম খ্রিষ্টান ধর্মে ধমান্তরিত হওয়ার অপশনকেই বেছে নেয় আর দলে দলে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। গ্রানাডার বাইরে সামান্য কিছু বিদ্রোহের উদ্রেক হয়েছিল। তবে স্প্যানিশ শাসকরা খুব সুচারুভাবেই তা সামাল দিতে সক্ষম হয়। ১৫০২ সালে বিদ্রোহকে নির্মূল করার পর খ্রিষ্টানরা গোটা স্পেন থেকে মুসলিমদের উৎখাত করার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করে। অবশিষ্ট সকল মুসলিমকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ধর্মান্তরিত হও নতুবা স্পেন ত্যাগ করো; আর তা না হলে মৃত্যুকে বরণ করো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুসলিমদের খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়াকে গ্রহণ করতে হয়, যার ফলে কয়েক বছরের মধ্যে গোটা স্পেন জুড়েই খ্রিষ্টানদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাস্তব অবস্থা যদি চিন্তা করি, তাহলে স্পেনে এত নিপীড়নের পরেও ইসলাম টিকে ছিল, কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডে। যারা মুসলিম থেকে খ্রিষ্টান হয়েছে, তাদের তখন বলা হতো মরিসকো। স্পেনের শাসকরা সব সময়ই মরিসকোদের সন্দেহের চোখে দেখত এবং ধারণা করত যে, তারা আসলে ভীত হয়ে খ্রিষ্টান হয়েছে। কিন্তু খ্রিষ্টীয় অনুশাসনকে তারা কখনোই আন্তরিকভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করে না। এ কারণেই মরিসকো এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে তাদের ইসলামি শিকড়টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেজন্য তারা অনেকগুলো নতুন আইন প্রণয়ন করে। ১৫১১ সালে মুসলিমদের কুরবানি করার বিধানকে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৫১৩ সালে নারীদের হিজাব ও নেকাব করার বিধানকে নিষিদ্ধ করা হয়। মুসলিমদের নিজস্ব যে ধর্মীয় পোশাক সেটাও প্রকাশ্যে পরিধান করাকে ১৫২৩ সালে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সাথে মরিসকোরা যাতে শুক্রবার গোসল না করে এবং তারা যেন শুক্রবার ঘরের দরজা খোলা রাখে, তাও আইন করে নিশ্চিত করা হয়। এটা এজন্য করা হয়, যাতে গোপনেও কোন মরিসকো জুমার নামাজ আদায় করার সুযোগ না পায়। মরিসকোদের পরিবারে বিয়ের সময় খ্রিষ্টান সদস্যদের রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়। যাতে এটা নজরদারি করা যায় যে, ইসলামের বিবাহ সম্পর্কিত বিধান কোনো মরিসকো অনুসরণ করতে না পারে। ১৫২৬ সালে আরবি শব্দ উচ্চারণ নিষিদ্ধ করা হয়। মরিসকোদের জন্য বাইরে তো বটেই এমনকি ঘরের ভেতরও ক্যাস্টিলিয়ান ভাষায় কথা বলা বাধ্যতামূলক করা হয়। এভাবে মরিসকোরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে ইসলাম থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাহসী কিছু মরিসকো অবশ্য তখনও ছিল, যারা এত কিছুর পরও গোপনে ইসলামের চর্চা জারি রাখে এবং নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস আরও পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করে।

এত কিছু করেও মরিসকোদের অন্তর থেকে ইসলামকে মুছে দেওয়া সম্ভব হয়নি; বরং মরিসকোরা আরও কৌশলী হয়ে উঠল যে, কীভাবে আইনের আওতায় থেকেই তারা ইসলামকে লালন করতে পারে। মুসলিম স্কলাররা বেশ কিছু ফতোয়া জারি করলেন, যাতে মুসলিমরা খ্রিষ্টান শাসকদের রক্তচক্ষু এড়াতে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়েও ধর্মচর্চা করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ১৫০২ সালে দেওয়া ওরানের (বর্তমান আলজেরিয়া) মুফতির একটি ফতোয়ার কথা বলা যায়। তিনি বলেছিলেন যে, মুসলিমরা নামাজের আগে পানি দিয়ে অজু না করে পরিষ্কার দেওয়াল ধরে তায়াম্মুম করেও নামাজ পড়তে পারবে। কিংবা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়তে পারলে একবারে রাতের বেলায় অন্ধকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ একসাথে পড়ে নিতে পারবে। অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বাধ্য করলে পরিস্থিতির কারণে তারা শুকরের গোস্তও খেতে পারবে। যেহেতু মাদরাসা ও মসজিদগুলোর সবই খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, তাই এসব জায়গায় যে ধর্মীয় আচারাদিগুলো সাধারণত পালন করা হয় সেগুলোর সবই বাসাবাড়িতে করার তাগিদ দেওয়া হয়েছিল। আরবি ভাষাও লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুশীলন করা হচ্ছিল এবং পিতা-মাতাও নিশ্চিত করতেন যাতে তাদের বাচ্চারা ইসলামি বিধিবিধান ও কুরআন পড়া শিখে নিতে পারে। খ্রিষ্টান নামে থাকা মরিসকোরা প্রতি রবিবার চার্চে যেত, সেখানে গিয়ে ঠিকই ক্যাথলিক ধর্মমতে খ্রিষ্টধর্ম অনুশীলনও করত এবং তারপর বাসায় ফিরে এসে নিজেদের মুসলিম নাম নিয়ে আবার কুরআন তিলাওয়াত ও তওবা করত এবং ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী ইবাদত করত।

স্পেনের রাজারা মরিসকোদের এই গোপন ধর্মচর্চার বিষয়টা যে একেবারেই জানত না তা নয়। এমনকি গ্রানাডার দখল করার একশ বছর পরও স্পেনের খ্রিষ্টান রাজা এবং ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা অনুধাবন করতে পারছিল যে, মরিসকোদের খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজটি প্রত্যাশানুযায়ী সাফল্য পায়নি। প্রতিনিয়ত মরিসকোরা ইসলামি অনুশাসন চর্চা করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ছিল। আর তাদের মারাত্মক শাস্তি দেওয়ার পরও অন্য মরিসকোদের ইসলামের অনুশীলন থেকে বিরত রাখা যাচ্ছিল না। এমন অবস্থাতেই স্পেনের রাজা হলেন দ্বিতীয় ফিলিপ। তিনি ছিলেন উগ্রবাদী ক্যাথলিক যাজকদের ভীষণ ভক্ত। ১৬০৯ সালে স্পেন থেকে মরিসকোদের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। যদিও স্পেনের অনেক অভিজাত মহল তার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিল। কেননা, তারা বুঝতে পারছিল, গণহারে মরিসকোদের

বিতাড়িত করা হলে অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু তাদের আপত্তি সত্ত্বেও রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ তার আগ্রাসী সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন।

মরিসকো অধ্যুষিত সবগুলো লোকালয়কে রাতারাতি খালি করে ফেলা হয়। তাদের গণহারে জাহাজে তুলে দেওয়া হয়। এই জাহাজগুলো ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে উত্তর আফ্রিকা যাচ্ছিল। মরিসকোদের কিছু সম্পত্তি সাথে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। যদিও তাদের অধিকাংশ সম্পত্তি এরই মধ্যে স্প্যানিশরা বাজেয়াপ্ত করে ফেলেছিল। চার বছরের কম এমন শিশুদের হৃদয়বিদারকভাবে মরিসকো বাবা-মায়ের সাথে যেতে দেওয়া হয়নি; বরং তাদের অন্যত্র তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে তাদের খ্রিষ্টান হিসেবেই বড়ো করে তোলা যায়। এই অবস্থায়, স্পেনের দক্ষিণে আবারও একটি বিদ্রোহের সূচনা হয়। কেননা, মরিসকোরা এত বছর খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করেও যেহেতু উৎখাতের শিকার হলো, তাই বাকিরা চিন্তা করল– এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে ইসলাম পালনের আর কোনো মানে নেই। বরং ধর্মপরিচয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেই থাকা ভালো। ফলে ইসলাম পতনের প্রায় ১০০ বছর পর আবার স্পেনের গ্রামে গ্রামে আজান শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানে জামায়াতে নামাজ আদায় করা শুরু হয়। যদিও এই বিদ্রোহীদের তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দমন করে ফেলে। তারপরও এটাই সান্ত্বনা যে, এই বিদ্রোহী মানুষগুলো প্রায় ১০০ বছর পর আবার আন্দালুস আর আন্দালুসের ৮শ বছরের বর্ণাঢ্য ইতিহাসকে আরেক দফা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৬১৪ সালে এসে সব মরিসকোদের বিতাড়ন করা সম্পন্ন হয় এবং বিদ্রোহীদেরও সম্পূর্ণ দমিয়ে ফেলা হয়। এরপর কিছু কিছু খবর তখনও পাওয়া যাচ্ছিল যে, মরিসকো কিছু মানুষ নাকি পরিচয় লুকিয়ে স্পেনের বিভিন্ন স্থানে আছে এবং ভেতরে ভেতরে ইসলাম চর্চা করে যাচ্ছে। তবে এই সীমিত সংখ্যক মরিসকো আসলে আন্দালুসের একটা ছায়াকে ধারণ করা ছাড়া কার্যত আর কিছুই করতে পারছিল না। স্পেন ও আইবেরিয়ার উত্থানে ইসলামের অনেক অবদান থাকলেও কালের বিবর্তনে এই স্থান থেকে ইসলামকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তবে পশ্চিমে ইসলাম ব্যর্থ হলেও প্রাচ্যে তখন আবার ইসলামের নতুন উত্থান ঘটছিল। ইসলামের পুনরুত্থান ঘটছিল অটোম্যানদের হাত ধরে, যাকে কেন্দ্র করে মুসলিম ইতিহাসের নতুন আরেকটি স্বর্ণালি যুগের সূচনা হয়।

নবম অধ্যায়

প্রান্তসীমা

অধিকাংশ সময় মুসলিম বিশ্ব বলতে শুধু মধ্যপ্রাচ্যকেই বোঝানো হয়। এটা ঠিক যে, ইসলামের জন্ম হয়েছিল আরব উপদ্বীপে আর পরবর্তী সময়ে নীল ও অক্সাস নদীর মধ্যবর্তী এলাকাকে কেন্দ্র করে ইসলামের একটি অবিস্মরণীয় উত্থান ঘটেছিল। তবে ইসলামের ইতিহাসকে শুধু এ অঞ্চলের ফ্রেমে বেঁধে রাখলে ইসলামের অন্য অনেক সোনালি উপাখ্যানকে অস্বীকার করা হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলাম একসময় পৌঁছে গিয়েছিল সাব-সাহারা আফ্রিকা, চীন এবং ভারতবর্ষে। তাই এসব অঞ্চলকেও ইসলামের ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার দাবি রাখে।

পশ্চিম আফ্রিকা

রাসূল γ-এর ওফাতের কয়েক যুগের মধ্যেই যখন ইসলাম উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছে গেল, তখন মূলত মুসলিমরা উপকূলীয় এলাকা ধরে অগ্রসর হচ্ছিল। ইসলামপূর্ব যুগে যেমন রোমান ও বাইজেন্টাইনরা বাস্তবতার কারণে উপকূলের নিকটবর্তী এলাকাতে শহর স্থাপন করেছিল বা উপকূলের কাছাকাছি শহরগুলো বেশি জয় করেছিল, মুসলিমরাও ঠিক একই কৌশল অনুসরণ করেছে। এভাবে উত্তর আফ্রিকার কারাওয়ান, ত্রিপোলি এবং তানজিয়ারে যে মুসলিম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেখানে বার্বার ও আরব উভয় সংস্কৃতিরই প্রভাব ছিল। আর আফ্রিকার এই নতুন সভ্যতার উপকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মধ্যপ্রাচ্য ও আন্দালুসের সভ্যতার প্রচুর মিল ছিল।

এরপর মুসলিমরা ভূমধ্যসাগরের এসব উপকূলীয় শহর থেকে চোখ ফেরায় দক্ষিণে সাহারা মরুভূমির দিকে। পশ্চিম আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকায় সাভানাহ ও নাইজার নদীর প্রচুর প্রভাব ছিল। নদীর উত্তরে সাহারা মরুভূমিতে যে জনগোষ্ঠী ছিল তাদের জীবনযাপন ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। অন্যদিকে, দক্ষিণে ছিল বিশাল বনাঞ্চল। এখানে ইসলাম আগমনের পূর্বে ও পরে পশ্চিম আফ্রিকার অনেক জাতিগোষ্ঠী নাইজার নদীর আশেপাশেই থাকার চেষ্টা করত। কারণ, সেখানে কৃষি জমির পরিমাণ ছিল তুলনামূলক বেশি। তুয়ারেজ নামক একটি মুসলিম বার্বার সম্প্রদায় তখনকার সময়ে উত্তর আফ্রিকার শহরগুলো থেকে মরুভূমির বিশাল এলাকা হয়ে সাভানাহ পর্যন্ত বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনা করত। এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলো ট্রান্স-সাহারা বাণিজ্যের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল। কারণ, এ বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা স্বর্ণ ও লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সব পণ্যের জোগান পেত।

শুধু পণ্য নয়, এ বাণিজ্যের সুযোগে পশ্চিম আফ্রিকাতে ইসলামও পৌঁছে যায়। মুসলিম বণিকরা যারা বাণিজ্য করার জন্য বিশাল মরুভূমি পার হয়ে পশ্চিম আফ্রিকা যেত, তাদের কেউ কেউ সেখানে বসতিও গড়ে। ১১ শতকে সাভানাহ অঞ্চলের অনেক শহরেই অভিবাসী মুসলিমদের দেখা পাওয়া যেত। যেহেতু পশ্চিম আফ্রিকায় বসত গড়া অধিকাংশ মুসলিমই ছিল বণিক, সে অর্থে তাদের মধ্যে কোনো প্রশিক্ষিত ধর্মপ্রচারক বা দাঈ ছিল না। তাই স্থানীয় মানুষের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে বেশ সময় নিচ্ছিল। ফলে, পশ্চিম আফ্রিকার কিছু স্থানীয় মানুষ ধর্ম হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করলেও জীবন চর্চা ও অনুশীলনে পুরোনো কুসংস্কারই অনুসরণ করত। উত্তর আফ্রিকায় ইসলাম যেমন শক্তিশালী রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে আগমন করেছিল, পশ্চিম আফ্রিকায় তেমনটা হয়নি। সেখানে ইসলাম খুব ধীরে ধীরে জনগণের মাঝে প্রবেশ করছিল। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করছিল, তাদেরও হুট করে ইসলামের মূল চেতনা বা ধর্মীয় আচারাদি পালন করার জন্য চাপ দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মুরাবিতুন আন্দোলন। যারা একাদশ শতকে পশ্চিম আফ্রিকার বেশ কিছু শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল; যদিও তার প্রভাব খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

পশ্চিম আফ্রিকায় স্থানীয়ভাবে প্রথম যে মুসলিম রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা ছিল মালি। সুফি সুন্দিয়াতা কেইতার মাধ্যমে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালির জন্ম হয়। সুন্দিয়াতা কেইতা ছিলেন মানদিনকা জনগোষ্ঠীর নেতা। তাকে লায়ন কিং বা সিংহরাজা হিসেবে অভিহিত করা হতো। পরবর্তী সময়ে একজন অত্যাচারি শাসক ক্ষমতা দখল করে তাকে নির্বাসনে পাঠায়। নির্বাসনে থাকা অবস্থায় মানদিনকা জনগোষ্ঠীর মাঝে তার জনপ্রিয়তা পূর্বের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। পরে জনগণের সহায়তায় ফিরে এসে নিজের শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন তিনি। তখন থেকে তার নাম হয় মানসা মানদিকা বা রাজার রাজা (কিংস অব কিংস)। কেইতার পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে তেমন একটা জানা যায় না। লোকমুখে নানা গল্প প্রচলিত থাকলেও যা নিশ্চিত হওয়া যায় তা হলো– সুন্দিয়াতা কেইতা পশ্চিম আফ্রিকার বেশ ভেতরে নাইজার নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা বেশ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী ও ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত হয়।

মানসা মুসার শাসনামলে (১৩১২-১৩৩৭) মালির সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি ঘটে। তিনি মালিকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলেন। মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য যখন মোঙ্গলদের হামলায় তছনছ হচ্ছে, আন্দালুস আর গ্রানাডা যখন খ্রিষ্টানদের পায়ের নিচে পিষ্ট হচ্ছে, তখনও সাভানাহ অঞ্চলের দক্ষিণে মালি একটি সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র এবং অন্যতম সফল রাষ্ট্র হিসেবে বিকশিত হচ্ছিল। যদিও এই মুসলিম রাজ্য সম্পর্কে পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের মুসলিমরাই ভালোভাবে জানতই না। সে সময়ের মালি সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তার সূত্র হলো মানসা মুসার মহাকাব্য *হজ টু মক্কা*; যা আনুমানিক ১৩২৪ সালে রচনা করা হয়। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ মালির ইতিহাস শুধু মুসলিম নয়; বরং বিশ্ববাসীর সামনে চলে আসে।

মানসা মুসার হজ কাফেলা যখন পশ্চিম আফ্রিকার সাভানাহ অতিক্রম করে তখন হজযাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। শুধু রাজার সাথেই ছিলেন ১২ হাজার সঙ্গী। যাদের প্রত্যেকের পরনে ছিল সিল্কের কাপড় আর দুই কেজি করে স্বর্ণ; যেগুলো মালির স্বর্ণখনি থেকে আহরণ করা হয়েছিল। তারা যে উটে চড়ে যাচ্ছিল, তার ওপর ছিল স্বর্ণধুলায় ভর্তি বস্তা, যাওয়ার পথে গরিব মানুষদের মাঝে তা বিতরণ করা হচ্ছিল। যাত্রাপথের সবাই পশ্চিম আফ্রিকার এই অজ্ঞাত মুসলিম সম্প্রদায় এবং তাদের সম্পদের প্রাচুর্য দেখে অবাক হয়ে যান। যখন মানসা মুসা মিশরে পৌঁছান, তখন সেখানে মামলুকদের শাসন চলছিল। মানসা মুসা তার জীবনাচরণ দিয়ে মামলুকদের মনে ইতিবাচক অবস্থান তৈরি করেন। মামলুকরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করে– মানসা মুসা একজন মানবদরদি শাসক। তিনি এক ওয়াক্ত নামাজও বাদ দেন না এবং কুরআনের ওপর তার চমৎকার জ্ঞান আছে। তাই মামলুক রাজা খুশি হয়ে মানসা মুসাকে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন প্রদান করেন। কথিত আছে, মানসা মুসা ও তার সঙ্গীরা হজে যাওয়ার সময় এত বেশি স্বর্ণ পথে পথে মানুষের মাঝে বিতরণ করে যান যে, তা ইতিবাচকতার পাশাপাশি কিছু নেতিবাচক প্রভাবও ফেলে। বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। স্বর্ণের দাম আশঙ্কাজনকভাবে পড়ে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, যা পরবর্তী কয়েক যুগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পরবর্তী সময়ে মিশরের গোটা অর্থনীতিই চাপের মুখে পড়ে যায়। ১০ বছর পর উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা যখন মিশর গমন করেন, তখনও তিনি দেখতে পান যে, মিশরের অর্থনীতি সেই স্বর্ণ বিতরণের জেরে কোণঠাসা হয়ে আছে এবং দেশটিতে ব্যাপক পরিমাণ মূল্যস্ফীতি বিদ্যমান।

সম্ভবত মানসা মুসার মক্কা যাত্রা যতটা স্মরণীয় তার চেয়ে বেশি স্মরণীয় ছিল তার ফিরে আসার যাত্রাটি। মালিতে তখনও ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া চলছে, আর মালির মানুষের মধ্যে নানা ধরনের সংস্কৃতি তখনও মিশ্রিত হয়ে আছে। তাই মানসা মুসা মালির মানুষদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেখানে জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। মালির বিত্ত আর প্রাচুর্যকে ব্যবহার করে তিনি যাত্রাপথে বিভিন্ন শহর থেকে প্রথিতযশা আলিম-পণ্ডিত, শিক্ষক ও শিল্পীদের নিয়ে গেলেন। ১৩২০ এর দশকে যখন মানসা মুসা মালিতে ফেরত আসেন, তখন তার সাথে ছিল আরব, পারস্য আর আন্দালুসের সব সেরা জ্ঞানসাধকরা। ফলে সেবারই প্রথম আফ্রিকার সে জনপদে আন্তর্জাতিক ইসলামি চেহারার সত্যিকারের প্রভাব পড়তে দেখা যায়। পাশাপাশি জ্ঞানীদের সংস্পর্শে মালি জ্ঞানের অভিযাত্রায় অনেক এগিয়ে যায়। মোঙ্গলরা বাগদাদে বায়তুল হিকমাহকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অর্ধ শতকের ব্যবধানে পশ্চিম আফ্রিকার সাভানায় ইসলামি জ্ঞানের নতুন দিগন্তের সূচনা হয়।

১৫শ শতকের শুরুতে হিজায অঞ্চলের ফকিহ আবদুর রহমান আত-তামিমি তিম্বুকতুতে গমন করেন এবং দেখেন, সেখানে শিক্ষার মান সুউচ্চ। তাই তিনি আবার ফেজে গমন করেন এবং সেখানে কিছু পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করেন, যাতে তিনি মালির জ্ঞানী ও শিক্ষিতদের সমান্তরাল হতে পারেন।

মালির জ্ঞানরাজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল তিম্বুকতু, যা নাইজার নদী থেকে ২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। সাহারা মরুভূমির একেবারে প্রান্তসীমায় আর ট্রান্স-সাহারা বাণিজ্যযাত্রা পথের অন্যতম বিরতি স্থান ছিল এই শহরটি। তিম্বুকতু মালির নিয়ন্ত্রণে আসে মানসা মুসার সময়ে এবং তখন থেকেই এ জনপদটি জ্ঞানীদের সাহচর্য পেতে শুরু করে। গোটা তিম্বুকতু জুড়ে অসংখ্য পাঠাগার, মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে, যা শহরটিকে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞাননির্ভর সভ্যতার রূপ দিতে শুরু করে। মানসা মুসা বিভিন্ন স্থান থেকে যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মালিতে নিয়ে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আন্দালুসের প্রখ্যাত স্থপতি আবু ইসহাক। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় স্থাপত্যের দিক থেকে মালিকে এগিয়ে নেওয়ার। তিনি প্রচুর প্রাসাদ, মসজিদ ও বিদ্যালয় নির্মাণ করে তিম্বুকতুকে এমন একটি শহরে পরিণত করেন, যা ইসলামের স্বর্ণযুগের শহরগুলোর মতোই ছিল সমৃদ্ধ।

মানসা মুসা তিম্বুকতুর বেশ কিছু পণ্ডিতকে মরক্কোতে প্রেরণ করেন, যেন সেখানকার মানুষও ইসলামের অগ্রসর চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতে পারে এবং তিম্বুকতুতে এসে জ্ঞানচর্চার এ আন্দোলনে কার্যকর অবদান রাখতে পারে। মালি ও সাংহাই রাজ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ দুটো রাজ্যেই আলিম-পণ্ডিতদের অনেক সম্মান ও সুবিধা দেওয়া হয়। তাদের বিনামূল্যে জমি দেওয়া হয় এবং নগদ দলিল উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। এভাবে আরব থেকে আসা জ্ঞানীজন এবং তিম্বুকতুর নিজস্ব জ্ঞানীদের অবদানের সমন্বয়ে তিম্বুকতু বিশ্ব মুসলিমের জ্ঞানের অন্যতম সফল কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। যদিও তিম্বুকতু যখন ইসলামকে ধারণ করে এতটা অগ্রসর হচ্ছে, তখন ইসলামের মূল কেন্দ্রভূমি ও আশেপাশের এলাকা অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ভীষণ সংকটকাল অতিক্রম করছিল।

পূর্ব আফ্রিকা

অন্যদিকে, পূর্ব আফ্রিকাতেও ইসলামের আলো পৌঁছাতে খুব একটা দেরি হয়নি। হযরত মুহাম্মাদ γ-এর মদিনায় হিজরতের আগেই একদল সাহাবি মক্কার নিপীড়ন থেকে বাঁচতে আকসুমে (আরবি নাম হাবশা, আধুনিক সময়ের ইথিওপিয়া) আশ্রয় নেন। সেখানকার খ্রিষ্টান রাজা তাদের আন্তরিকতার সাথে বরণ করে নিয়েছিলেন। সে যুগে অবশ্য পূর্ব আফ্রিকা থেকে অনেকেই মক্কায় যেত। রাসূল γ-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি যিনি মসজিদে নববিতে নিয়মিত আজান দিতেন, সেই বিলাল η এই ইথিওপিয়ারই মানুষ। বিস্ময়কর হলেও সত্য, ৭ম শতকে ইসলামের আবির্ভাবের আগেই আরব উপদ্বীপের সাথে পূর্ব আফ্রিকার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। আর পশ্চিম আফ্রিকার মতোই বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে আফ্রিকায় ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল।

ইয়েমেন ইসলামের আওতায় আসার পর হাদারামাওত অঞ্চলের অনেক আরব বণিক পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে বসতি গড়তে শুরু করে। ইসলামের বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপত্য, যা এ এলাকায় এখনও আছে, তা থেকে ধারণা করা যায়– ইসলাম খুব সম্ভবত ৮ম থেকে ৯ম শতাব্দীর মধ্যকালীন সময়ে এসব এলাকায় পৌঁছেছিল। বর্তমানে আমরা যেসব নিদর্শন বা প্রমাণাদি পাচ্ছি তাতে এও বোঝা যায়– পূর্ব আফিকান উপকূলের একেবারে উত্তরের মানুষেরা প্রথম ইসলামের দাওয়াত পায়। কারণ, এই অঞ্চলটি আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল। এমনকি কেনিয়াতে ১০ম শতকে নির্মিত মসজিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। অথচ কেনিয়া মক্কা থেকে প্রায় ২,৫০০ কিলোমিটার দক্ষিণে। ১৩ শতকের দিকে ইসলাম আফ্রিকার আরও ভেতরে এমনকি তানজানিয়া অবধি ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব আফ্রিকায় ইসলাম মূলত বিকশিত হচ্ছিল বাণিজ্যের মাধ্যমে। মুসলিম বণিকদের কাছে রকমারি পণ্যের পসরা পাওয়া যেত। তাই পূর্ব আফ্রিকার মানুষ মুসলিম ব্যবসায়ীদের বরাবরই সাদরে অভ্যর্থনা জানাত। পরবর্তী সময়ে এখান থেকে ইসলাম আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯ শতকের শুরুতে বিলালি মুহাম্মাদ নামে আমেরিকার এক মুসলিম ক্রীতদাস ইসলামি আইন প্রসঙ্গে ১৩ পাতার একটি রচনা লিখেছিলেন, যার ভিত্তি ছিল কয়েক শতক আগে তৈরি হওয়া পশ্চিম আফ্রিকার শিক্ষাপদ্ধতি। তিনি এই রচনাটি লিখেছিলেন তার সহকর্মী অন্যান্য ক্রীতদাসকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকায় মানুষ যেভাবে ইসলামকে বরণ করত তা ছিল রীতিমতো চমকপ্রদ। তখনকার অগ্রসর মানব সভ্যতা থেকে অনেক দূরে থাকায় কখনও সে অর্থে জনপ্রিয় কোনো আন্দোলন সেখানে গড়ে ওঠেনি। অবশ্য নিয়মিতভাবে এসব এলাকায় বণিকরা গমন করত, যাদের অনেকে সেখানে বসতিও গড়ে। ধনী বণিকদের অনেকে স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করত। ফলে ইসলামের নানা উপাদান এভাবেই আফ্রিকার সংস্কৃতিতে প্রবেশ করতে শুরু করে। নতুন করে বসতি গড়া মুসলিমরা কখনও আফ্রিকার স্থানীয় মানুষদের ওপর খবরদারি করেনি; বরং এটা ছিল সত্যিকার অর্থেই ভিন্ন ধারার দুটি সংস্কৃতির অবাধ মিশ্রণ।

পূর্ব আফ্রিকার ভাষা ছিল সোয়াহিলি। মুসলিম বণিকরা ভাষাটি শিখে নেয়। ফলে তারা যখন উপকূল ধরে অন্যান্য শহরে যেত, ভাষা জানার কারণে তারা সেখানকার স্থানীয় মানুষদের সাথে দ্রুত মিশে যেতে পারত। এমনকি আফ্রিকার এ ভাষাটি মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে আরবের অনেক এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, একইভাবে বন্দর নগরীগুলোতে যেসব আফ্রিকানদের আনাগোণা ছিল, তারাও মুসলিম বণিকদের সংস্পর্শে এসে আরব ও পারস্য সংস্কৃতির অনেক কিছুই শিখেছিল। যেহেতু ইসলাম তখন বিশ্বের প্রায় সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছিল, তাই বিষয়টা কখনও এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়নি যে, নতুন ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করলে স্থানীয় সব ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে ফেলে দিতে হবে; বরং ইসলামের সাথে মিলেমিশে নতুন একটি সাংস্কৃতিক ধারা তৈরি হওয়ার প্রবণতাই সবখানে বিদ্যমান ছিল।

স্থানীয় অধিবাসীরা ইসলামকে আন্তরিকভাবে বরণ করে নেওয়ায় পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় শহর বা রাজ্যগুলোতে ইসলামের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কিছু তথ্য পাওয়া যায় ইবনে বতুতার সফরনামা থেকে। তিনি চতুর্দশ শতকে পশ্চিম আফ্রিকায় গমন করেছিলেন। তার মতে, উপকূলীয় শহরাঞ্চলে শুধু যে বাণিজ্য বেশি হতো তা নয়; পাশাপাশি এ শহরগুলো ধর্মীয়ভাবেও অগ্রসর ছিল। ইবনে বতুতা আরও জানান, মোগাদিসুর সুলতান (বর্তমান সোমালিয়া) তার শাসনকার্য পরিচালনায় ধর্মীয় উপদেষ্টাদের ওপর বেশ নির্ভর করতেন। আর ধর্মীয় উপদেষ্টাদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি এসেছিলেন মিশর থেকে। ইবনে বতুতা কিলওয়া ও মোমবাসার বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানকার মানুষের ধর্মীয় উচ্ছ্বাস, আবেগ এবং স্থানীয় মসজিদগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি কিলওয়ার সুলতানেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। কারণ, সুলতান সব সময় ধর্মীয় শিক্ষাবিদ ও রাসূল γ-এর বংশধরদের বিশেষ সম্মান দিতেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে সব সময় অভাবী ও গরিব মানুষের সাথে খাবার খেতে পছন্দ করতেন।

পূর্ব আফ্রিকার ইসলাম প্রসারের পাশাপাশি সোয়াহিলির মানুষের জীবনে ইসলামের প্রভাবের কথা না উল্লেখ করলেই নয়। সেখানকার মানুষ ইসলামকে কোনো বহিরাগত দর্শন হিসেবে বিবেচনা করেনি। তারা কখনও এটা অনুভব করত না যে, আরব ও পারস্য থেকে আসা বণিকরা তাদের ওপর ইসলামকে চাপিয়ে দিয়েছে। বরং তারা ইসলামকে আফ্রিকার নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি হিসেবেই দেখত। রাসূল γ-এর ঘনিষ্ঠতম সাহাবি হযরত বিলাল η এবং ইসলামের একেবারে প্রথম যুগে আবিসিনিয়ায় মুসলিমদের পদার্পণের গল্প তাদের মুখে মুখেই ফিরত। তাই

তারা ভাবত– ইসলাম প্রকৃতপক্ষে শুরু থেকেই আফ্রিকাতে আছে এবং গভীরভাবেই আছে। এরপরও দক্ষিণ আরব, পারস্য ও ভারত থেকে আসা বণিকদের মাধ্যমে অনেক সাংস্কৃতিক উপাদান পূর্ব আফ্রিকায় প্রবেশ করেছিল। যদিও মুসলিম বিশ্বের অন্য সব এলাকার মতো এখানেও ইসলামপূর্ব সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি; বরং ইসলামের আলোকে ঈষৎ পরিমার্জন করা হয়েছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক যত ভিন্নতাই থাকুক না কেন, বিশ্বাস বা ঈমানের দিক থেকে সকলের মধ্যেই একটি সামঞ্জস্য ছিল, যা তাদের মধ্যে দৃঢ় একতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল।

আফ্রিকান ক্রীতদাস ও আমেরিকা

আফ্রিকায় ইসলামিকরণের রেশ পরবর্তীতে পৌঁছে যায় আটলান্টিক মহাসাগরে, এমনকি দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত। ১৪৯২ সালে কলম্বাসের মাধ্যমে নতুন পৃথিবী খোঁজার নামে ইউরোপীয়রা যখন ঔপনিবেশিকতার বিকাশ শুরু করে, তখন আমেরিকান কলোনিগুলো গড়ে তোলার জন্য তাদের ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে। প্রাথমিকভাবে আমেরিকায় স্থানীয় যে জনগোষ্ঠী ছিল তাদের ক্রীতদাস বানানোর চিন্তা থাকলেও কার্যত তা যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি। ইউরোপীয়দের বয়ে নিয়ে আসা জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে স্থানীয় আমেরিকানরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ১৬ শতকের শুরুতেই লাখ লাখ আদি আমেরিকান নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করে।

তাই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকশক্তিগুলো শ্রমিক পাওয়ার বিকল্প উপায় হিসেবে দক্ষিণে সাব-সাহারা আফ্রিকার কালো মানুষদের ব্যবহার করার পরিকল্পনা করে। সেই পরিকল্পনা থেকেই ইউরোপীয় বণিকরা সস্তায় শ্রমিক কেনার জন্য পশ্চিম আফ্রিকার শহুর-বন্দরগুলোতে যাতায়াত শুরু করে। তারা সরাসরি আফ্রিকার রাজাদের সাথে চুক্তিতে যায়। রাজারা বিভিন্ন যুদ্ধে যুদ্ধবন্দি হিসেবে যে কালো নাগরিকদের আটক করেছিল, প্রাথমিকভাবে তাদেরই ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রি করে দেয়। এর প্রতিদান হিসেবে ইউরোপীয় বণিকরা রাজাদের আরও অস্ত্র সরবরাহ করে। যা দিয়ে তারা আবার নতুন করে ভয় দেখিয়ে বা যুদ্ধ করে মানুষকে বন্দি করে ইউরোপীয় বণিকদের হাতে তুলে দিত। অসুস্থ ও বর্বর এ ব্যাবসার কারণে গোটা পশ্চিম আফ্রিকার জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়; অসংখ্য এলাকা জনমানবহীন হয়ে পড়ে। সে সময় ইউরোপীয়রা আফ্রিকার মানুষের সাথে যে বর্বর আচরণ করেছিল, মানব ইতিহাসে তার দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। গোটা পশ্চিম ও উপকূলীয় আফ্রিকার মানুষদের অমানবিকভাবে পাকড়াও করে, দিনের পর দিন অনাহারে রেখে, অত্যাচার করে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে তথাকথিত নতুন পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া হতো। আর পৌঁছামাত্রই তাদের নতুন পৃথিবী গড়ার কঠোর পরিশ্রমে লাগিয়ে দেওয়া হতো।

১৬ শতকের আগেই আফ্রিকার সিংহভাগ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে আমেরিকায় যে কালো মানুষদের ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটি বড়ো অংশ ছিল মুসলিম। সঠিক কোনো সংখ্যা পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হয়, ক্রীতদাস বাণিজ্যের আড়ালে দেড় থেকে দুই কোটি আফ্রিকান নাগরিককে আমেরিকায় জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; যার মধ্যে ৩০ থেকে ৬০ লাখই ছিল মুসলিম। তারা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার জঘন্য ও বর্বরতম অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন। শ্রমিকদের সাথে কী ধরনের আচরণ করা হবে, সে ব্যাপারে তৎকালীন আমেরিকায় কোনো আইন বা বিধান ছিল না। মালিকেরা শ্রমিকদের নির্বিচারে মারতে পারত, আঘাত করতে পারত; এমনকি হত্যাও করতে পারত।

ক্রীতদাসদের অনেকেই আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে গাছ লাগানোর কাজ করত। তাদের রাতদিন সব সময়ই খাটানো হতো। শ্রমিকদের সর্বনিম্ন শাস্তি ছিল চাবুকের আঘাত বা বেত্রাঘাত। তারা মালিকের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে না পারলে কিংবা কথা না শুনলেই তাদের এ শাস্তি দেওয়া হতো। শ্রমিকদের পরিধান করার জন্য খুবই মোটা বা ছেড়া টুকরোর কিছু পোশাক দেওয়া হতো, আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে কাজ করতে হতো।

মালিকরা ক্রীতদাসদের মানবিক দৃষ্টিতে না দেখার কারণে প্রত্যেক ক্রীতদাসকে অসম্ভব নিপীড়নের ভেতর দিয়ে যেতে হতো। এক্ষেত্রে মুসলিমরা বেশি হয়রানির মুখোমুখি হতো। তারা কখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার বিরতি বা সুযোগ পেত না। আর মক্কায় হজে যাওয়ার চিন্তা তো মাথাতেই আনা যেত না। ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ খুবই কম ছিল। ক্রীতদাস হওয়ার আগে যারা কুরআনে হাফেজ ছিলেন, তারা তবু একাকী সুযোগ পেলে মুখস্থ অংশগুলো ঝালাই করে নিতেন কিংবা সুযোগমতো অন্য মুসলিম ক্রীতদাসদেরও দুয়েক আয়াত শেখাতেন। কিন্তু ইসলাম শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকায় ইসলামি ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করার কোনো সুযোগ ছিল না। তাই ১৬ শতক থেকে ১৯ শতকের মধ্যে এসব ক্রীতদাসদের যে নতুন প্রজন্ম জন্ম নেয়, তাদের মধ্যে ইসলামি প্রথা ও সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমাগত কমতে থাকে। কিছু কিছু ক্রীতদাস নিজেদের ঈমানের তাগিদে বাড়তি পরিশ্রম করে একটু বাড়তি মজুরি কামিয়ে ইউরোপ থেকে অনেক দাম দিয়ে দু-এক কপি কুরআন নিয়ে আসত! যার কারণে ইসলাম হয়তো সেখান থেকে পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। তবে তাদের পূর্বপুরুষরা পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলামের যে সমৃদ্ধ জ্ঞানচর্চা করেছে, সে তুলনায় এসব উদ্যোগ খুচরা কিছু প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্যান্য ক্রীতদাসদের তুলনায় আফ্রিকা থেকে আসা মুসলিম ক্রীতদাসদের কিছু বাড়তি সুবিধাও ছিল। কারণ, গোটা ক্রীতদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে তারাই তুলনামূলক শিক্ষিত ছিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা মালিকদের চেয়েও বেশি শিক্ষিত ছিল। মুসলিমরা আগাগোড়াই শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিত, আর আফ্রিকায় মুসলিমদের জ্ঞাননির্ভর কার্যক্রম বেশি হওয়ায় সেখানকার মুসলিম ক্রীতদাসদের মধ্যে এমন কিছু ইতিবাচক

গুণাবলি ছিল, যা ইউরোপ থেকে আসা শ্রমিকদের মধ্যে ছিল না। তা ছাড়া শিক্ষা থাকায় অনেক ক্ষেত্রে এসব মুসলিম ক্রীতদাসকে হিসাব রক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কাজেও লাগানো হতো। আর এ কারণেই তারা পরবর্তী সময়ে একটি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়।

১৯ শতকে ব্রাজিলের রিও ডে জেনেরিওতে কর্মরত মুসলিম ক্রীতদাসদের মধ্যে আরবি কুরআনের চাহিদা এত বেশি ছিল যে, একজন বই বিক্রেতা বছরে ১০০ কপি কুরআন আমদানি করতে বাধ্য হয়েছিল। যেসব ক্রীতদাসরা এই কুরআনগুলো আনাত, তারা কয়েক বছর অমানুষিক পরিশ্রম করে তারপর এই কুরআন কেনার অর্থ জমাতে পারত।

ব্রাজিলের বাহিয়ায় ১৮৩৫ সালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ব্রাজিলে যে মুসলিম ক্রীতদাসদের নেওয়া হয়েছিল তারা সহজেই ক্রীতদাস সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের আসনে চলে গিয়েছিল। আর সেখান থেকেই তারা বর্বর মালিকদের বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের সূচনা করে। আরবিতে লেখা বিভিন্ন চিরকুটে বিদ্রোহের পরিকল্পনা ও নির্দেশনা লেখা থাকত, যা শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে লেনদেন করত। বিদ্রোহটি অবশ্য ব্যর্থ হয়! কারণ, ব্রাজিলের সেনারা মুসলিম ক্রীতদাসদের কার্যক্রম খুবই কঠোর হাতে দমন করে। কিন্তু তারপরও ব্রাজিল কর্তৃপক্ষের মনে মুসলিম ক্রীতদাসদের ব্যাপারে ভয় ঢুকে যায়। ফলে সেসময়ে নতুন কোনো বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য অসংখ্য মুসলিম ক্রীতদাসকে পশ্চিম আফ্রিকায় ফেরত পাঠানো হয়।

কয়েক শতাব্দী ধরে আমেরিকায় মুসলিমরা ক্রীতদাস হয়ে জীবনযাপন করায় তাদের খুব কড়া মাশুল গুণতে হয়। এর আগপর্যন্ত যখনই আরব উপদ্বীপ থেকে দূরে কোনো মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়েছে, তাদের সাথে কোনো না কোনো উপায়ে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরবের ছিল। কিন্তু সে আমলের আমেরিকান মুসলিমরা ভৌগোলিকভাবে মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র থেকে এতটাই দূরে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা থেকে এতটাই বঞ্চিত ছিল যে, পরবর্তী প্রজন্মের ভেতর ইসলামকে আর সেভাবে ধরে রাখা যায়নি। প্রতিটি প্রজন্ম তার আগের প্রজন্মের তুলনায় ইসলামের কম সংস্পর্শ পেয়েছে। তাই ১৯ শতকের মাঝামাঝি এসে নামে মাত্র যে কজন মুসলিম আমেরিকায় ছিলেন তাদের মধ্যে ইসলামের তেমন কোনো জ্ঞান ছিল না। আর ২০ শতকে এসে দেখা যায়– খুব কম মুসলিম নাতি তার দাদার ধর্ম ইসলাম সম্বন্ধে কিছু জানে; বরং তারা মূলধারার খ্রিষ্টান ধর্মেই বেশি একাকার হয়ে যায়– যা আফ্রিকান-আমেরিকান নামে নতুন একটি নৃগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটায়।

বিংশ শতকে এসে এসব ক্রীতদাসদের কারও কারও মধ্যে আবার তাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্ম চর্চা নিয়ে কিছুটা স্মৃতিচারণ দেখা যায়। সে সময়ে 'দ্য নেশন অব ইসলাম' নামে নতুন এক ধর্মীয় ধারার প্রচলন হয়, যেখানে খ্রিষ্টান ও ইসলামি ধর্মীয় আচারাদির মিশ্রণ ঘটে এবং পরিণতিতে পরবর্তীকালে নতুন করে একটি বর্ণভিত্তিক ধর্মীয় সংগঠনের জন্ম হয়; যার মূল উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল আমেরিকার কালো মানুষগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ১৯৬০ সালে দ্য নেশন অব ইসলামের কিছু প্রাক্তন সদস্য যেমন ম্যালকম এক্স, ডব্লিউ ডি মুহাম্মাদ প্রমুখ নতুন করে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যার মাধ্যমে তারা মুসলিমদের নেশন অব ইসলাম থেকে সরিয়ে বরং ইসলামের মূলধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সাথে তারা নতুন করে কালো মানুষদের মাঝে ইসলামের মূল চেতনা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেন– যা বিগত কয়েক শতাব্দীতে তাদের মধ্য থেকে ক্রমশ মুছে দেওয়া হয়েছিল।

চীন

৭ম শতকে ইসলামের আবির্ভাবের পর ৮ম শতকে যখন স্পেন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিশাল এলাকায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে, তখন নতুন নতুন এসব এলাকার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি কালক্রমে ইসলামি সংস্কৃতির সাথে মিশে নতুন এক সাংস্কৃতিক ধারার সূচনা করে। ইসলাম তখন পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সফলভাবে বিস্তার লাভ করেছে। ঠিক একই সময়ে ইসলাম চীনেও প্রবেশ করে। অন্য যেসব স্থানে ইসলাম পৌঁছেছে, সেখানে আপামর জনগণ গ্রহণ করলেও চীন কখনোই ইসলামকে সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ করেনি। চীনে মুসলিমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবেই রয়ে গেছে। যদিও এটা সত্য যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিমরা চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফান ῃ মাক্কি যুগের প্রসিদ্ধ সাহাবি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে ৬৫০ সনে চীনের তৎকালীন তাং রাজতন্ত্রের কাছে ইসলামের বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করেন। মুসলিমরা রাসূল γ-এর জীবিত থাকা অবস্থায় এবং তাঁর ওফাতের কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের অনেক স্থানেই শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হলেও চীনে মোটামুটি একটা অবস্থান তৈরি করতে প্রায় ৮ম শতক পার হয়ে যায়। তাং রাজবংশ ৭৫০-এর দশকে প্রথম চীনা সেনাবাহিনীতে কাজ করার জন্য মুসলিমদের আমন্ত্রণ জানান। তখন বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম চীনের সামরিক বাহিনী এবং প্রশাসনে কাজ করতে শুরু করে। এর পরপরই মুসলিমদের চীনা মেয়েদের বিয়ে করে সেখানেই থাকার আহ্বান জানানো হলে মুসলিমরা চীনা সমাজে সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করার সুযোগ পায়। আজ পর্যন্ত চীনা সামরিক বাহিনীতে ও প্রশাসনে মুসলিমদের কাজ করার সে ধারা অব্যাহত রয়েছে; যদিও সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে।

চীনা সমাজে বেশ সম্ভ্রান্ত পদগুলোতে যাওয়ার সুযোগ পেলেও মুসলিমদের অনেক জটিলতা ও বৈষম্য মোকাবিলা করে এগোতে হয়। চীনে প্রাচ্যের নানা ধর্ম, দর্শন বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম ও কনফুসিয়াসের তত্ত্ব জনপ্রিয়, যা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে একেবারেই ভিন্ন। এর আগে বিভিন্ন খ্রিষ্টান এলাকাতে যখন ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল মুসলিমরা সেখানকার মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অনেক মিল খুঁজে পেত। যেমন ইসলাম ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মেই হযরত ইবরাহিম, মুসা ও ঈসা ν-কে অভিন্নভাবে নবি হিসেবে মানা হয়। আদর্শ ও অনুসরণীয় হিসেবে তিন ধর্মেই তাদের শ্রদ্ধা করা হয়। কিন্তু চীনে মুসলিমরা এ ধরনের কোনো সাদৃশ্যের দেখা পায়নি। ফলে মুসলিমরা চীনের মূলধারার সমাজে একীভূত হওয়ার সুযোগও পায়নি। চীনারাও মুসলিমদের ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখত। তারপরও মুসলিম দাঈরা ইসলামি জ্ঞানের প্রসারে নানামুখী উদ্যোগ নেন। যার ফলে চীনে যারা ইসলাম গ্রহণ করত, তারা বহুদূরে থাকা ইসলামের প্রাণকেন্দ্রের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানার সুযোগ পেয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে ভৌগোলিকভাবে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে হলেও চীনে থাকা এ অল্প সংখ্যক মুসলিমও নিজেদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয় ও সত্তা নিয়েই ক্রমশ পরিণত হতে থাকে।

নিঃসঙ্গতায় থাকা চীনা মুসলিমরা ১৩ শতকের মোঙ্গল অভিযাত্রার পরপরই বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। মোঙ্গলরা যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তা যেমন একদিকে মধ্য এশিয়া ও পারস্যের মুসলিম ভূখণ্ড দখল করেছিল, ঠিক তেমনি চীনকেও তার পেটের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের সব শহর ও রাজ্যকে মোঙ্গলরা এলোমেলো করে দিয়েছিল। মানচিত্র কিংবা সীমান্তরেখা উলটপালট হয়ে গেল। বিশাল অঞ্চল অখণ্ড এক সাম্রাজ্যের এক সীমানায় এসে যায়। এ বিস্তৃত এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা যে যার মতো যেখানে-সেখানে যাতায়াত করতে পারত এবং তা করেছিলও। ফলে লাভের লাভ হিসেবে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রের লোকদের সাথে চীনের মুসলিম সম্প্রদায়ের মেলামেশার একটা সুযোগও উন্মুক্ত হয়েছিল। পাশাপাশি অনেক মুসলিম চীনে অভিবাসন করে। যার ফলে চীনের মুসলিম সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, মোঙ্গলদের কৌশলের কারণে মুসলিমরা চীনের মূলধারার সংস্কৃতিতে প্রবেশ করার কিছুটা সুযোগ পায়। ফলে চীনের সমাজ কাঠামোতে মুসলিমদের পূর্বের মতো ভিনগ্রহের মানুষ হিসেবে দেখা হয়নি। বরং তাদের সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। সেই সাথে চীনে মোঙ্গলদের যে প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদে মুসলিমরা দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছিল।

১৪ শতাব্দীতে হুংগু সম্রাট একশ শব্দের একটি স্তুতি উপাখ্যান রচনা করেন, যেখানে হযরত মুহাম্মাদ γ-এর ব্যাপক প্রশংসা করা হয়। এর কিছু অংশ কপি করে চীনের সকল মসজিদেও বিতরণ করা হয়েছিল।

চীনে মোঙ্গল শাসন এবং তারও পরে মিং রাজতন্ত্রের শাসনের সময় মুসলিমরা পুরোপুরি মূল জনধারায় সংযুক্ত হয়। তখন তাদের আর বিদেশি হিসেবে বিবেচনা করা হতো না; বরং চীনা মুসলিমদের পৃথক একটি চীনা পরিচয় দেওয়া হয়– যার নাম ছিল হুই। হুইদের সাথে চীনের মূল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হানদের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। একটাই পার্থক্য ছিল, যা মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। ফলে কয়েক শতক ধরে অবহেলিত হওয়ার পর অবশেষে চীনা মুসলিমরা স্থানীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়। তারাও তখন চীনা সংস্কৃতিকে বরণ করে নেয়, নিজেদের নামগুলোও সেভাবে নির্ধারণ করে। পাশাপাশি প্রশাসনিক কাঠামো ও সামরিক কার্যক্রমে নিয়মিত অবদান রাখার মাধ্যমে রাজবংশকেন্দ্রিক শাসনের বিকাশেও মুসলিমরা ভূমিকা অব্যাহত রাখে।

সে সময়ে চীনের বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ও আবিষ্কারক ঝেং হেই (১৩৭১-১৪৩৩) জন্মগ্রহণ করেন। ঝেং হেই ছিলেন দক্ষিণের ইউনান অঞ্চলের একজন হুই। তাকে তৎকালীন মিং রাজবংশের শাসকগোষ্ঠী যথেষ্ট সমর্থন দিয়েছিল। তারা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ঝেং হেইকে বেশ কিছু জাহাজের দায়িত্ব দেয়। ঝেং হেইর অধীনে শতাধিক জাহাজ ছিল। এর মধ্যে কিছু জাহাজ এতটা বিশাল ছিল যে, এর একটির মধ্যে কলম্বাসের জাহাজের সমান তিনটি জাহাজ তুলে নেওয়া যেত। সেই সাথে তাকে দেওয়া হয়েছিল কয়েক হাজার সেনা। এই বিশাল বহর নিয়ে ঝেং হেই বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে যেতেন, বাণিজ্য করতেন এবং নতুন নতুন দেশের সাথে চীনের মিং রাজবংশের কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। তার সেই নৌযাত্রা বর্তমান সময়ের এশিয়ার অনেক দেশ, মধ্যপ্রাচ্যের নানান বন্দর, এমনকি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছিল। তবে ঝেং হেইকে সবচেয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। কেননা, তার মাধ্যমেই গোটা মালয় অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। এ অঞ্চলে এখনও অনেক মসজিদ পাওয়া যায় যেগুলো ঝেং হেইর নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে, অবশ্য স্থানীয়ভাবে তাকে চেং হো বলেই অভিহিত করা হয়। ঝেং হেইকে শুধু যে মুসলিমরা সম্মান করত তা নয়; অমুসলিম চীনা নাগরিকদের কাছেও তিনি চীনের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাবিক ও অভিযাত্রী হিসেবে সম্মান পেয়ে থাকেন।

ভারতবর্ষ

৮ম শতকের শুরুতে সিন্ধু নদী অববাহিকায় মুহাম্মাদ বিন কাসিমের অভিযানের মাধ্যমে ইসলাম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তবে তখনও রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারেনি মুসলিমরা। সিন্ধে মুসলিমদের একটি ঘাঁটি গড়ে তোলা

হলেও তা মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র দামেস্ক ও বাগদাদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় এ এলাকায় নতুন করে আর কোনো সামরিক অভিযান পরিচালনা করা বাস্তব সম্মত ছিল না; অর্থনৈতিকভাবেও সুবিধাজনক ছিল না।

মুসলিম বিশ্বে তুর্কিদের আগমনের পর মুসলিম সক্ষমতাকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করানোর নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় গজনির সুলতান মাহমুদের (৯৯৭-১০৩০) কথা। মাহমুদ ছিলেন তুর্কি সুলতান, যার আমলে ভারতবর্ষের ভেতরের বেশ কিছু এলাকায় মুসলিমরা অভিযান পরিচালনা করে। তিনি আফগানিস্তানের গজনিতে নিজের নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সাম্রাজ্যটি ভারতীয় উপমহাদেশের নিকটবর্তী হওয়ায় তিনি এ এলাকাটি নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ভারতের উত্তরাঞ্চলে ১৭টি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, যার মাধ্যমে তার সাম্রাজ্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও শক্তি অর্জন করে। যদিও তার এসব অভিযান ভারতবর্ষের স্থানীয় শাসকরা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি! তারপরও তিনি এ এলাকাগুলোতে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে তিনি পারস্য সংস্কৃতিকে এই এলাকায় পরিচিত করে তোলার উদ্যোগ নেন। পারস্যের খ্যাতনামা কবি ফেরদৌসি, যিনি পারস্য সংস্কৃতিকে পুনর্জীবন দান করার জন্য অন্য যে কারও তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করেছিলেন এবং সেই সাথে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, ভূগোলবিদ, ইতিহাসবিদ আল বিরুনি– এই দুই মনীষী গজনির সুলতানের দরবারের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। গজনির সুলতান মাহমুদ ছিলেন চিত্রকলা ও নান্দনিকতার পৃষ্ঠপোষক। তাই তার রেখে যাওয়া কর্মকাণ্ডের কারণে ভারতে অন্য যেকোনো বিজেতা শাসকের তুলনায় তাকে তুলনামূলক ইতিবাচকভাবে স্মরণ করা হয়।

বিজ্ঞানবিষয়ক অনেকগুলো বই রচনার পাশাপাশি আল বিরুনি ভারতীয় ইতিহাসের ওপর কয়েক ভলিউম পুস্তক রচনা করেন। মধ্যযুগের ইউরোপে আল বিরুনির লেখা এ বইগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় এবং সেই অনূদিত বইয়ের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারে।

সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ছাড়াও গজনির সুলতান মাহমুদের প্রতিষ্ঠিত গজনি সাম্রাজ্য মুসলিমদের ভারত বিজয়ের ভিত্তি রচনা করে। এর পর ক্ষমতায় আসে ঘুরি গোষ্ঠী। তাদের আফগানিস্তান থেকে বহিস্কার করা হয়। তাই তারা বাধ্য হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে এবং ১১৯২ সালে দিল্লি জয় করে। ঘুরিরা ছিল তুর্কি দাস বাহিনীর ওপর নির্ভরশীল, যারা তুর্কি সেনাবাহিনীর মূল কাঠামো দাঁড় করেছিল। তা ছাড়া এই দাস সেনারাই তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের আইয়ুবি বাহিনীর ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠা করেছিল। মিশরে যেমন মূল শাসকদের হটিয়ে একসময় দাস সেনারা মামলুক শাসনের সূত্রপাত করে, ঠিক একইভাবে ভারতবর্ষের দাস সেনারাও একসময় তাদের কর্তৃপক্ষকে উৎখাত করে নিজেরা দিল্লি সালতানাত নামে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

দিল্লি সালতানাতের আওতা ভারতবর্ষে বিশাল এলাকায় বিস্তৃত হয়, যা ১২০৬ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৫২৬ সালে মোগলদের উত্থান পর্যন্ত টিকে ছিল। দিল্লি সালতানাতের তিন শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসে ৫টি দাস রাজবংশ শাসনকার্য পরিচালনা করে। এগুলো হলো মামলুক, খিলজি, তুঘলক, সাইদ ও লোদি। তখনকার রাজনৈতিক ইতিহাস এবং ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে তেমন বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে সার্বিকভাবে বলতে গেলে সে সময় কিছু রাজনৈতিক দর্শন ছিল, যা দিল্লি সালতানাতের কাঠামো গড়ে দিয়েছিল।

প্রথমত, সালতানাতটি তুর্কি দাস বংশ দিয়ে পরিচালিত হতো, মিশরের মামলুকদের মতো করে নয়। এমন কমই হয়েছে যে, পিতার মৃত্যুর পর তার সন্তান শাসনভার নিতে পেরেছে; বরং দেখা যেত, কোনো সুলতান মারা গেলে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মিলে কোনো এক জেনারেলকে তার স্থলাভিষিক্ত করত। যদি কোনো সুলতান প্রত্যাশিত মানে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হতেন, তাহলে তার অধীনরা তাকে সরিয়ে দিতে পারত। তা ছাড়া এ সালতানাতের যারা দায়িত্ব পেয়েছিলেন তারা কখনও নিজেদের খলিফা বলে দাবি করতেন না। তারা আব্বাসীয়দেরই মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসেবে মানতেন এবং নিজেদের পরোক্ষভাবে তাদেরই অধীন বলে বিবেচনা করতেন। এমনকি বাগদাদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যখন আব্বাসীয় খিলাফতের ভগ্নাংশ মিশরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তখন ভারতবর্ষের সুলতানরা মিশরে বার্তা পাঠিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে খলিফার মতামত নেওয়ার চেষ্টা করতেন। যদিও এই দুই অঞ্চলের মাঝে কয়েক হাজার কিলোমিটারের দূরত্ব ছিল। মাঝখানে হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বতমালার মতো বিশাল প্রাকৃতিক স্থাপনা ছিল। তারপরও দিল্লির সালতানাত সব সময়ই নিজেদের মুসলিম বিশ্বের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করে রাখার চেষ্টা করত; অন্তত নামকাওয়াস্তে হলেও।

দিল্লি সালাতানাতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো– এই আমলেই ইসলাম ভারতবর্ষে সবচে বেশি বিকশিত হয়। যদিও ৭ম শতক থেকেই ভারতবর্ষে আগত আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের বার্তা এখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তারপরও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে যাওয়ার জন্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য রাজনৈতিক কোনো কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা দরকার ছিল। আর তা দিল্লি সালতানাতের সময়ে এসেই সুলভ হয়। শুধু রাজনৈতিকভাবেই নয়, তাসাউফ চর্চাও এ আমলেই সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। কারণ, দিল্লি সালতানাতের সমর্থন পেয়ে সুফি-সাধকরা তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের সৌন্দর্যকে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পান। সুফি-সাধকরা ভারতবর্ষে দাওয়াত বিস্তৃতির ভালো সম্ভাবনা দেখতে পান। দীর্ঘদিন ধরে এ এলাকার মানুষ মূর্তিপূজায়

অভ্যস্ত হওয়ার কারণে তারা আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া ব্যতিরেকে কোনো ধর্মের প্রতি আলাদা করে কোনো আকর্ষণই অনুভব করছিল না। ফলে আরব ও পারস্য থেকে আসা সুফিরা তাদের সে চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। তারা আল্লাহর সাথে একটি নিবিড় আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পথ ভারতীয় জনগণের সামনে উন্মুক্ত করে দেন। ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রশান্তির ছায়ায় দলে দলে মানুষ আশ্রয় নিতে শুরু করে।

ইসলাম এখানে জনপ্রিয়তা পাওয়ার আরেকটা কারণ ছিল– এ অঞ্চলগুলোতে এর আগপর্যন্ত হিন্দুধর্মের একক প্রভাব ছিল। হিন্দুধর্মে জাতিভেদ প্রথা খুবই প্রকট। জাতিভেদ প্রথার অভিশাপে বহু মানুষ নানাভাবে নিপীড়িত হয়েছিল। ইসলামের সাম্যের অমীয় বার্তা– 'আল্লাহর কাছে সব মানুষ সমান' এই দীপ্ত ঘোষণা ভারতবর্ষের মুক্তিকামী মানুষকে নতুন আশার আলো দেখিয়েছিল। এসব সুফি এবং গুজরাট ও বঙ্গের বন্দরে আসা আরব বণিকদের যৌথ চেষ্টায় ইসলাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে জোরালোভাবে প্রচারিত হয়। এ প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম এখানকার জনগণের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নেয়। যদিও ভারতবর্ষে কখনও মুসলিমদের সংখ্যা হিন্দুদের ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

আরব বণিক ও দাঈদের প্রভাবে ভারতবর্ষে ইসলাম যতটা প্রসারিত হয়, তার চেয়ে বেশি হয় আরও পূর্বদিকে– মালয় অঞ্চলে। দীর্ঘদিন থেকেই বাণিজ্যের অন্যতম মিলনস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো এ অঞ্চল। এখানে সব সময় ভারত ও চীনকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা এসে জমায়েত হতো। চীনারা তাদের নির্দিষ্ট আমলাতান্ত্রিক কাঠামো এবং রাজকীয় মানসিকতার কারণে মালয়ের স্থানীয় মানুষের ওপর খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। আর সে সুযোগটি নেয় ভারতীয়রা। তাই প্রথম সহস্রাব্দের আগেই ভারত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের আমদানি হয় এবং সেখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষ এই দুই ধর্মদর্শনকে বরণ করে নেয়। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শ্রিবিজয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাভাতে মেডাং নামক যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়– তা এই অঞ্চলে ভারতীয় প্রভাবের নিদর্শন। কিন্তু যখন মুসলিম বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলোতে যাতায়াত ও স্থানীয় মানুষদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেল, তখন সেখানে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়।

মালয় অঞ্চল হলো এমন আরেকটি স্থান, যা ইসলামের মূল জন্মস্থান থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমেই সেখানে ইসলামের বিকাশের সূত্রপাত হয়। মুসলিম বণিকরা ইসলামের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো স্থানীয় শাসকদের সামনে উপস্থাপন করার ফলে তাদের অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইসলাম এমন প্রভাব বিস্তার করে, যা গোটা ভারত মহাসাগরকেন্দ্রিক বণিকদের একই সুতোয় জুড়ে দেয়। আরবি ভাষার মাধ্যমে নিজেদের মাঝে মতামত বিনিময় এবং যোগাযোগের নতুন সুযোগ তৈরি হওয়ায় ব্যাবসাও বিকশিত হয়। যদিও আরবের সংস্কৃতির সাথে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির সে অর্থে তেমন কোনো মিল ছিল না; অর্থনীতিই এ অঞ্চলে ইসলামের প্রভাবক হিসেবে মূল ভূমিকা রাখে। বিষয়টা এমন দাঁড়ায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো রাজা ইসলাম গ্রহণ করা মানে হলো, অর্থনৈতিকভাবে খুবই সমৃদ্ধ একটি সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হওয়া। স্থানীয় শাসকরা একে একে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেন। এভাবে একসময় গোটা এলাকা জুড়ে অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বড়ো একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।

এই শাসকদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষও ইসলামকে বরণ করতে শুরু করে। স্থানীয় লোকগাঁথা থেকে জানা যায়, প্রথমে একজন রাজা ইসলাম কবুল করতেন। পরে তার দেখাদেখি তার ঘনিষ্ঠজন, পরামর্শক এবং তারপরে গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করত। এভাবে শাসক পরিবার থেকে নিচের দিকে অর্থাৎ তৃণমূলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। এ রাজারা ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা পশ্চিম অঞ্চল থেকে অসংখ্য দাঈ ও সুফিদের দাওয়াত দিয়ে নিজেদের এলাকায় নিয়ে আসতেন এবং কাজ করার সুযোগ করে দিতেন। ফলে এখানেও ইসলাম দিল্লি সালতানাতের মতোই প্রশাসনিক আনুকূল্য পেয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে যায়। পার্থক্য এটাই ছিল যে, ভারতবর্ষে যে দাঈ ও সুফিরা আসতেন, তারা ছিলেন পারস্য অধিবাসী। অপরদিকে মালয় অঞ্চলে আগত দাঈদের অধিকাংশই ছিলেন ইয়েমেনি। এ কারণেই পূর্ব আফ্রিকা, ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় এলাকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ইমাম শাফেয়ি রহ. প্রবর্তিত শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা বেশি। তারা ইয়েমেন থেকে আগত যে দাঈদের থেকে ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিলেন শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী। অন্যদিকে, উত্তর ভারতে হানাফি মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা বেশি। কারণ, এই অঞ্চলে দাওয়াতি কাজ করা অধিকাংশ দাঈ এসেছিলেন পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার হানাফি মাযহাব প্রভাবিত অঞ্চল থেকে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামিকরণের পর সেখানে যে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর জন্ম হয়েছিল, সেগুলো মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর সাথে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে যুক্ত ছিল। প্রথম যে মুসলিম রাজ্যটির জন্ম হয়েছিল তার নাম ছিল 'পাসাই', যা সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। ১৩শ শতাব্দীতে যখন মার্কো পোলো এ অঞ্চলে ভ্রমণে আসেন, তখনও তিনি সেখানে মুসলিম প্রভাবের অস্তিত্ব দেখেছেন। পরের শতাব্দীতে যখন ইবনে বতুতা এই অঞ্চল পরিভ্রমণে আসেন, তখন তিনি এখানকার মুসলিম শাসক এবং তার সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা দেখেছেন, যা তিনি তার ভ্রমণকাহিনিতে উল্লেখ করেছেন।

পাসাই থেকে ইসলাম পূর্বদিকে মালাক্কার দিকে অগ্রসর হয়। মালাক্কায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪০০ সালের দিকে। মালাক্কা অববাহিকা দিয়ে ভারত ও চীনা বণিকরা অহরহ যাতায়াত করত। তাই মালাক্কা রাজ্য ইসলামের আওতায় আসার মাধ্যমে মূলত এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিই মুসলিমদের হাতে চলে আসে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় মালাক্কা অঞ্চলের প্রচলিত মালয় ভাষা পরবর্তীকালে আশেপাশের গোটা অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে, যার ওপর ভিত্তি করে আধুনিক মালয়েশিয়া রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনেও মালাক্কার অতীত সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব বিদ্যমান। মালাক্কার মাধ্যমে শুধু যে সাংস্কৃতিক প্রভাবই বিকশিত হয়েছে তা-ই নয়; বরং ইসলামও ছড়িয়ে গিয়েছিল ব্যাপকভাবে। মালয় আইডেন্টিটি মুসলিম পরিচয়ের সাথে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, যখনই কেউ ইসলাম গ্রহণ করত তাকে বলা হতো, 'মাসুক মেলায়া' অর্থাৎ 'তুমি এতদিনে সত্যিকারের মালয় হতে পারলে'। স্থানীয় ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে মিশে এভাবেই ইসলাম সফলতার সাথে মালাক্কা থেকে গোটা মালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর মালয়ে অনেক আগ্রাসন হয়েছিল। পর্তুগিজ, ডাচ ও ব্রিটিশরা উপনিবেশও স্থাপন করেছিল, কিন্তু মালয় অঞ্চলে ইসলামের শিকড় এমন গভীরে প্রোথিত হয়েছিল যে, এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইসলাম কখনও বিলীন হয়ে যায়নি; বরং শক্তিশালী অবস্থান নিয়েই টিকে ছিল।

দশম অধ্যায়

পুনরুত্থান

চতুর্দশ শতকের প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ও দার্শনিক ইবনে খালদুনের মতে– যেকোনো রাজত্বের একটি স্বাভাবিক মেয়াদ থাকে। সেই মেয়াদের প্রথমদিকের বছরগুলোতে রাজত্ব বিকশিত হয়। সেসময় কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকে এবং বিলাসিতার প্রতি তেমন ঝোঁক থাকে না। দ্বিতীয় প্রজন্ম প্রথম প্রজন্মের গড়ে যাওয়া ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করে। তবে দ্বিতীয় প্রজন্মের সময় প্রথমদিকের তুলনায় প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর হয়ে আসে। তারা শহুরে প্রাসাদের ভেতরে বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। ফলে প্রশাসন ও নেতৃত্বের প্রতি গুরুত্ব কমতে থাকে। তৃতীয় প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব আসার পর সে রাজত্বের চূড়ান্ত পতন অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। কারণ, তখন রাজ্যের রাজা, উজির ও অন্যান্য কর্মকর্তারা এতটাই ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে যায় যে, নীতিনির্ধারকদের অবহেলার কারণে রাষ্ট্র তখন আর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জগুলো যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারে না। তারপর আবার সেই পুরোনো চক্র, অর্থাৎ নতুন করে যোগ্য কোনো ক্ষমতাধর শক্তি ওঠে আসে, আর আগের শক্তিকে হটিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

ইবনে খালদুনের এই তত্ত্ব অনুযায়ী ১৩ শতকে এসে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষেই পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। অযোগ্য নেতৃত্ব, সামরিক অলসতা, মাত্রাতিরিক্ত ধন-সম্পদের প্রবাহ ও বিলাসিতার কারণে বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করার ক্ষমতা মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছিল। ইবনে খালদুনের তত্ত্বমতে অবশ্য পরিস্থিতি এমনটা হলে অযোগ্যকে হটিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে অন্য কারও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা; হয়েছিলও তাই। পশ্চিম আনাতোলিয়ায় প্রখ্যাত যোদ্ধা পরিবার উসমানদের মধ্য থেকে নতুন করে একটি শক্তির উত্থান হয়, যারা চতুদর্শ ও পঞ্চদশ শতকে ব্যাপকভাবে বিকশিত হয় এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের নয়া নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাদের নেতৃত্বাধীন শাসনে একদিকে যেমন স্থিতিশীলতা ছিল, ঠিক তেমনি ছিল প্রবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা। কিন্তু ইবনে খালদুনের তত্ত্বের সাথে নতুন এ সাম্রাজ্যের পার্থক্য ছিল একটাই, তা হলো– এই রাজত্ব তিন প্রজন্ম পেরিয়ে আরও অনেকটা দীর্ঘ সময় টিকে ছিল। নতুন এ পরাশক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগপর্যন্ত কার্যকরভাবে সক্রিয় ছিল।

"হে প্রিয় পুত্র, অন্য সব দায়িত্ব পালন করার আগে তোমার ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে তৎপর হও। কারণ, ধর্মীয় চেতনা দিয়েই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।"

– পুত্র ওরখানকে উদ্দেশ্য করে অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান

অটোম্যানদের ইতিহাস

মোঙ্গলদের বর্বর আক্রমণের কারণে মধ্য এশিয়ার তুর্কিরা মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। তুর্কিরা স্বভাবগতভাবে কিছুটা যাযাবর হলেও নতুন কোনো স্থানে যাওয়ার পর খাপ খাইয়ে নেওয়ার চমৎকার যোগ্যতা ছিল তাদের। এমনকি বাইজেন্টাইন নিয়ন্ত্রিত সাবেক এলাকাগুলোতেও বেশ ভালোভাবে তারা নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিল। ১০৭১ সালে মানজিকার্তের যুদ্ধে সেলজুকরা শোচনীয়ভাবে বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করার পর আনাতোলিয়াতে বসতি স্থাপন করার সুযোগ পায়। ১৩ শতকে যখন মোঙ্গলরা এ এলাকায় প্রবেশ করে, তখন সেলজুকদের যতটুকু যা চিহ্ন ছিল, তা-ও চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। আর বেশ কিছু তুর্কি গোষ্ঠী আনাতোলিয়ার বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্তভাবে শাসন করতে শুরু করে। ছোটো ছোটো এ রাজ্যাংশগুলোকে বলা হতো 'বেইলিক'। আর এ রাজ্যগুলোর মূল ভিত্তি ছিল ক্যারিশম্যাটিক সামরিক নেতৃত্ব। যাদের বলা হতো 'বে'।

এরকমই একজন বের নাম ছিল উসমান। আনাতোলিয়ায় অসংখ্য বেইলিক থাকলেও তিনি ছিলেন সেই মহানায়ক, যিনি পরবর্তী সময়ে বিশ্ব ক্ষমতার অন্যতম শক্তিশালী শাসক হিসেবে আবির্ভূত হতে পেরেছিলেন। কেন তিনি এতটা সফলতা পেলেন, এর কারণ সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। তবে বাস্তবতা এমন ছিল যে, তার বেইলিকটা ছিল একেবারে বাইজেন্টাইনের সীমানা ঘেঁষে। তাই অন্য সব বেইলিকের তুলনায় তার বেইলিক ভৌগোলিকভাবে ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাইজেন্টাইনরা তখন মূলত একটি ছায়া হিসেবেই টিকে ছিল। একসময়ের চরম প্রতাপশালী বাইজেন্টাইন সাম্রাজের হাতে বলতে গেলে তখন কিছুই ছিল না। ১৪ শতকের শুরুতে এসে তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল শুধু কনস্টান্টিনোপল, গ্রিস আর বলকানের কিছু অংশ। ১২০৪ থেকে ১২৬১ সাল পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল ছিল ল্যাটিনদের নিয়ন্ত্রণে। তখনই বাইজেন্টাইনের বুকে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, তারা আসলে সে ক্ষতটুকু সারিয়ে তুলতে পারেনি। উসমান বাইজেন্টাইনদের এ দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং ক্রমাগতভাবে বাইজেন্টাইনের ভেতরের দিকে নিজের আধিপত্য প্রসারিত করে যাচ্ছিলেন। মোঙ্গলদের হাত থেকে বাঁচতে মুসলিম বিশ্বের অনেক এলাকা থেকে মুসলিমরা পঙ্গপালের মতো তার রাজ্যে প্রবেশ করছিল। উসমানের সামরিক শক্তিমত্তাকে তারা আশ্রয় ধরে নিয়েছিল। এসব উদ্বাস্তু মুসলিমরা উসমানের সামরিক অভিযানগুলোতে যোগ দেওয়ায় তার শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় উসমান ও তার সঙ্গীরা শত্রুদের বিরুদ্ধে ইসলামের জন্যই ক্রমাগত অভিযান চালানোর প্রেরণা পায়। কারণ, তাদের সামনে সেই শত্রুদেরকেই পরাস্ত করার সুযোগ ছিল, যাদের বিরুদ্ধে পূর্বসূরি খুলাফায়ে রাশেদা, উমাইয়া এবং আব্বাসীয়রা শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধ করেছিল।

উসমানীয় বা অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় ১২৯৯ সালে। যদিও সঠিক সন-তারিখ নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। উসমান এবং তার পুত্র ওরখান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অনেকগুলো শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। তাই অটোম্যান গড়পড়তা অন্যান্য বেইলিককে ছাড়িয়ে

একটি রাষ্ট্রের কাঠামো ধারণ করে। ১৩২৬ সালে উসমান ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের আগেই অটোম্যানরা বুরসা দখল করে। সেখানেই অটোম্যানরা তাদের প্রথম রাজধানী স্থাপন করে। ওরখানও তার পিতার আদর্শ ধারণ করে চলতে থাকেন। তিনি মার্মারা সাগরের তীর ঘেঁষে গোটা এলাকাতে বাইজেন্টাইনদের তাড়া করে ফিরেন। কনস্টান্টিনোপল ছিল এই এলাকাগুলো থেকে মাত্র ১শ কিলোমিটার দূরে। আনাতোলিয়া জুড়ে বাইজেন্টাইনদের নির্মিত শহরগুলোর সবই ছিল নগরস্থাপনা কেন্দ্রিক। সেগুলোর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভালো ছিল।

এর আগে দীর্ঘ সময় ধরে ছোটো ছোটো অভিযান পরিচালনার কৌশল নিয়ে তুর্কিরা বেশ উপকার পেলেও অটোম্যানরা সে ধারা থেকে বেরিয়ে আসে। বরং তারা প্রতিপক্ষের শহরগুলোকে অবরোধ করে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার কৌশল অবলম্বন করে। বাইজেন্টাইনরা চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু থেকে বলকান এলাকায় নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের মধ্যে থাকায় আগে থেকেই তারা ঝামেলায় ছিল। তাই এশিয়ার সামরিক ঘাঁটিগুলোকে তারা আর রক্ষা করতে পারেনি। অন্যদিকে, বাইজেন্টাইনদের এ দুর্বলতার সুযোগে অটোম্যানরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। বাইজেন্টাইনরা যত দুর্বল হয়, অটোম্যানরা যেন ততটাই সবল হয়ে ওঠে। ১৪শ শতকের প্রথম কয়েক দশকের মধ্যেই অটোম্যানরা একটি ছোটো গোত্র থেকে যাত্রা শুরু করে বড়ো আকারের একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অটোম্যানদের শক্তি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, এক সময়ের মহাপ্রতাপশালী বাইজেন্টাইনের রাজা এডরোনিসাস ১৩৩৩ সালে বাধ্য হয়ে ওরখানের সাথে আলোচনায় বসেন। বাইজেন্টাইনের সর্বশেষ কয়েকটা দুর্গকে রক্ষা করার বিনিময়ে অটোম্যানদের বড়ো আকারের অর্থ দিতেও তিনি রাজি হন।

১৪ শতকেই অটোম্যান সেনারা কনস্টান্টিনোপলের একেবারে কাছে এমন কিছু এলাকায় পৌঁছে যান, যেখানে ৭শ বছর আগে উমাইয়া শাসনামলে মুসলিমরা সর্বশেষ পা রেখেছিল। ১৩৫০ সালে অটোম্যানরা দার্দানেলিস প্রণালি পার হয়ে সর্বপ্রথম ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অটোম্যান সম্রাট সুলতান ওরখান এবং পরবর্তী সময়ে তারই সন্তান প্রথম মুরাদ থ্রেসের কিছু অংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কিরা তাদের যাযাবর ঐতিহ্যের কারণে খুব সহজেই ইউরোপের নানা গোত্র ও পরিবারের ভেতর নিজেদের গ্রহণযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা ইউরোপের নতুন নতুন অধিকৃত এলাকায় একের পর এক শহর প্রতিষ্ঠা করতে থাকে।

একটি সামান্য বেইলিক থেকে ১৪শ শতকে অটোম্যানরা যেভাবে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়, তার পেছনে মূল কারণ ছিল অটোম্যানদের আদর্শিক ঐতিহ্য। অটোম্যানদের কাছে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ ছিল অনেকটা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের মতো। যে গাজিরা (সত্য পথের সেনা) উসমান, ওরখান এবং মুরাদের অধীনে যুদ্ধ করত, তারাও বিশ্বাস করত– তারা সোনালি যুগের মুসলিম মুজাহিদিনদের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। কারণ, তারাও বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। নিজেদের সত্য পথের পথিক ও আমানতদার হিসেবে অবস্থান তৈরি করায় অটোম্যান সুলতানরা সফলতার সাথে অনেককে নিজেদের অভিযানে শামিল করতে পেরেছিলেন। মোঙ্গলদের আক্রমণে মধ্যপ্রাচ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় মারাত্মক সংকটে পড়ে গিয়েছিল মুসলিমরা। ঠিক তখন ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার যে তাড়না, তা নিঃসন্দেহে অটোম্যানদের প্রেরণা জোগাচ্ছিল। কারণ, শুধু ইসলামের চেতনার মাধ্যমে একতাহীন মুসলিম শক্তিকে আবারও একতাবদ্ধ করা সম্ভব ছিল।

অটোম্যানরা তাদের ক্ষমতার সম্প্রসারণ করার প্রক্রিয়ায় ইসলামের মূল ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার ওপর যেমন জোর দিত, ঠিক একইভাবে ইসলামের যুদ্ধনীতিকেও তারা নিজেদের ওপর প্রয়োগ করেছিল। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আবু বকর η উত্তরের বাইজেন্টাইনদের মোকাবিলার জন্য যখন সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সেনাদের সেসময় কঠোরভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন, যাতে কোনো বেসামরিক নাগরিকের ক্ষতি করা না হয় এবং কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেন নষ্ট করা না হয়। অটোম্যানরাও সেই নীতি অনুসরণ করেছিল। নিজেদের সাম্রাজ্যে থাকা অমুসলিমদের প্রতি অটোম্যানরা ছিল সহনশীল। অটোম্যান সেনারা পরবর্তী সময়ে যখন ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তারা কোনো গ্রামের ওপর আক্রমণ চালায়নি, যতক্ষণ না সে গ্রামবাসী তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলত। অটোম্যানরা এসময় ধার্মিক খ্রিষ্টানদের যে পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়েছিল, তা ছিল ল্যাটিন ক্রুসেডারদের আচরণের পুরোই বিপরীত। ক্রুসেডার খ্রিষ্টানরা কখনও মুসলিমদের মতো সহনশীল ছিল না; বরং তারা এক শতাব্দী আগে যখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, তখন সেখানে হত্যা আর ধর্ষণের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে অটোম্যানদের রীতিমতো ভদ্র-সজ্জন সেনাই বলা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে সেসময় যে অভিজাত খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ছিল, তারা অটোম্যান সেনাদের আগ্রাসনের মুখে পশ্চিমে থাকা ক্যাথলিকদের সাহায্য কামনা করেছিল। কিন্তু সেখানকার সাধারণ ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা চায়নি, তাদের ওপর আবারও ল্যাটিনরা রাজত্ব করুক। তারা বরং গোপনে বা প্রকাশ্যে অটোম্যানদেরই সমর্থন করত। অটোম্যানরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যে চর্চা করত, তা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় আঙ্গিক থেকেই খ্রিষ্টান অধ্যুষিত ইউরোপে অটোম্যানদের বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল।

প্রাথমিকভাবে অটোম্যানদের সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারণ হয় সুলতান প্রথম বায়েজিদের (১৩৮৯-১৪০২) আমলে। তার সেনারা তাকে 'ইলদিরিম' বা বিদ্যুৎ চমক হিসেবে অভিহিত করত। কারণ, তিনি তার সেনাবাহিনীকে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অভিযানে পাঠাতে পারতেন। তিনি যদি বছরের ৬ মাস ইউরোপে সেনাবাহিনীকে কাজে লাগাতেন, তাহলে বাকি ৬ মাস তাদের দিয়ে এশিয়ায় থাকা বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী তুর্কি বাহিনী এবং মোঙ্গলদের প্রতিহত করতেন। তিনি ইউরোপের বিশাল এলাকাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে

নিয়ে আসেন। যা ১৯ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়া পর্যন্ত অটোম্যান কর্তৃত্বাধীনে ছিল। তিনি সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও গ্রিস জয় করেন। তার সময়ে অটোম্যানরা সর্বপ্রথম দানিয়ুব নদী পার হয়ে ওয়ালাচিয়ায় পৌঁছায়। কনস্টান্টিনোপলও প্রথম বায়েজিদ অবরোধ করেন; যদিও এ শহরটিকে নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার সৈন্য বা সমরাস্ত্র তখনও অটোম্যানদের কাছে ছিল না। কনস্টান্টিনোপলকে নিয়ন্ত্রণে না নিতে পারলেও অটোম্যানরা সেসময়ে মুসলিম বিশ্ব এবং ইউরোপে সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

অটোম্যানদের ক্রমবর্ধমান শক্তি তৎকালীন আরেকজন মুসলিম শাসকেরও চোখে পড়ে। তিনিও পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন। সেই শাসক হলেন তৈমুর। মোঙ্গল এই শাসক তখন মধ্য এশিয়া ও পারস্যকে শাসন করতেন এবং স্বপ্ন দেখতেন, তার হাত দিয়েই মোঙ্গলরা একদিন আনাতোলিয়া জয় করবে। যদিও তৈমুর মুসলিম ছিলেন, কিন্তু তার যুদ্ধনীতি ছিল অনেকটা অমুসলিম ক্রুসেডারদের মতোই। তিনি যেখানে যেতেন প্রচুর ধ্বংসযজ্ঞ চালাতেন, গণহত্যা করতেন। তিনি চেঙ্গিস খানের প্রতিষ্ঠা করা মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সোনালি দিন আবারও ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখতেন। তা করতে হলে অটোম্যানদের বিলুপ্ত করা ছাড়া তার সামনে বিকল্প কোনো পথ ছিল না। ১৪০২ সালে আঙ্কারার যুদ্ধে বায়েজিদের নেতৃত্বে অটোম্যানরা তৈমুরের মুখোমুখি হয়। ইউরোপের অনেক রাজ্য থেকে খ্রিষ্টানরা অটোম্যান বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা তৈমুরের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। প্রথম বায়েজিদকে আটক করে তৈমুরের সাম্রাজ্যের রাজধানী সমরখন্দে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, অটোম্যান সাম্রাজ্যকে তৈমুর প্রথম বায়েজিদের চার সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দেন। তার আশা ছিল, সাম্রাজ্যের আধিপত্য নিয়ে চার ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে থাকবে। ফলে তাদের হাত দিয়েই অটোম্যান রাজত্বের চূড়ান্ত অবসান হয়ে যাবে, হয়েছিলও তাই।

১৫শ শতকে ইয়েমেনি মুসলিমরা প্রথম কফি আবিষ্কার করে। যখন অটোম্যান সাম্রাজ্য বিকশিত হয়ে আরব উপদ্বীপের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে, তখন উত্তরের ইস্তাম্বুলে কফির ব্যবহার শুরু হয়। ইস্তাম্বুল থেকে পরবর্তী সময়ে ইউরোপের সর্বত্র কফির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তী ১১ বছর গোটা অটোম্যান সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ লেগে ছিল। বায়েজিদের চার সন্তান ইসা, মুসা, সুলায়মান ও মুহাম্মাদ– প্রত্যেকেই পৃথক সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন, যারা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন ময়দানে নিজেদের বিরুদ্ধে বারবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অটোম্যান সাম্রাজ্যের বড়ো সংকট রাজপরিবারের মধ্যেই প্রকটভাবে ধরা পড়ে। কীভাবে পরবর্তী সুলতান নিয়োগ হবে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে ছিল না। অটোম্যানরা বিশ্বাস করত, সুলতানের ছেলেদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে যোগ্য তিনি পিতার মৃত্যুর পর কোনো না কোনোভাবে এগিয়ে আসবেন এবং সিংহাসনের অধিকারী হবেন। এতেই নিশ্চিত হবে, সবচেয়ে যোগ্য সন্তানই সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে, যার ফলে সাম্রাজ্য ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কিন্তু কার্যত হলো ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। কোনো একজন সুলতান মারা গেলেই তার সন্তানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। ১৭ শতকে সুলতান প্রথম আহমাদ উত্তরাধিকার নিয়োগসংক্রান্ত আইন জারি করার পূর্ব পর্যন্ত এই গৃহযুদ্ধের সিলসিলা অব্যাহত থাকে।

১৫ শতকের প্রারম্ভিকা জুড়ে বায়েজিদের চার সন্তান নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে থাকে, যা তাদের মৃত্যু অবধি টেনে নিয়ে যায়। অবশেষে ১৪১৩ সালে সব ভাইকে হারিয়ে মুহাম্মাদ বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি তার পিতার গড়া বিশাল সাম্রাজ্যকে নিজের একক নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। মুহাম্মাদ কীভাবে সামরিকভাবে এ শক্তি অর্জন করলেন, সে পর্যালোচনা জরুরি নয়। তার উদ্যোগের মাধ্যমেই অটোম্যানরা ১১ বছরের গৃহযুদ্ধের যুগ পার করে আবারও সাম্রাজ্য পুনর্নির্মাণে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পায়। অটোম্যানদের পুনরুত্থানের পেছনে মূল কারণ ছিল– পুরো ১৪ শতক জুড়ে অটোম্যানরা অনেকগুলো কার্যকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে পেরেছিল। আর ইসলামের চেতনার কাছাকাছি থাকায় গৃহযুদ্ধের পর যখন মুহাম্মাদ বিজয়ী হিসেবে ক্ষমতায় আরোহণ করেন, তখন অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী তুর্কিরাও তার কাছে এসে আনুগত্য স্বীকার করে। অটোম্যানরা আরেক দফা বিপর্যয়ের হাত থেকে ওঠে আসায় বলকান এবং আনাতোলিয়ার মুসলিম জনবলও তাদের ব্যাপারে আস্থাশীল হয়ে ওঠে। তারা সুলতান মুহাম্মাদের অধীনে আবারও একত্রিত হয়ে বাইজেন্টাইন এবং খ্রিষ্টান পরাশক্তিদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী মুসলিম বাহিনী গঠন করে।

অন্যদিকে অর্থনীতিতে অটোম্যানরা সমবায় কৌশল চালু করে, যা তুর্কিদের অর্থনৈতিকভাবে নতুন পরিচয় নিশ্চিত করে। গোটা অটোম্যান সাম্রাজ্য জুড়ে অসংখ্য সমবায় চালু হয়। এগুলোকে বলা হতো 'আখি'। আখি সমবায় সংঘের মাধ্যমে সব রকমের উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হতো। আখিগুলো আধ্যাত্মিক চেতনায় ছিল সমৃদ্ধ। তাই এখানে যেমন বাণিজ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো, ঠিক ততটাই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ববোধসহ নানা ইস্যুতে আধ্যাত্মিক সাধনা করার ওপরও তাগিদ প্রদান করা হতো। এ আখির ওপর ভিত্তি করে অটোম্যান অর্থনীতির একটি শক্তিশালী কাঠামো তৈরি হয়। সেই সাথে সামরিক অভিযানও নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হতো, যা সাম্রাজ্যের পরিধিকে বিস্তৃত করতে থাকে।

সুলতান ওরখানের আমলে সেনাবাহিনীতে একটি অভিজাত সেনা সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যারা সরাসরি সুলতানের তত্ত্বাবধানে কাজ করত। এই সেনাদেরকে বলা হতো 'জানিসারি'। জানিসারি শব্দটা এসেছে তুর্কি শব্দ 'এনিসেরি' থেকে, যার অর্থ হলো নতুন সেনা। সুলতান বায়েজিদের সময় এসে জানিসারির সংখ্যা হাজার পার হয়ে যায়। মূলত খ্রিষ্টান অধ্যুষিত বলকান থেকে এ সেনাদের নিয়োগ দেওয়া হতো। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে আসা জানিসারি সদস্যরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একই সুতোয় গেঁথে যেত। একই সাম্রাজ্যের অধীনে কাজ করত। তারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায়, তাদের দিয়ে সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজও সহজ হতো। অটোম্যানদের গড়া প্রতিষ্ঠানে ও প্রশাসনিক কাঠামোতে গ্রিক, সার্বিয়ান, আলবেনিয়ান, বুলগেরিয়ানসহ অনেক জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা স্বাচ্ছন্দ্যে অংশগ্রহণ করত এবং ভূমিকা রাখত। যা ইতিপূর্বে গ্রিক বাইজেন্টাইন বা ক্যাথলিক ল্যাটিনদের শাসনামলে দেখা যায়নি।

১৪১৩ সালে মুহাম্মাদ গোটা সাম্রাজ্যকে একত্রিত করেন। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের সময় (১৪২১-১৪৪৪ এবং ১৪৪৬-১৪৫১) অটোম্যান সাম্রাজ্যে বাইজেন্টাইনদের ভূমি অন্তর্ভুক্তিকরণ আগের মতোই চলতে থাকে। ফলে একসময় কনস্টান্টিনোপল ছাড়া সবখানেই তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ একবার সর্বশেষ এই বাইজেন্টাইন ঘাঁটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু শহরের প্রকাণ্ড প্রতিরক্ষা দেওয়ালের কারণে তিনি সফল হতে পারেননি। ফলে শহরটি জয় করার ভার গিয়ে পড়ে তার সন্তানের ওপর, যার নাম দ্বিতীয় মুহাম্মাদ। আর তিনি কয়েক শতক ধরে চলা কনস্টান্টিনোপল জয়ের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেন। তাই ইসলামের সামরিক নেতাদের ইতিহাসে দ্বিতীয় মুহাম্মাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

অটোম্যানদের বিজয়কেতন

১৪৫১ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ অটোম্যান সাম্রাজ্যের মসনদে আরোহণ করেন। ততদিনে সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং আনাতোলিয়ায় শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অটোম্যান সাম্রাজ্য তখন নানা জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদার ও ক্ষমতাধর শক্তি হিসেবেও প্রমাণিত। আর মুহাম্মাদের চেয়ে অধিক কোনো যোগ্য ব্যক্তি তখন ছিল না, যে অটোম্যানদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তার গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে ৬টি ভাষার প্রচলন ছিল। আর সুলতান মুহাম্মাদ এই ৬টি ভাষাতেই পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইসলামের শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যারা ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতেন, তাদের নানাভাবে পুরস্কৃত করতেন তিনি। অটোম্যান সাম্রাজ্য ভৌগোলিক ও বাস্তবিকভাবেই ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করেছিল। আর তাই মুহাম্মাদ এ দুই সভ্যতা থেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করেছিলেন। তার দরবারে আলিম ও খ্রিষ্টান স্থাপত্য শিল্পী উভয়েই সম্মানিত হতো। মুহাম্মাদ ছিলেন তার পূর্বসূরি মুসলিম শাসক হারুন-অর-রশিদ এবং সালাহউদ্দিনের দারুণ ভক্ত। কারণ, এ দুজন শাসকও একই সাথে জ্ঞান, নেতৃত্ব ও সামরিক কার্যক্রমে পারদর্শী ছিলেন।

তবে মুহাম্মাদের দুটো দুর্বল দিক ছিল। একটি ছিল তার অনভিজ্ঞতা। তিনি যখন ক্ষমতায় বসেন, তখন তার বয়স ছিল খুব কম। তাই তার বাবার আমলে যে পুরোনো সভাসদরা ছিলেন, তারা ঠিক তার যোগ্যতা ও সক্ষমতার ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেননি। বস্তুত, মুহাম্মাদ এর আগেও একবার সিংহাসনে বসার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, আর তা ছিল মাত্র ১২ বছর বয়সে। তখন তার পিতা স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ সেইবার দরবারের সবার সহযোগিতা পাননি; বরং প্রধান উজির নিজেই ষড়যন্ত্র করে মুহাম্মাদকে উৎখাত করে আবারও তার পিতাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার মুহাম্মাদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন দরবারের সিনিয়র সদস্য সহ অনেকের মধ্যে সংশয় ছিল যে, মুহাম্মাদ আদৌ এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না! তাই মুহাম্মাদ উপলব্ধি করলেন, সকলের আস্থাভাজন হতে হলে তাকে একটি অসাধ্য সাধন করতে হবে, আর তা হতে পারে– কনস্টান্টিনোপল বিজয়। কনস্টান্টিনোপলের অবস্থান ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের একেবারে মাঝখানে। যদিও এক সময়ের দুর্দান্ত প্রতাপশালী কনস্টান্টিনোপল তখন অনেকটাই দুর্বল। তবুও তারা মাঝে মাঝেই অটোম্যানদের ব্যবসায়ী ও সামরিক অভিযাত্রার পথে বাধা সৃষ্টি করত। তাই বাস্তবতার কারণেই কনস্টান্টিনোপল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি ছিল। প্রায় ৮শ বছর আগে রাসূলুল্লাহ γ বলে গিয়েছিলেন, মুসলিমরা একদিন কনস্টান্টিনোপল জয় করবে এবং সেই মুসলিম বাহিনীর যিনি নেতা হবেন, তিনি হবেন অসাধারণ এক সেনাপতি। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই রাসূল γ-এর সে ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন সুলতান মুহাম্মাদ। তার চিন্তাভাবনা এমন ছিল যে, কনস্টান্টিনোপল জয় করতে পারলে একদিকে যেমন অটোম্যান সাম্রাজ্য আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, ঠিক তেমনিভাবে সুলতান হিসেবেও তার অবস্থান সুদৃঢ় হবে।

কনস্টান্টিনোপলের শক্তি কমে গেলেও শহরটির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তখনও এমন ছিল, যা সহজে জয় করা সম্ভব ছিল না। শহরটি তিন দিক থেকেই সাগর দিয়ে ঘেরা। আর যেদিকে স্থলভাগ, সে অংশে প্রকাণ্ড থিওডোসিয়ান দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এ দেওয়াল পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মাণ করা হয়েছিল। দুর্ভেদ্য এ দেওয়ালটি দুটো পৃথক সারির দেওয়াল দিয়ে নির্মিত, যার প্রতিটি অংশ উচ্চতায় ১২ মিটার এবং প্রস্থে ছিল ৬ মিটার। বিগত এক হাজার বছর অসংখ্য বাহিনী এই দেওয়াল ভেদ করে কনস্টান্টিনোপল জয় করতে চেয়েছে। এমনকি ৭ম শতকে উমাইয়া আমলে মুসলিম সেনারাও এ শহরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল, কিন্তু জয় করতে পারেনি। মুহাম্মাদের আগে অটোম্যান সম্রাট সুলতান

প্রথম বায়েজিদ এবং দ্বিতীয় মুরাদও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারাও পারেননি। মুহাম্মাদ জানতেন, তাকে যদি রাসূলুল্লাহ γ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কনস্টান্টিনোপল জয় করতে হয়, তাহলে তার নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। পাশাপাশি দক্ষ সেনাবাহিনীও প্রস্তুত করতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, কনস্টান্টিনোপল শহরের কয়েক কিলোমিটার উত্তরে বসফরাস প্রণালির ওপর মুহাম্মাদ একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এর আগে তার প্রপিতামহ প্রথম বায়েজিদও এরকম একটি স্থাপনা নির্মাণ করেছিলেন। দুর্গ দুটিকে কাজে লাগিয়ে অটোম্যানরা প্রথমে নৌপথের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং এর মাধ্যমে সাগরপথে বাইজেন্টাইনদের সহায়তা পাওয়ার পথ রুদ্ধ করে ফেলে। কনস্টান্টিনোপল শহরের সেই প্রকাণ্ড দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুহাম্মাদ হাঙ্গেরির এক প্রকৌশলীর সাহায্য নেন। তার সহায়তায় তৎকালীন সবচেয়ে বিশাল কামান নির্মাণ করেন। অটোম্যানদের অবশ্য আগে থেকেই গান পাউডার সম্পর্কে জানাশোনা ছিল। কারণ, কয়েক বছর আগেই তারা চীনের সাথে যুদ্ধে গান পাউডার ব্যবহার করেছিল। তবে এরপরের অন্য সামরিক অভিযানে তারা গান পাউডারকে সে মাত্রায় আর ব্যবহার করেনি। মুহাম্মাদের কামানটি লম্বায় ছিল ৮ মিটার এবং এটা প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরত্বে ২৫০ কেজি ওজনের আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে পারত। দুর্ভেদ্য সেই দেওয়ালটি ভাঙতে এত বড়ো ও শক্তিশালী কামানের কোনো বিকল্প ছিল না। এর পাশাপাশি ইউরোপ ও এশিয়া থেকে তার সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ করে এক লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী তৈরি করেন। বলকান থেকে অনেক খ্রিষ্টানকেও বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুহাম্মাদ আসলে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। যদি এত বিশাল প্রস্তুতি নেওয়ার পরও কনস্টান্টিনোপল জয় করা না যেত, তাহলে পরিণতিতে হয়তো অটোম্যান সাম্রাজ্যই ধ্বসে পড়ত।

অন্যদিকে, কনস্টান্টিনোপলের অভ্যন্তরে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন বেড়ে গিয়েছিল, যা তরুণ অটোম্যান সুলতানের জন্য ছিল আশীর্বাদ। তৎকালীন বাইজেন্টাইন সম্রাট একাদশ কনস্ট্যানটাইন বিশ্বাস করতেন, কনস্টান্টিনোপল শহরকে যদি কোনো শক্তি অবরোধ করে, তাহলে তা থেকে বাঁচতে তাদের ক্যাথলিক চার্চের সহযোগিতা নিতে হবে। যদিও কনস্টান্টিনোপলের অনেকেই ১৩ শতকে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে বিরক্ত ছিল। সেই সাথে শহরের গোঁড়া খ্রিষ্টানরাও পশ্চিম থেকে সাহায্য নেওয়ার বিরোধী ছিল। এ বিভাজনগুলোর কারণে শহরটির পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল। ইতালি থেকে একটি বাহিনী কনস্টান্টিনোপলকে রক্ষা করার জন্য রওনা হয়েছিল, কিন্তু তাতেও শহরটির শেষ রক্ষা হয়নি।

১৪৫৩ সালের এপ্রিলে মুহাম্মাদের সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপল শহরের সেই দুর্ভেদ্য দেওয়ালের কাছে পৌঁছে যায়। শহরের কয়েক হাজার সেনা দুর্গ থেকে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলারও চেষ্টা করে। কিন্তু বারবার কামান দাগানো, নানাভাবে শহরের দেওয়াল টপকানোর চেষ্টা এবং দুই কিলোমিটার দূর থেকে কামানের গোলা নিক্ষেপের ক্ষমতা থাকায় অটোম্যানরা একসময় সফল হয়। ২৯ মে ১৪৫৩, মুসলিমরা চূড়ান্তভাবে কনস্টান্টিনোপল জয় করতে সক্ষম হয়। মুহাম্মাদের নামের সাথে 'ফাতিহ' বা বিজয়ী উপাধি যুক্ত হয়ে যায় এবং মুহাম্মাদ কনস্টান্টিনোপলকেই তার সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করেন। ফলে মুহাম্মাদের কোনো দুর্বলতা আর তেমনভাবে সামনে আসেনি। সেইসাথে গোটা মুসলিম বিশ্বেই মুহাম্মাদের সুনাম ও সাহসিকতার কথা ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, মুহাম্মাদ হচ্ছেন সেই বীরোচিত সমরনায়ক, যিনি ৮শ বছর আগে নবিজি γ-এর করে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। সে মুহূর্তে অটোম্যানদের অবস্থান সন্দেহাতীতভাবে মুসলিম বিশ্বের একেবারে শীর্ষে চলে আসে। এই ঘটনার ১৯৫ বছর আগে যখন বাগদাদের পতন হয়, তখন মুসলিমরা ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। কনস্টান্টিনোপল জয়ের মাধ্যমে মুসলিমরা যেন আবার ইতিহাসের নতুন মাহেন্দ্রক্ষণে প্রবেশ করল।

যদিও মুহাম্মাদ কনস্টান্টিনোপল জয় করেছিলেন, কিন্তু তিনি শহরের বাসিন্দাদের ওপর ইসলামকে চাপিয়ে দেননি। জোরাজোরির কোনো চেষ্টাও করেননি। ফলে শহরের অধিবাসীরা কনস্টান্টিনোপল বিজয়াভিযানের পরও নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ পেতে থাকে।

অটোম্যানদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়কে পুরোনো কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে নিছক একটি সামরিক বিজয় হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। কারণ, এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষেই শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর সাম্রাজ্য হিসেবে মুসলিমদের পুনরুত্থান ঘটে। খুলাফায়ে রাশেদা এবং উমাইয়া খিলাফতের পর আবারও মুসলিমরা একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ স্থান জয় করতে সক্ষম হলো। এর আগে ইসলামের অগ্রযাত্রার প্রাথমিক সময়ে মুসলিমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহর যেমন দামেস্ক, সিটেসিফন, টলেডো ইত্যাদি জয় করেছিল এবং ইসলামি ও স্থানীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণ করেছিল। কনস্টান্টিনোপলে (যাকে পরবর্তীকালে 'ইস্তাম্বুল' নামকরণ করা হয়) অটোম্যানরা যেন সে পুরোনো দিনগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। অটোম্যানদের নতুন রাজধানীতে বাইজেন্টাইন, রোমান ও গ্রিক সংস্কৃতি যেন ইসলামের আবহে নতুনভাবে এবং নতুন রূপে বিকশিত হয়। আজ পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলের আকাশে সেই সাংস্কৃতিক মিশ্রণের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হয়ে টিকে আছে হাজিয়া সোফিয়া– যা ৬ষ্ঠ শতকে বাইজেন্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান নির্মাণ করেছিলেন। এই চার্চটি শতাব্দীর পর শতাব্দী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টানদের আধিপত্যের নিদর্শন হয়ে টিকে ছিল। মুসলিমদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর এটাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হলেও শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসেবেই রেখে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি এই স্থাপনার ওপর থাকা গম্বুজটিকেও বহাল রাখা হয়, যা অটোম্যান স্থপতিদের জন্য উৎসাহের নিদর্শন বহন করেছে। পরবর্তী সময়ে অটোম্যান সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ, সুলায়মান দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট এবং প্রথম

আহমাদ কনস্টান্টিনোপলে বিশাল বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদগুলোর গম্বুজের ধারণা সেখান থেকে নেওয়া হয় এবং তার সাথে সাদৃশ্য রেখেই বানানোর চেষ্টা করা হয়। মসজিদগুলোতে অসংখ্য মিনার নির্মাণ করা হয় এবং এর ভেতরে ইসলামি ক্যালিগ্রাফি দিয়ে সুন্দর সুন্দর নকশা করা হয়।

ইসলামের পূর্ববর্তী ইতিহাসের মতো কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে শুধু একটি সভ্যতাকে পালটিয়ে আরেকটি সভ্যতার স্থাপন করা হয়নি; বরং নতুন ও পুরোনো সভ্যতার ওপর ভিত্তি করে নতুন আরেকটি সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে তোলা হয়।

অটোম্যানদের সোনালি যুগ

অটোম্যান সুলতানরা সামরিকভাবে সাম্রাজ্যকে সফলতার সাথে এগিয়ে নিতে থাকেন। বেশ স্বল্প সময়ের মধ্যেই সার্বিয়া, বসনিয়া, মলদোভা এবং আলবেনিয়াতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতাকা উড়তে দেখা যায়। সুলতান মুহাম্মাদের জীবনের শেষ দিনগুলোতে রোম জয় করার অভিপ্রায়ে ইতালিতে অভিযান চালানো হয়; যদিও মাঝপথেই ১৪৮১ সালে খবর আসে যে সুলতান ইন্তেকাল করেছেন। ফলে সে অভিযানটি আর সম্পন্ন করা যায়নি। তার পরবর্তী উত্তরসূরি সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ ও প্রথম সেলিমের শাসনামলেও অটোম্যান সাম্রাজ্যের সামরিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। সুলতান প্রথম সেলিম ক্ষমতায় ছিলেন ১৫১২ থেকে ১৫২০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র ৮ বছর। কিন্তু এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই অটোম্যানরা পারস্যের শক্তিশালী সাফাভি রাজতন্ত্রকে পরাজিত করে এবং মিশরের গোটা মামলুক সাম্রাজ্যকে অটোম্যান শাসনের আওতায় নিয়ে আসে। ফলে মুসলিমদের একেবারে চিরচেনা সবগুলো অঞ্চল বিশেষত সিরিয়া, মিশর, জেরুসালেম সবই অটোম্যানদের পতাকাতলে এসে যায়। আর তখন থেকেই অটোম্যান সাম্রাজ্য ধর্মকেন্দ্রিক কার্যক্রমে আরও ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হয়। মক্কা, মদিনা ও জেরুসালেম– এ তিন পবিত্র শহরের জিম্মাদারির দায় চলে আসে অটোম্যান সুলতানের ওপর। পাশাপাশি মিশরের কায়রোতে মামলুকদের ছদ্মাবরণে আব্বাসীয় খিলাফতের যে ছিটেফোঁটা তখনও টিকেছিল, অটোম্যানরা তা-ও অধিগ্রহণ করে নেয়।

সুলতান প্রথম সেলিম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। যদিও ঘোষণার প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। তারপরও তারা খিলাফতের দাবি করায় জনগণ আস্থা রেখেছিল যে, এখন থেকে ইসলামকে রক্ষা করার দায়বদ্ধতা অটোম্যানদের ওপরেই আসবে। অটোম্যানরাও সে বাস্তবতাকে ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল। সে কারণে ইউরোপের কোনো খ্রিষ্টান শক্তি বা উত্তর আফ্রিকায় কিংবা ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত– যেখানেই মুসলিমরা কোনো পরাশক্তির হাতে নির্যাতিত হয়েছে, সেখানেই অটোম্যানরা ছুটে গিয়েছে এবং মুসলিমদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

অটোম্যান সাম্রাজ্যে অমুসলিমরাও নাগরিক অধিকার নিয়ে শান্তিতে বসবাস করেছে। তারা সেখানে নিপীড়নের শিকার হয়নি। বরঞ্চ ইসলামি শরিয়তের বিধানের আলোকে অমুসলিমদেরও নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। অটোম্যানরা অতীতের তুলনায় আরও বেশি অগ্রসর হয়ে অমুসলিমদের বাড়তি কিছু সুবিধা দিয়েছিল। তারা তাদের সাম্রাজ্যের আওতাধীন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায় গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছিল। এই স্বায়ত্তশাসিত জনপদগুলোকে বলা হতো 'মিললেত', যেখানে অমুসলিমরা নিজ সম্প্রদায়ের কোনো একজন ব্যক্তিকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করতে পারত, যিনি আবার অটোম্যান সরকারের কাঠামোর আওতায় নিজ জনপদের প্রতিনিধিত্ব করবেন। এই নেতারাই স্ব স্ব সম্প্রদায় এবং অটোম্যান সুলতানদের মাঝে সমন্বয় করতেন। সেসময়ে অটোম্যান সাম্রাজ্যে বসবাসরত খ্রিষ্টান চার্চগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনেকগুলো মিললেত গঠন করা হয়েছিল। কারণ, তারা মনে করত– যে সাম্রাজ্যে অমুসলিমদের সংখ্যা বেশি, সেখানে তাদের মতামতকে যথাসম্ভব গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তৎকালীন অনেক ইউরোপীয় দেশের মতো অটোম্যান সাম্রাজ্যের মধ্যেও নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংহতিই অটোম্যান সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য ছিল– বিষয়টা তেমনও নয়। বরঞ্চ অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী অবস্থান করছিল, যারা প্রত্যেকেই একে অপরকে নিজেদের স্বার্থে সহযোগিতা করত। কিন্তু সেই সহযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে গোটা অটোম্যান সাম্রাজ্যই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

অটোম্যানদের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় ছিল সুলতান সুলায়মান দ্য ম্যাগনিফিশেন্টের ৪৬ বছরের শাসন। তিনি ১৫২০ থেকে ১৫৬৬ পর্যন্ত অটোম্যান সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়ই অটোম্যান সাম্রাজ্য সবচেয়ে বড়ো আকৃতিতে পৌঁছে যায়। বলকান উপদ্বীপ, আরব উপসাগর ও উত্তর আফ্রিকা, ককেশাস পার্বত্য অঞ্চল এবং পারস্যের পুরোটাই তখন ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে। সুলতান সুলায়মান নিজেই রোডস ও বেলগ্রেড অভিযানে নেতৃত্ব দেন এবং জয় করেন, যা ইতিপূর্বে আর কোনো অটোম্যান সুলতান পারেননি। কিন্তু ১৫২৬ সালে ভিয়েনা অবরোধ করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হন। এই ভিয়েনাই পরবর্তী ১৬ ও ১৭ শতাব্দীতে খ্রিষ্টান ও মুসলিম ইউরোপের মধ্যে সীমানা হিসেবে দাঁড়িয়েছিল।

অটোম্যানদের অর্থনীতি আগে থেকেই শক্তিশালী ছিল। তবে সাম্রাজ্য বিকশিত ও প্রসারিত হওয়ায় সাম্রাজ্যের অধীনেই নতুন নতুন বাণিজ্য রুট চালু হয়। ফলে অর্থনীতি আরও বেশি শক্তিশালী হয়। আর বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদের ওপর ভর করে অটোম্যান সাম্রাজ্য সাংস্কৃতিকভাবেও অনেক অগ্রসর হয়।

প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে সুলতান সুলায়মানের সময় কৃষকদের ওপর করের বোঝা হ্রাস করা হয়। ফলে ইউরোপ থেকে দলে দলে খ্রিষ্টান ধর্মালম্বী কৃষকরা অটোম্যান সাম্রাজ্যে এসে বসতি গড়ে তোলে এবং সাম্রাজ্যের কৃষি বিপ্লবে শামিল হয়।

সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী কোনো প্রতিপক্ষ না থাকায় সুলায়মান অটোম্যান সাম্রাজ্যের আইনব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার করার সুযোগ পান। সাম্রাজ্যের প্রধান মুফতি ও প্রধান আইন কর্মকর্তা আবু সুদ এফেন্দির সহায়তায় তিনি সাম্রাজ্যের গোটা আইন কাঠামোটি নতুন করে রচনা করেন। এর আগে যতগুলো মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সবগুলোতেই আইনি কাঠামোর ভিত্তি ছিল ইসলামি শরিয়ত, তথা কুরআন ও হাদিসভিত্তিক আইন। কিন্তু অটোম্যানদের আইনগুলো ছিল কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ ঘরানার। তাই সুলতান সুলায়মান সে আইনগুলোকে নতুন করে পর্যালোচনা করেন, যাতে কার্যত সেখানে শরিয়তবিরোধী কোনো উপাদান না থাকে। মেয়াদোত্তীর্ণ ও সাংঘর্ষিক আইনগুলোকে বাদ দেওয়া হয়। ফলে কার্যকর ও সোজা-সাপ্টা আইনগুলোই বিদ্যমান থাকে, যার ওপর ভর করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। এ কারণেই সুলতান সুলায়মানকে 'কানুনি' বা আইনপ্রণেতা নামে সম্বোধন করা হতো।

১৫৬৬ সালে সুলতান সুলায়মানের ইন্তেকালের পর শাসনভার আসে দ্বিতীয় সেলিমের হাতে। প্রথম সেলিমের নামানুসারে সুলতান সুলায়মান এ সন্তানের নাম রাখলেও কার্যত দ্বিতীয় সেলিম সামরিক নেতা হিসেবে খুব একটা দক্ষ ছিলেন না। অপরিণামদর্শী কিছু সভাসদের প্ররোচনায় ১৫৭১ সালে তিনি সাইপ্রাস আক্রমণ করেন। তার পরিণতিতে খ্রিষ্টান শক্তিগুলো অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সে বছরই লেপান্টোতে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়, যেখানে খ্রিষ্টান ইউরোপ তুর্কিদের বিরুদ্ধে বহু আকাঙ্ক্ষিত জয় লাভ করে। ফলে ভূমধ্যসাগরে অটোম্যানদের আধিপত্য স্থায়ীভাবে ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু এই একটি পরাজয়েই অটোম্যান সাম্রাজ্য ধুলোকণার মতো উড়ে যায়নি। সেলিমের জীবনাবসানের পরও প্রায় এক শতাব্দী অটোম্যানরাই ছিল ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক পক্ষ। তবে ১৬শ শতকের পর অটোম্যানদের বিজয় অভিযান থেমে যায়। এরই মধ্যে আবার প্রযুক্তিগত ও সামাজিকভাবে ইউরোপীয়রা মুসলিমদের সাথে পাল্লা দেওয়ার মতো অবস্থানে চলে আসে। ক্ষমতার যে ভারসাম্য ছিল তা ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। খ্রিষ্টান ইউরোপ চালকের আসনে পরিপূর্ণভাবে বসতে আরও কয়েক শতক সময় নিয়েছিল। কিন্তু কার্যত ১৬ শতকের শেষদিক থেকে অটোম্যানদের পতন ঘণ্টা খুব ধীরে ধীরে হলেও বাজতে শুরু করে।

সাফাভি

১৫ শতকে অটোম্যানদের বিস্ময়কর উত্থানের পর প্রাচ্যে তুর্কিদের বিপরীতে সাফাভি নামে আরেকটি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। সাফাভি সাম্রাজ্যের শুরুর ইতিহাস অনেকটা অটোম্যানদের মতোই। কিন্তু এই দুই সাম্রাজ্যের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মোটামুটি আলাদা। ১৬শ শতক থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত অটোম্যান ও সাফাভিদের মাঝে চলা যুদ্ধ ও সংঘাত পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের কাঠামোকে বিবর্তিত করে দেয়; গোটা মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় চেতনাও নির্ধারণ করে দেয়, যা আজও দৃশ্যমান।

১৫ শতকে তৈমুর লংয়ের সাম্রাজ্যের পতনের পর পারস্য একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে পড়ে যায়। কোনো একক শক্তির পক্ষে গোটা অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করা আর সম্ভব হচ্ছিল না। এমন অনেক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব ঘটে যেগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক। একক কোনো কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নানা ভিন্ন মত, এমনকি অপ্রচলিত ধারণাগুলো বিকশিত হয়। যদিও ৭ম শতক থেকে শুরু করে সে পর্যন্ত পারস্যে সুন্নি মতাবলম্বীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু দেশটির উত্তরের দিকে শিয়াদের ব্যাপক প্রচার-প্রসার শুরু হয়। যার পেছনে মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে তুর্কি সুফিবাদী একটি ধারা– যার নাম ছিল সাফাভি। এই মতধারার জন্ম হয় ১৩ শতকে মোঙ্গলদের বর্বরতম আগ্রাসনের পরপর। তবে কালক্রমে এটা সুফিবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়। এক পর্যায়ে এই মতাবলম্বীরা শিয়াদের ১২ ইমাম তত্ত্বকে গ্রহণ করে। এর আগেও শিয়া প্রভাবিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে তারা কেউ ১২ ইমাম দর্শনের অনুসারী ছিল না। আর ১২ ইমাম অনুসারীদের চিন্তাধারা তুলনামূলকভাবে অধিকতর কট্টর। তারা বিশ্বাস করে, দ্বাদশ ইমাম এখনও লুকিয়ে আছেন এবং তিনি একেবারে কিয়ামতের আগে আগে মানবতাকে মুক্ত করার জন্য বেরিয়ে আসবেন। এ কারণে ১২ ইমামের অনুসারীদের বেশিরভাগই মনে করে, দ্বাদশ ইমাম এসে পৌঁছানো পর্যন্ত রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলো স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। সাফাভিরা ঠিক এই চেতনা থেকেই বিকশিত হয়। তারা আরও বিশ্বাস করে, তাদের নেতারা হযরত আলী η-এর বংশধর এবং তাদের সাথে দ্বাদশ ইমামের কোনো গোপন যোগাযোগ রয়েছে। আর সে বিশ্বাসটাই শিয়াদের নতুন এ রাজনৈতিক গ্রুপের নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের মানদণ্ড তৈরি করে দেয়।

একাদশ শতকের শুরুতে পারস্যে কৃষিকাজে যে পানির পাম্প ব্যবহার করা হতো তার উৎস ছিল উইন্ডমিল বা বায়ুচালিত শক্তি উৎপাদন যন্ত্র।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার এমন একটি সংমিশ্রণ হওয়ায় সাফাভিরা ১৫ শতকের শেষদিকে একটি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়। অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান ও তার বংশধরদের মতোই সাফাভিরাও প্রথমদিকে খ্রিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশেষত ককেশাস এবং আজারবাইজানের উত্তরদিকের বেশ কিছু এলাকায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। ১৫শ শতকের শেষ দিকে সাফাভিরা শক্তিশালী হয়ে উঠে। কারণ, পারস্যের শিয়ারা তখন স্থানীয় সুন্নি মতধারার শাসকদের মাধ্যমে নানাভাবে নিপীড়িত হচ্ছিল। তাই তারা পরিবর্তনের আশায় সাফাভিদের প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়। ১৪৮৮ সালে সাফাভিদের নেতাকে হত্যা করার পর এই চিন্তাধারার নিয়ন্ত্রণ চলে যায় দুই বছরের এক শিশু ইসমাইলের হাতে। পুরো শৈশব জুড়েই ইসমাইল নিজেকে রক্ষা করার জন্য পালিয়ে বেড়ায়। কিজিলবাস নামক একটি তুর্কি যোদ্ধা গোত্র তাকে নিরাপত্তা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। যখন ইসমাইল বয়সের দিক থেকে একটু পরিণত হয়, তার সামরিক সামর্থ্য তখন থেকেই বেশ ভালোভাবে প্রমাণিত হয়। তার নেতৃত্বে কিজিলবাসরা আজারবাইনের তুর্কি রাজপুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে এবং জয় লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ১৫০১ সালে ইসমাইলের বাহিনী তাবরিজ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়, যা তার সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত হয়। পরের কয়েক বছরে এই বাহিনী আরও বেশ কয়েকটি বিজয় অর্জন করে। ১৫১০ সালের মধ্যে পারস্যের বড়ো অংশই এই সাফাভিদের কবজায় চলে আসে।

ইসমাইল যে শুধু তার সামরিক যোগ্যতা বা পারস্য শাসকদের মধ্যকার মতবিরোধকে কাজে লাগিয়ে তার সাফাভি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল তা নয়। বরং ইসমাইল পারস্যবাসীর অন্তর্নিহিত পারস্য জাতীয়তাবাদকে সামনে নিয়ে এসেছিল, যা দীর্ঘদিন পারস্য সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে চাপা পড়েছিল। ৭ম শতকে যখন মুসলিমরা পারস্য জয় করে, এরপর থেকে কখনোই পারস্যের মাটির সন্তানরা পারস্যকে পরিচালনা করতে পারেনি। ইসলামের আবির্ভাবের পর প্রথমে আরব, এরপর মোঙ্গল এবং তারও পরে তুর্কিরা পারস্যকে শাসন করেছে। এরপরও পারস্যের জনগণের মধ্যে ইসলামপূর্ব পারসিক জমানার অনেক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উপাদান প্রচলিত ছিল। ইসমাইল জনগণের মানসিকতার সাথে সংগতি রেখে আবার পারস্যের স্বকীয় পরিচয়সত্তাকে সামনে নিয়ে আসেন। তিনি নিজেকে 'শাহ' হিসেবে ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, ইসলামপূর্ব পারস্যে রাজা বা শাসকদের শাহ বলেই অভিহিত করা হতো। তার এই উপাধি পারস্যের জনগণকে যেন হাজার বছরের নিজস্ব ইতিহাসের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। ফারসি ভাষাকে সরকার ও জনগণের মূল ভাষা হিসেবে তিনি স্বীকৃতি দেন। সাম্রাজ্যের ভিত আরও শক্ত করার উদ্দেশ্যে ইসমাইল পারস্য জাতীয়তাবাদের সাথে ১২ ইমামের তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটান। তার শিয়া দর্শনকেই সাম্রাজ্যের মূল ধর্মীয় দর্শন হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং জনগণকেও অনেকটা জোর করে এই মতাদর্শে দীক্ষিত করা হয়। সুন্নি ইসলামকে বাতিল ও পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। জনগণের সামনে তিনটা বিকল্প দেওয়া হয়। তাদের হয় শিয়া ১২ ইমামে বিশ্বাস আনতে হবে, নইলে পালিয়ে যেতে হবে, নতুবা সুন্নি দর্শন পালন করা অবস্থায় কেউ যদি ধরা পড়ে তাহলে তাদের হত্যা করা হবে। ইরাক, লেবাননসহ মুসলিম বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে শিয়া চিন্তক ও পণ্ডিতদের নিয়ে আসা হয়। তাদের সাফাভি সাম্রাজ্যে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা জনগণকে নতুন ধর্মদর্শনের ব্যাপারে শিক্ষা দেবেন এবং সুন্নি ধারার বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে সমূলে উৎপাটন করবেন। ফলে যে এলাকায় একসময় ইমাম আবু হানিফা, ইবনে সিনা, ইমাম বুখারি রহ.-এর মতো প্রথিতযশা সুন্নি আলিমরা জন্ম নিয়েছিলেন, কালক্রমে সেই এলাকা শিয়া আন্দোলনের অন্যতম সুতিকাগারে পরিণত হয়। কিন্তু শুধু সাম্রাজ্যের লোকদের শিয়া দর্শনে দীক্ষিত করেই ইসমাইল সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সাম্রাজ্যের বাইরের মানুষকেও এই ধারায় নিয়ে আসতে ব্যাকুল ছিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি শিয়া প্রচারকদের আনাতোলিয়ায় পাঠান, যাতে সেখানকার মুসলিমদের শিয়া চিন্তাধারায় সম্পৃক্ত করা যায় এবং পরবর্তী সময়ে সুন্নি অটোম্যান শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের নামিয়ে দেওয়া যায়।

ইসমাইলের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে! কারণ, তিনি যখন অটোম্যান সাম্রাজ্যে তার শিয়া প্রচারকদের পাঠালেন, তখন সেখানে ক্ষমতায় ছিলেন সুলতান প্রথম সেলিম। যখন তিনি জানতে পারলেন, তার সাম্রাজ্যে কিছু বহিরাগত ব্যক্তি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে, তিনি তা মেনে নেননি। প্রতিশোধের অংশ হিসেবে ১৫১৪ সালে সেলিম সাফাভি সাম্রাজ্যে ইসমাইল ও তার বাহিনীকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেনা অভিযান চালান। সাফাভি সাম্রাজ্যের রাজধানী তাবরিজের নিকটবর্তী চালদিরান এলাকায় দুই পক্ষ যুদ্ধে মুখোমুখি হয়। অটোম্যানরা কামান ও বন্দুকসহ নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইসমাইল পালিয়ে যান। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এরপর যতদিন ইসমাইল জীবিত ছিলেন, তিনি প্রচণ্ড হতাশায় নিমজ্জিত ছিলেন। সারা দিন মদপান করে নেশা করতেন। সুন্নিদের কাছে পরাজয় তিনি কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি। তবে সাফাভি ভূখণ্ডটি টিকে থাকে। সাফাভিদের বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন হওয়ায় সুলতান সেলিম এই ভূখণ্ডকে অটোম্যানদের আওতায় নিতে পারেননি। বরং তিনি সাফাভি ও অটোম্যান এলাকার মাঝখানে মজবুত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। এই সীমানা আজও পর্যন্ত টিকে আছে। বর্তমানেও সুন্নি তুরস্ক আর শিয়া ইরানকে এ সীমানা প্রাচীরই পৃথক করে রেখেছে।

ইসমাইলের প্রতিষ্ঠিত সাফাভি সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা যায় ১৫৮৭ থেকে ১৬২৯ সাল পর্যন্ত সময়কালকে। তখন সাফাভি সাম্রাজ্য শাসন করছিলেন ইসমাইলেরই নাতি শাহ প্রথম আব্বাস। ততদিনে অটোম্যানদের সাথে সাফাভিদের প্রাচীরটিও শক্ত কনক্রিটে নির্মাণ করা হয়ে গেছে। ফলে অটোম্যান আর সাফাভিদের মধ্যে সামরিক সংঘাতের মাত্রা কমে আসে। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় সাফাভিরা এবার পারস্যের মৃতপ্রায় সংস্কৃতিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। সুন্নি আলিমরা মানুষের ছবি এঁকে

চিত্রকলাকে অনুমোদন না করলেও সাফাভিদের পারস্য সাম্রাজ্যে তার ব্যাপক প্রচলন ছিল। পারস্য চিত্রকর ও স্থাপত্য শিল্পীরা বিভিন্ন জিনিসের ছোটো ছোটো সংস্করণ বের করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল; যা শুধু সাফাভি এলাকায় নয় বরং আশেপাশের অনেক মুসলিম দেশেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তবে সাফাভি শিল্পীদের শৈল্পিক কাজগুলোর সাথে ইউরোপীয় চিত্রকরদের চিত্রকর্মের বেশ ফারাক ছিল। ইউরোপীয় চিত্রকররা সাধারণত বস্তুবাদী বিভিন্ন বিষয়ে ছবি আঁকত। অন্যদিকে, সাফাভি শিল্পীরা বিভিন্ন ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিষয়ে চিত্র দিয়ে ছোটো ছোটো পাণ্ডুলিপি তৈরি করত, সেগুলোর সাথে আবার নানা ধরনের উপাখ্যান ও গল্পও জুড়ে দেওয়া হতো। ছোটো সাইজের পরিমার্জিত শিল্প বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি সাফাভিদের গল্প বলার সংস্কৃতিও এ সময় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নবম শতাব্দীতে প্রকাশিত হওয়া বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য *শাহনামা* নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। সাফাভিরা সেসময় কতটা শক্তিশালী ছিল এবং তাদের সংস্কৃতি কতটা সমৃদ্ধ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সে আমলে নির্মিত স্থাপনা এবং নগর পরিকল্পনা দেখে– যা এখনও বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করে।

প্রথম শাহ আব্বাসের আমলে রাজধানী ইসফাহানে বিশাল আকৃতির অসংখ্য দালানকোঠা ও মসজিদ নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি স্থাপনাতেই ছিল বিশালকায় উন্মুক্ত বাগান, জ্যামিতিক মোজাইক এবং ক্যালিওগ্রাফির ছোঁয়া। আজও ইসফাহান শহর সাফাভি সাম্রাজ্যের সম্পদ ও ক্ষমতার সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাফাভিদের স্থাপত্য কৌশল এতটাই মনোমুগ্ধকর ছিল যে তখন বিশ্বে একটি প্রবাদ চালু হয়ে গিয়েছিল– "কেউ যদি ইসফাহানকে দেখে তাহলে তার অর্ধেক পৃথিবী দেখা হয়ে যায়।"

মোগল ইতিহাস

তৃতীয় যে মুসলিম সাম্রাজ্য সে সময়ে গড়ে উঠেছিল তা ছিল প্রাচ্যে– ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে ১৩ শতকের শুরু থেকেই দিল্লি সালতানাতের শাসন চালু ছিল। এখানে আগত বিভিন্ন আরব, তুর্কি ও ফারসি নাগরিকদের সংস্কৃতি আর স্থানীয় নাগরিকদের সংস্কৃতি মিলে নতুন একটি সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়, যার ওপর ভর করে ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেলেও ততদিনে স্থানীয় নাগরিকদের একটি বড়ো অংশ ইসলাম গ্রহণ করায় তারা ইসলামি সংস্কৃতির ব্যাপারে অনুরক্ত হয়ে যায়। ফলে পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছিল, যেকোনো মুসলিম রাজবংশ খুব সহজেই ভারতীয় উপমহাদেশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারত।

মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুর্কি যোদ্ধা বাবর (১৪৮৩-১৫৩০)। তিনি নিজেকে চেঙ্গিস খান এবং তৈমুর লং-এর বংশধর দাবি করতেন। ফলে তিনি এও বিশ্বাস করতেন, তার বংশগতিতে এমন কিছু আছে, যা দিয়ে তিনি বিরাট এক সাম্রাজ্যকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন। জীবনের শুরুর দিকে তিনি তার পিতার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বর্তমান উজবেকিস্তানে কিছুদিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তবে সেখানে খুব একটা সফলতা পাননি। ফলে তার হাত থেকে সমরখন্দ ও আদি পুরুষের এলাকা ফারগানা উপত্যকা ছুটে যায় এবং তার কিছু অনুচরসহ তাকে নির্বাসনে চলে যেতে হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে কাবুলের শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কাবুলসহ আফগানিস্তানের মানুষের মধ্যকার অনৈক্য আর মতবিরোধের সুযোগে তিনি কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাবুল থেকে তিনি বহুবার মধ্য এশিয়ায় তার আদি এলাকাকে জয় করতে চেয়েছেন। এমনকি সাফাভিদের সহায়তা নিয়ে হলেও তিনি মধ্য এশিয়ায় নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন; তবে তার সে চেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনি। ফলে বাধ্য হয়েই তিনি হিন্দুকুশ পবর্তমালা হয়ে ভারতের দিকে নজর দেন। ১৫২৪ সালে তিনি ভারত অভিমুখে অগ্রসর হন। তখন দিল্লি সালতানাতের নিয়ন্ত্রণ ছিল লোদি রাজবংশের হাতে। ১৫২৬ সালে ঐতিহাসিক পানিপথের যুদ্ধে বাবর লোদির নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তী সময়ে ১৬শ শতকের মধ্যেই মোগল সাম্রাজ্য গোটা ভারতবর্ষে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। যারা স্থানীয় পর্যায়ের শাসক ছিলেন, মোগলরা তাদের স্বপদে বহাল রাখে। স্থানীয় শাসকরা মোগল শাসকদের প্রতি সামান্য আনুগত্য দেখিয়েই তাদের আস্থাভাজন হয়ে যেতে পেরেছিল। ভারতবর্ষে ঐতিহাসিকভাবে নানা গোত্র ও ধর্মবিশ্বাসের মানুষের বসবাসস্থল। তাই এখানে স্থিতিশীল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে শক্তিশালী রাজনৈতিক কৌশলের কোনো বিকল্প নেই। আর তৎকালীন মোগল শাসকদের মধ্যে তা ভালোভাবেই ছিল।

ভারতের মুসলিমরা দীর্ঘকাল ধরেই উর্দু ভাষায় কথা বলে। এই উর্দু ভাষায় আরবি, ফারসি, তুর্কি এবং ভারতীয় স্থানীয় ভাষার তীব্র প্রভাব বিদ্যমান। উর্দু শব্দটি এসেছে তুর্কি শব্দ 'ওর্দু' থেকে, যার অর্থ হলো সেনাবাহিনী। সেনা বাহিনীর ক্যাম্পেই আরবি, ফারসি, তুর্কি এবং ভারতীয় স্থানীয় ভাষাকে মিলিয়ে এই নয়া ভাষার জন্ম হয় বলে একে ওর্দু বলা হতো– যা পরবর্তী সময়ে উর্দু নামেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

বাবরের পূর্বপুরুষরাও ভারতে এসেছিলেন, কিন্তু বেশি দিন টিকতে পারেননি। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে বাবর যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সাম্রাজ্যের নাম দেওয়া হয় মোগল সাম্রাজ্য। ধারণা করা হয়, মোঙ্গলদের ঐতিহ্যের চেতনায়

উজ্জীবিত হয়ে এই মোগল নামটি দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যত মোগল সাম্রাজ্যে মোঙ্গল ইতিহাস ও সংস্কৃতির তেমন একটা প্রভাব ছিল না। বরং মোগল সাম্রাজ্য ছিল আরব, তুর্কি, পারস্য ও ভারতীয় চিন্তাধারার মিলনস্থল। সমসাময়িক অটোম্যান সাম্রাজ্যের মতো মোগল সাম্রাজ্যেও নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষের আগমন ঘটে। এ যুগটা এমন ছিল যে, অনেক হিন্দু নাগরিক ফারসি ভাষা চর্চা করত। তখনকার সময়ে মুসলিম বিশ্বের বড়ো একটি অংশে ফারসি ভাষার ব্যবহার বেশি ছিল। আবার এমন অনেক মুসলিম স্থপতিও হিন্দু ধর্মমতে বানানো নানা ভবন বা অবকাঠামো থেকেও নতুন নতুন ধারণা নিতেন। এসময় বিখ্যাত অটোম্যান স্থপতি মিমার সিনানের ছাত্ররা মোগল সাম্রাজ্যে এসে তাজমহল নির্মাণে অংশ নেন। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আলিমদের কাছে ভারতবর্ষ সব সময়ই ছিল আকর্ষণীয়। তারা মনে করতেন, ভারতবর্ষই হতে পারে তাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত স্থান, যেখানে তারা পূর্ণ উদ্যমে দাওয়াতি কাজ করার মাধ্যমে ইসলামের বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

নানা ধরনের সংস্কৃতি আর চিন্তাধারার মিশ্রণ সবচেয়ে বেশি হয় মোগল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) সময়ে। আকবর নিজেকে চিত্রকলা ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার পৃষ্ঠপোষক মনে করতেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব জ্ঞানী ও পণ্ডিতকেই কদর করতেন। তিনি প্রায়শই তার দরবারে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের মধ্যে ধর্মীয় বিতর্কসভার আয়োজন করতেন। এ আয়োজনগুলোকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা এসে নিজ নিজ ধর্মের আলোকে ধর্ম ও স্রষ্টার অবস্থানকে তুলে ধরত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আকবর তার নিজস্ব একটি ধর্মীয় দর্শনের প্রচলন করেন। তিনি মনে করেছিলেন, তার এই চিন্তাধারা বিদ্যমান ধর্মগুলোর মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে নিয়ে আসবে। তিনি তার নতুন ধর্মের নামকরণ করেন দ্বীন-এ-ইলাহী বা ইলাহীর দ্বীন। কিন্তু এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ইসলাম আর বহু-ঈশ্বরবাদী হিন্দুধর্মের মিশেল দেওয়া ছিল অসাধ্য কাজ। সে কারণে আধ্যাত্মিক বা আল্লাহ সম্পর্কিত বিষয়াবলির চেয়ে আকবর ব্যবহারিক বা আচরণগত বিষয়ের দিকে বেশি মনোযোগ দেন। মুসলিম আলিমরা আকবরের এসব কার্যক্রমকে মেনে নেননি এবং এগুলোকে তারা ধর্মদ্রোহীতা হিসেবে উল্লেখ করেন। আকবরের দ্বীন-এ-ইলাহী কখনও জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। যারা একে সমর্থন করেছিল তারা মূলত সম্রাট আকবরকে খুশি করার জন্যই তা করেছিল। তাই আকবরের মৃত্যুর পর দ্বীন-এ-ইলাহীর অস্তিত্বই আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আকবরের পরে মোগল সাম্রাজ্যের পরবর্তী সম্রাটরা আবার ইসলামের মূল শিক্ষার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেন। এই প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে বেশি কার্যকরভাবে ত্বরান্বিত হয় সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) আমলে। তিনি ছিলেন মোগল ইতিহাসের ৬ষ্ঠ সম্রাট। তার উপাধি ছিল আলমগীর– যার অর্থ বিশ্বজয়ী। তিনি সফলতার সাথে গোটা ভারতবর্ষেই সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন বলে তাকে এই বীরোচিত উপাধি দেওয়া হয়। তার দীর্ঘ ৪৯ বছরের শাসনামলকে সামরিক অগ্রযাত্রা, ব্যক্তিগত মহানুভবতা এবং ইসলামি জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার সময় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। জানা যায়, তিনি তার পিতা সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল নির্মাণের সিদ্ধান্তের সাথে একমত ছিলেন না। এই বিশাল স্থাপনা নির্মাণকে তিনি অর্থ ও সময়ের অপচয় এবং রাসূল γ-এর শিক্ষার বিপরীত কর্ম হিসেবেই গণ্য করতেন। তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন, ভারতীয় মুসলিমদের ইসলামি আইনের ব্যাপারে ব্যবহারিক ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। সে তাগিদ থেকেই তিনি ইসলামি আইন জানেন এমন অসংখ্য আলিমকে নিয়ে বেশ কিছু মৌলিক কাজে হাত দেন। এই প্রচেষ্টারই ঐতিহাসিক ফলাফল হলো *ফতোয়ায়ে আলমগীরি*– যেখানে হানাফি মাযহাবের আলোকে ইসলামের বিধিবিধানকে একসাথে সংকলিত করা হয়। ফতোয়ায়ে আলমগীরিই পরবর্তী সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের আইনবিধি হিসেবে প্রচলিত হয়ে যায়। মদিনায় তৈরি হওয়া প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের আদলে বাদশাহ আলমগীরও মোগল সাম্রাজ্যে ইসলামি শরিয়ার বিধান চালু করেন। তার এই উদ্যোগ গোটা ভারতবর্ষেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। কারণ, এর আগে মোগল সাম্রাজ্যের যে কর সংগ্রহ বিধান প্রচলন করা হয়, তা ছিল ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। আর সেই কর পদ্ধতির ব্যাপারে জনগণ খুশি ছিল না। ইসলামবিরোধী আইনগুলো বাদশাহ আওরঙ্গজেব বাতিল করে দেওয়ায় জনগণের ওপর বাড়তি চাপের পরিমাণ অনেকটাই কমে আসে।

তবে অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি বাদশাহ আওরঙ্গজেব খুব একটা সহানুভূতিশীল ছিলেন না বলেই ইতিহাসে আলাপ আছে। তার সময়েই বেশ কিছু বিখ্যাত হিন্দু মন্দির ভেঙে দেওয়ার কথাও ইতিহাসে বর্ণনা আছে। বর্তমানের অনেক ইতিহাস লেখক তাকে ভিন্নমতাবলম্বী ও ভিন্নধর্মাবলম্বী মানুষদের জন্য নিপীড়ক শাসক হিসেবেই আখ্যায়িত করতে চান। কিন্তু বিষয়টাকে এত ঢালাওভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। কী কারণে তিনি হিন্দু মন্দিরগুলো ভেঙেছিলেন সেটা বুঝতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে, তিনি কোন ধরনের শাসক ছিলেন এবং মোগল সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক ধরনটাই-বা কেমন ছিল।

১৭শ শতকে ভারতের হিন্দু মন্দিরগুলো প্রার্থনার পাশাপাশি নানা ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্থান হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। মন্দিরের শীর্ষ কর্মকর্তারা তাদের নিজেদের কর্মপরিধির আওতায় সব সময়ই মোগল সাম্রাজ্যকে সহযোগিতা করতেন। সাম্রাজ্যের অধিকর্তারা গোটা রাজ্য জুড়েই যাতে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য তারা রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করতেন। বেশ কিছু মন্দিরের কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্বের বাইরে গিয়ে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় আওরঙ্গজেব সেই হিন্দু মন্দিরগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেন। বিশেষ করে মারাঠী সম্প্রদায়গুলো জোট করে ১৭শ শতকের শেষে যখন বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে তখন অনেকগুলো হিন্দু মন্দিরের কর্মকর্তারা তাতে সমর্থন জোগায়। তাই এই মন্দিরগুলোকে ধ্বংস করার বিষয়টিকে মোগল শাসকদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন

হিসেবে দেখার সুযোগ নেই; বরং মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এটা করা জরুরি ছিল। যেটা অনেক ঐতিহাসিকই গোপন করে যান তা হলো, আওরঙ্গজেবের সময়ই বরং গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে অসংখ্য হিন্দু মন্দির নির্মাণ করা হয়। আওরঙ্গজেবের পরামর্শক প্যানেলের বড়ো একটি অংশই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ইতিহাসের বিকৃতি এবং ভাসা ভাসা আলাপ দিয়ে অতীত কীর্তিমানদের মূল্যায়ন করা যাবে না। তাই আধুনিক সময়ের ইতিহাস পড়তে গেলে আমাদের সকলকেই সতর্ক থাকতে হবে।

তিনটি বিশালকায় মুসলিম সাম্রাজ্য

অটোম্যান, সাফাভি ও মোগল সাম্রাজ্যকে একসাথে গান পাউডার সাম্রাজ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সাম্রাজ্যগুলো মুসলিম বিশ্বে নতুন একটি ধারা তৈরি করে। মোঙ্গল আগ্রাসনের পর একেবারে ছাই থেকে এই সাম্রাজ্যগুলোর উত্থান হয়, যার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব যেন নতুন করে আবার জেগে ওঠে। যদিও এই সাম্রাজ্যগুলোর এলাকা ভিন্ন ছিল, একেকটি সাম্রাজ্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল, ধর্ম-দর্শনের ব্যাপারেও তাদের কিছু ভিন্নতা ছিল, তারপরও ইসলামের মৌলিক ইস্যুতে একমত হওয়ায় তাদের মধ্যে ভিন্নতার চেয়ে বরং সামঞ্জস্যতাই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তারা সকলে ইসলাম অনুসরণ করত। তিনটি সাম্রাজ্যেই পারস্য শাসনের আদলে দরবার সংস্কৃতিও চালু ছিল। আর তাদের সকলের আদি পুরুষ তুর্কি বংশোদ্ভূত। ১৭শ শতকের বাস্তবতাটা এমন ছিল যে, যদি কোনো মুসলিম বলকান উপদ্বীপ থেকে যাত্রা শুরু করে আরব এলাকা হয়ে ইরানে প্রবেশ করে, সেখান থেকে হিন্দুকুশ পাড়ি দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছায় তাহলে কোনো স্থানের ধর্মীয় সংস্কৃতিই তার কাছে আলাদা বা অপরিচিত মনে হবে না। কারণ, এত বিশাল এলাকা জুড়ে তিনটি পৃথক সাম্রাজ্য ছিল বটে, কিন্তু তিনটাই ছিল মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ বিশাল এলাকা জুড়ে শুধু যে ধর্মীয় সাদৃশ্যই বিদ্যমান ছিল তা নয়; বরং প্রযুক্তিগত লেনদেনও অনেক বেশি হতো। মুসলিমদের মধ্যে অটোম্যানরাই প্রথম কামান ও গান পাউডারের ব্যবহার শুরু করে। পরবর্তী সময়ে সাফাভি ও মোগলরাও সেই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে। এ সময় জ্ঞান ও প্রযুক্তির উত্থান আব্বাসীয় স্বর্ণযুগের মতো প্রাচুর্যময় না হলেও বলা যায়, এই ১৭শ শতকেই মুসলিমরা শেষবার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার শীর্ষে আরোহণ করে। পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয়রা মুসলিমদের থেকে এগিয়ে যায়। ধারাবাহিকতায় ১৮ ও ১৯ শতকে তিন মুসলিম সাম্রাজ্যই ক্রমাগত দুর্বল হতে শুরু করে।

বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বে সেই প্রাচীন ধারার আলোকে প্যান ইসলামি একতা হয়তো গড়ে তোলা সম্ভব না-ও হতে পারে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত স্পেন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিশাল এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু এ সময়ে তারা রাজনৈতিক কোনো উৎকৃষ্ট মডেল দাঁড় করাতে পারেনি। যদিও মূল খিলাফতের ভার পরবর্তী সময়ে অটোম্যানদের কাছে চলে যায়, এরপরও মুসলিম শাসক ও আলিমরা বিভিন্ন এলাকায় কাজ করতে গিয়ে সেখানে নিজস্ব খিলাফত চালু করে ফেলেন। এমন উদাহরণও আছে যে, অটোম্যান প্রশাসন থেকে মোগল শাসকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে, যেখানে অটোম্যান খলিফা মোগল শাসককে খলিফা এবং আমিরুল মুমিনিন হিসেবে সম্বোধন করছেন। অনেক বছর পর উনবিংশ শতকের শেষদিকে অটোম্যান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সময়ে আবারও প্যান ইসলামিক একতা গড়ে তোলার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু সেটাও আর সফলতার মুখ দেখেনি।

একাদশ অধ্যায়

পতন

অটোম্যান সাম্রাজ্যের সংকট

ইসলামের ইতিহাস সব সময় যেন চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে। আরবের মরুভূমি থেকে ইসলামের উত্থান হওয়ার পর ৭ম ও ৮ম শতকে ইসলামি অনুশাসনের ভিত্তিতে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী কিছু সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। নানা ধরনের আগ্রাসন ও আক্রমণের মুখে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতকে সাফাভি, অটোম্যান ও মোগল সাম্রাজ্যের উত্থানের মধ্য দিয়ে বিশ্বে মুসলিমরা পুনরায় জেগে ওঠে। ১৫২০ সালে তো অটোম্যানরা মধ্য ইউরোপের ভিয়েনার দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। যদিও তারা শহরটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। কিন্তু তারা বরাবরই ইউরোপের শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হতো।

অটোম্যান সাম্রাজ্য দ্রুত সময়ের মধ্যে বিস্তৃত হয়। তারপর ধীরে ধীরে বিস্তারের গতি স্থিমিত হয়ে আসে। ক্রমশ এর পতন প্রক্রিয়াও শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় ১৫৬৬ সালে, সুলতান সুলায়মানের শাসনাবসান হওয়ার পর থেকেই। তার মৃত্যুর সময় অটোম্যান ছিল ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য এবং পরবর্তী কয়েক দশকেও এই সাম্রাজ্যটি সেভাবেই টিকে ছিল। তবে এর মধ্যে বেশ কিছু বিষয় অটোম্যান শাসনব্যবস্থাকে ভেতর থেকে ক্ষয় করতে শুরু করে। অটোম্যান সাম্রাজ্য যখন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছিল, ঠিক একই সময়ে পশ্চিমে ইউরোপীয় দেশগুলোর উত্থান ঘটছিল। বিশেষ করে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এ সময় খুব উন্নতি করে। যেসব স্থানে অটোম্যানরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিল, সেসব জায়গায় এই দুই পরাশক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথম যে কারণটি বলা যায় তা হলো, অটোম্যানরা যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। অটোম্যান সাম্রাজ্য তার প্রথম দিকে শত্রুদের সাথে একের পর এক জয় পেয়েছিল। কারণ, প্রতিপক্ষের তুলনায় তাদের প্রযুক্তিগত অবস্থান অনেক অগ্রসর ও সংহত ছিল। তারাই প্রথম কনস্টান্টিনোপল জয়ের ক্ষেত্রে কামান ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে অটোম্যানরা সর্বপ্রথম বহনযোগ্য অস্ত্র উৎপাদন করে– যা পরবর্তীকালে রাইফেলের আকারে বিবর্তিত হয়। তবে অটোম্যানদের এসব প্রযুক্তি হাতিয়ে নিতে ইউরোপের খুব একটা সময় লাগেনি।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান এবং তার পরবর্তী শাসকদের মধ্যে যোদ্ধাসুলভ মানসিকতা ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সাম্রাজ্য যত বড়ো ও স্থিতিশীল হয়, ততই যেন সংগ্রামী মানসিকতা পরবর্তী অটোম্যান শাসকদের মধ্য থেকে হারিয়ে যায়। জানিসারি সেনারা অতীতের যুদ্ধগুলোতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করলেও, পরবর্তী সময়ে তারা দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক মানসিকতায় ডুবে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

অটোম্যান সাম্রাজ্য আকারের দিক দিয়ে বিশাল ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। প্রতি বছর সাম্রাজ্য টহল দেওয়ার উদ্দেশ্যে বসন্তকালে সেনারা বেরিয়ে যেত এবং সাম্রাজ্যের সব গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় শরৎ আসার আগেই পৌঁছাতে চেষ্টা করত। বিশেষ করে তারা সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে আগে যেতে চেষ্টা করত। কারণ, সেখানে তুলনামূলক আগে আগেই শীত পড়ত। এর যথার্থ উদাহরণ হিসেবে ভিয়েনা অভিযানের কথা বলা যায়। ১৫২৯ সালে সুলতান সুলায়মানের সময় ভিয়েনা অবরোধ করার চেষ্টা করা হয়। তার সেনাবাহিনী গ্রীষ্মকালেই ইস্তাম্বুল ছেড়ে যায়। বলকান এলাকা পাড়ি দিয়ে শেষমেশ যখন তারা ভিয়েনা পৌঁছায়, তখন সেপ্টেম্বর মাস এসে গেছে। ফলে ইস্তাম্বুলে ফেরত আসার আগে ভিয়েনা অবরোধ করার জন্য সুলায়মানের হাতে মাত্র কয়েক সপ্তাহ ছিল; যা মোটেও যথেষ্ট ছিল না। এ সীমাবদ্ধতার কারণে অটোম্যান সেনারা হাঙ্গেরির পর আর অগ্রসর হতে পারেনি। ফলে জার্মান ভাষাভাষী মধ্য ইউরোপের কোথাও তাদের স্থায়ীত্ব সম্ভব হয়নি। ১৬৮৩ সালে অটোম্যানরা আরেকবার ভিয়েনা জয়ের চেষ্টা করে, কিন্তু সেবারও ব্যর্থ হয়।

১৬৯৯ সালে কারলোউইতজে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে অটোম্যান সেনাদের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। তার আগে প্রায় ১৪ বছর ইউরোপীয় বাহিনীর সাথে অটোম্যানদের প্রচণ্ড সংঘাত ও যুদ্ধ চলে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে অটোম্যানরা চুক্তির মাধ্যমে তাদের অধীনে থাকা অনেকখানি ভূমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অটোম্যানদের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম ঘটে। সুলতান সুলায়মানের নেতৃত্বে ১৬শ শতকে অটোম্যানরা হাঙ্গেরি জয় করেছিল। কিন্তু ১৬৯৯ সালে এসে সেই হাঙ্গেরিকে অটোম্যানরা অস্ট্রিয়ান আর ট্রান্সসেলভিনিয়ানদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, ইউক্রেনের কিছু অংশ নিয়ে যায় পোল্যান্ড। সেই সাথে ভেনিস দক্ষিণ গ্রিসে থাকা অটোম্যানদের ভূখণ্ড ও বলকানে আড্রিয়াটিক উপকূল এলাকাও ছেড়ে দিতে হয়। এমনিক পরবর্তী সময়ের অটোম্যান শাসক চুক্তি করে তার সাম্রাজ্যে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের বিশেষ স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা দিতে বাধ্য হয়। যদিও শুরু থেকে অটোম্যান শাসকরা ইসলামি শরিয়তের আলোকে খ্রিষ্টানসহ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করেছিল।

যাহোক, এসব চুক্তির মাধ্যমে মূলত বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করে অটোম্যান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হলো। পরবর্তী সময়ে ১৮ ও ১৯ শতকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো আবারও একই কৌশল প্রয়োগ করে, অটোম্যান শাসনকে আরেক দফা দুর্বল করে দেয়। ফলে অটোম্যান সাম্রাজ্য ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত পতনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

সামরিক অভিযানে অটোম্যানদের ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সাম্রাজ্যের অন্যান্য খাতেও ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ, কাঠামোগতভাবে অটোম্যানরা একটি সামরিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। সামরিক অভিযান করে জয় লাভ করত বলেই এই সাম্রাজ্যে সম্পদ, জনশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার এর ওপর ভর করে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। ১৪ শতক থেকে শুরু করে ১৬ শতক পর্যন্ত অটোম্যান সাম্রাজ্যের এই সামরিক কার্যক্রম থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকখাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু যখন এই ধরনের অভিযান ও বিজয়যাত্রা থেমে গেল, তখন অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য ভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হলো। কিন্তু সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের যে অর্থনৈতিক কাঠামো দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ করে তার অভ্যন্তরীণ নীতিতে এমন পরিবর্তন সামাল দেওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। তারপরও বিষয়টিকে হয়তো সামাল দেওয়া যেত, যদি সে মানের নেতৃত্ব থাকত। কিন্তু অটোম্যানদের প্রথম দিকের তুলনায় পরবর্তী সময়ের নেতৃত্বেও ব্যাপক দুর্বলতা দেখা দেয়।

উসমান যখন অটোম্যান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন থেকে শুরু করে মধ্য ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে সুলতান সুলায়মানের সোনালি যুগ পর্যন্ত সুলতানরাই অটোম্যান শাসনের মূল নিয়ন্ত্রক ছিল। সুলতানরাই সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে থেকে সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতেন। উজিরসহ মন্ত্রীদের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনা করতেন। অন্যান্য দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতেন সুলতানই। সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে মুসলিম ভূখণ্ড ও এর নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। সুলতান সুলায়মানের ইন্তেকালের পর শাসন কার্যক্রমে অনেক পরিবর্তন আসে। পরবর্তী সুলতানরা আর এতসব কাজে সম্পৃক্ত হতেন না।

পরিবর্তনটা শুরু হয় সুলতান সুলায়মানের ছেলে দ্বিতীয় সেলিমের হাত ধরেই। পরবর্তী সময়ের সুলতানরা মূলত প্রাসাদে বিলাসিতায় মত্ত থাকতেই ভালোবাসতেন। সাম্রাজ্য পরিচালনা নিয়ে তাদের তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। পূর্ববর্তী সুলতানরা সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়ে সেনাদের অনুপ্রাণিত করতেন বলেই সেনারা উজ্জীবিত হয়েছিল। ফলে অটোম্যান সেনারা একসময় আনাতোলিয়া হয়ে বলকান জয় করেছিল। কিন্তু ১৬শ শতকের শেষ দিক থেকে অটোম্যান সুলতানরা যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তারা বিভিন্ন সেনাপতিকে দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে নিজেরা ইস্তাম্বুলের প্রাসাদে আরাম-আয়েশে মত্ত থাকত।

সুলতান প্রথম আহমাদ (১৬০৩-১৬১৭) সালতানাতের উত্তরাধিকার নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়াকে সর্বপ্রথম চূড়ান্ত করেন। এর আগে প্রায় ৩শ বছর সিংহাসনের কর্তৃত্ব নিয়ে শাহজাদাদের মধ্যে যে লড়াই ও প্রতিহিংসার সংঘাত চলত, সুলতান আহমাদের নেওয়া এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তার অবসান হয়। এর আগে সুলতানরা তাদের ভাইদের বাঁচিয়ে রাখতেন না, পরে যেন তারা আবার সিংহাসনের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়াতে পারে। এ ধারাটির সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় বায়েজিদের সময় থেকে। তবে সুলতান আহমাদের এ সিদ্ধান্তের পর থেকে শাহজাদাদের আর হত্যা করা হতো না। কিন্তু তাদের অন্য সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রাসাদের হেরেমে বন্দি করে রাখা হতো। একজন সুলতান মারা গেলে শীর্ষ কর্মকর্তারা হেরেমে গিয়ে সবচেয়ে বয়স্ক যে শাহজাদাকে পেতেন তাকেই এনে সিংহাসনে বসাতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যেত, এ সব শাহজাদারা অনেক বয়সে এসে প্রথমবার আলোর মুখ দেখতেন, মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেতেন। দীর্ঘ দিন একটি ঘরে বন্ধ থাকায় তাদের মেধা ও মননের ওপর নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ত। আর যেহেতু তাদের প্রশাসন চালানোর কোনো অভিজ্ঞতা থাকত না, তাই হঠাৎ করে সিংহাসনে বসে তারা এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতেন। সুলতানদের এই ধরনের দুর্বলতার কারণে সাম্রাজ্য চালানোর দায়িত্বটি ধীরে ধীরে উজিরসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের হাতে চলে যায়। তারাই পেছন থেকে সব কলকাঠি নাড়াতে শুরু করেন।

১৭শ থেকে ১৮শ সালের মধ্যে অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভাগ্য আর সুলতানদের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল থাকেনি। বরং সামগ্রিকভাবে গোটা সাম্রাজ্যের অগ্রগতি বা অবনতির পুরোটাই উজিরদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সুলতান আহমাদের শাহজাদাদের বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে সদুদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবত তিনি ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব বা গৃহযুদ্ধের হাত থেকে সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তের কারণে যে ক্ষতি হয় তা হলো, এরপর থেকে ১৭শ থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত অটোম্যান সাম্রাজ্যে আর কোনো দক্ষ সুলতানের দেখা পাওয়া যায়নি।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের সামরিক ও রাজনৈতিক সংকট আরও বেড়ে যায় ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে, যা শুরু হয় ১৬শ শতক থেকে। পশ্চিম ইউরোপের অনেকগুলো দেশ বিশেষত স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড সেসময় থেকেই নতুন পৃথিবীর সন্ধানে (নতুন নতুন ভূখণ্ডের খোঁজে) অভিযান শুরু করে। সেই সাথে নিজেদের সম্পদকে বাজারভিত্তিক কৌশলের মাধ্যমে ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য জমানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। বিশেষ করে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অসংখ্য খনি থেকে জাহাজে ভরে রুপা নিয়ে আসা হয়, যা স্পেনের ভেতর দিয়ে ক্রমান্বয়ে ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশ করে। ইউরোপীয়দের রুপার এ বিশাল প্রাচুর্যের কারণে অটোম্যান অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অটোম্যান মুদ্রার দাম ভয়ংকরভাবে কমে যায় এবং দেশটিতে ব্যাপকহারে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। তাই অটোম্যান অর্থনীতি মূলত দুইভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। প্রথমত, নতুন করে সামরিক অভিযান না হওয়ায় দেশটিতে যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত পণ্য আসা বন্ধ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা ইউরোপের অর্থনৈতিক উত্থানের কারণে তুলনামূলকভাবে অটোম্যানরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ে।

১৭ ও ১৮ শতাব্দীর দিকে এসে অটোম্যানরা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও পিছিয়ে যায়। এর আগে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মুসলিমরা অগ্রসর হয়েছিল। অন্যদিকে, ইউরোপে তখন চলছিল অন্ধকার যুগ। ইউরোপ খুব একটা অগ্রসর হতে না পারায় মুসলিমরাও জ্ঞানচর্চাকে যেন একটু অবজ্ঞা করতে শুরু করে। এটা খুব অস্বাভাবিকও ছিল না। কারণ, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ইউরোপীয়রা জ্ঞানের জগতে এগিয়ে আসার অনেক চেষ্টা করলেও তেমন সফল হয়নি, যা মুসলিমদের এক ধরনের আত্মতুষ্টিতে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ১৭শ শতকের পরই মূলত ইউরোপ তার অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। রেনেসাঁ ও তার পরবর্তী এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের ওপর ভর করে ইউরোপীয়দের বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো, ইউরোপীয়দের এই অগ্রগতি কিন্তু হয়েছিল কয়েক শতাব্দী ধরে করে যাওয়া মুসলিমদের সব জ্ঞানভিত্তিক কাজের ওপর ভিত্তি করেই। ইউরোপীয়রা মাঝখানে কয়েক শতাব্দী বাহ্যত যখন নীরব ছিল, তখন তারা মূলত মুসলিমদের কাজগুলোকে ইউরোপীয় নানা ভাষায় অনুবাদ করছিল। অধিকাংশ অটোম্যান স্কলাররাই ভেতরে ভেতরে চালিয়ে যাওয়া ইউরোপের এই কাজগুলোকে বুঝে উঠতে পারেননি।

এর আগে অটোম্যানরা খ্রিষ্টান অধ্যুষিত ইউরোপের সাথে মুসলিম বিশ্বের চিন্তাগত ব্যবধানকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল সব সময়। তার অংশ হিসেবে ইউরোপীয় চিত্রশিল্পী, বিদ্বান ও ভাষাবিদদের সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের দরবারেও প্রায়শ দেখা যেত। কিন্তু ইউরোপীয়রা যে বিশ্ব রাজনীতিতে ক্রমশ ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে অটোম্যানরা তা বুঝতে পারেনি। সেই সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা থেকেও মুসলিমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, যা অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিকাশকে মারাত্মকভাবে থামিয়ে দিয়েছিল।

ইউরোপের বাজারে মার্কিন রৌপ্যের আধিক্য অটোম্যান সাম্রাজ্যে মারাত্মক মূল্যস্ফীতির সৃষ্টি করেছিল। ১৫৮০ সালে ৬০টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যেত। মাত্র ১০ বছর পর, ১৫৯০ সালে একটি স্বর্ণমুদ্রা কিনতে ১২০টি রৌপ্যমুদ্রা দিতে হতো। আর ১৬৪০ সালে ২৫০টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা কেনা যেত।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এতগুলো নেতিবাচক ফ্যাক্টর থাকার পরও মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইউরোপ জুড়ে তারা বিশাল এক সাম্রাজ্য হিসেবেই টিকেছিল। প্রথম ৩শ বছরে অটোম্যানরা সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এতটাই অগ্রসর হয়েছিল যে, তার পথ রুদ্ধ করে দেওয়াটা খুব সহজ ছিল না। তারপরও সাম্রাজ্যের টিকে থাকার জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন জরুরি ছিল। নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করাও প্রয়োজন ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইউরোপের সাথে সম্পর্ক নতুন করে মূল্যায়ন করা খুবই দরকার ছিল। অটোম্যান উজিররা এ বিষয়টিতে এসে হেলাফেলা করল। তারা জানত ইউরোপীয়দের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে সফলতা পাওয়া যাবে না। তাই তারা সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া অব্যাহত না রেখে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এ বাস্তবতা আরও বেশি প্রমাণ হয় টিউলিপ আমলে, যা ১৭১৮ থেকে ১৭৩০ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সময়ে অটোম্যান সাম্রাজ্যের উজির ইবরাহিম পাশা ইউরোপের সাথে সম্পর্ককে নতুন করে ঝালাই করেন। ইউরোপের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ককে সংহত করেন এবং সাংস্কৃতিক লেনদেন শুরু করেন। তখন থেকেই বারুকসহ ইউরোপীয় চিত্রকলার নানা বৈশিষ্ট্য অটোম্যানরা ধারণ করে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সাথে মিলিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায়। ইউরোপের যাবতীয় চিত্রকলায় ১৮ শতকের গোড়া থেকেই টিউলিপ ফুলের আধিক্য দেখা

যায়। টিউলিপ যুগের সাংস্কৃতিক বিকাশের পাশাপাশি ইউরোপ আর অটোম্যানদের মধ্যে আরও বেশ কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান বিনিময় শুরু হয়।

১৭শ শতকে অটোম্যানদের যে পতনের সূচনা হয় তা ১৮ শতকে এসে আরও যেন ঘনীভূত হয়। ১৬৯৯ সালের কারলোইজ চুক্তির পরপরই অটোম্যানদের দুর্বলতাগুলো অনুভূত হতে শুরু করে। তবে মূলত ১৮ শতকের যুদ্ধ ও দুর্বল চুক্তিগুলোই বিশ্ববাসীর সামনে প্রথমবারের মতো অটোম্যান সাম্রাজ্যের অসহায়ত্বকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। অটোম্যানরা হাত থেকে ছুটে যাওয়া দক্ষিণ গ্রিসকে ফিরিয়ে আনার জন্য ১৭১০-এর দশকে যুদ্ধও করেছিল। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই বাধ্য হয়েই ১৭১৮ সালে অটোম্যানদের পাসরোউইটজ চুক্তিতে রাজি হতে হয়, যার মধ্য দিয়ে গোটা সার্বিয়াকেই অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দিতে হয়। একটি ভূখণ্ডকে পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে আদতে যখন আরও বেশি জমি ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়, তখন বোঝা যায় যে, সক্ষমতার দিক থেকে অটোম্যানরা ততদিনে কতটা পিছিয়ে পড়েছে।

১৭৬৮ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত রাশিয়ার সাথে অটোম্যানদের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাশিয়া অটোম্যানদের হটিয়ে ক্রিমিয়া, উত্তর ককেশাসের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সেই সাথে তারা অটোম্যানদের কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, অটোম্যান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যে খ্রিষ্টানরা বসবাস করছে, তাদের বিশেষ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ১৮শ শতকেই হয়তো অটোম্যান সাম্রাজ্য পুরোপুরি বিভক্ত হয়ে পড়ত, যদি না ফরাসি বিপ্লব হতো এবং সেই বিপ্লবের সাথে ইউরোপও একাত্ম হয়ে না পড়ত। ১৮ শতকের শেষে গিয়ে অটোম্যানরা ইউরোপে তাদের অধিকৃত অধিকাংশ ভূখণ্ডই হাতছাড়া করে ফেলে। এই এলাকাগুলো তখন থেকে খ্রিষ্টান অধ্যুষিত ইউরোপের দখলে স্থায়ীভাবে চলে যায়।

যুদ্ধে হেরে যাওয়ার খেসারত অটোম্যানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবেও দিতে হয়। পশ্চিমা ইউরোপে যখন অটোম্যানরা আত্মসমর্পণ করে, তখন তাদের অসংখ্য কৃষি জমিও ছেড়ে দিতে হয়, যার প্রভাব অর্থনীতির ওপর পড়ে। এর আগে সুলতান প্রথম সেলিম যখন ফ্রান্সের সাথে চুক্তি করেছিলেন, তখন তিনি ফরাসিদের অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভেতর দিয়ে ব্যাবসা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। প্রথম দিকের সে চুক্তিতে উভয় পক্ষই উপকৃত হতো। কিন্তু অটোম্যানরা দুর্বল হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী সময়ে স্বাক্ষরিত চুক্তির চেহারা অনেকটাই পালটে যায়। কূটনৈতিক সম্পর্কের বিনিময়ে অটোম্যানরা তাদের সাম্রাজ্যের ভেতরে বসবাসরত ফরাসি নাগরিকদের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকারটুকুও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ অটোম্যান সাম্রাজ্যে ফরাসি নাগরিকরা যদি আইন অমান্য করে কিংবা কোনো অপরাধ করে, তারপরও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। এ সুযোগে ১৮ শতকের মাঝামাঝি ফরাসিরা অটোম্যান সাম্রাজ্যের আওতাধীন সকল ক্যাথলিক স্থাপনাকে ফরাসি মালিকানা হিসেবে দাবি করে এবং এগুলোকে ফরাসি আইনে পরিচালনা করতে শুরু করে। সেই সাথে তারা অটোম্যান মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপরও ফরাসি আইন প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেয়। ফলে অটোম্যান সাম্রাজ্যে বসবাসরত খ্রিষ্টানরা অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা অগ্রসর হয়ে যায়। ফরাসিদের আনুকূল্য পাওয়ায় খ্রিষ্টানরা বাণিজ্য কার্যক্রমে বাড়তি সুবিধা পেত।

একসময় অটোম্যান সাম্রাজ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ খোদ অটোম্যানদের হাত থেকে ছুটে যায়। পরিস্থিতি গোটা ১৮শ শতক জুড়েই আরও বেশি অবনতির দিকে যায়। কারণ, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার হাত থেকে নিজের ভূখণ্ডকে রক্ষা করার জন্য অটোম্যানরা এ সময়ে বারবার ফরাসিদের শরণাপন্ন হয়। আর ফরাসিরা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশি ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে, গোটা ১৮শ শতক ছিল অটোম্যানদের সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দেওয়ার শতক। এই শতকেই প্রকৃতার্থে বোঝা যায় যে, সাম্রাজ্য হিসেবে অটোম্যান কতটা নাজুক ও দুর্বল অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

সুলতান প্রথম আবদুল মজিদের বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ এবং একই সঙ্গে ক্রিমিয়া যুদ্ধের বিপর্যয়ের ফলে অটোম্যান রাজকোষ বিরাট সংকটে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে উচ্চ সুদে বিদেশি শক্তিগুলোর কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হয়, যা অটোম্যান সাম্রাজ্যকে ভয়ংকর বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়।

উদারমনা সংস্কার উদ্যোগ

১৯ শতকের মধ্যে এটা মোটামুটি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, টিকে থাকতে হলে অটোম্যান সাম্রাজ্যকে ঢেলে সাজাতে হবে। ১৯ শতকে বেশ কয়েকজন সুলতান উজিরদের হাত থেকে ক্ষমতা হ্রাস করে নিজেদের ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করেন এবং ইউরোপীয় মডেলে সাম্রাজ্যে সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮-১৮৩৯) হলেন প্রথম সুলতান, যিনি বৃহৎ আকারে সংস্কারের কিছু উদ্যোগ নেন। তিনি ইউরোপিয়ান আদলে সাম্রাজ্য পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। উজিরদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না জড়িয়ে এবং তাদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা না দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় চালু করেন। বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সরকারের আরও বেশ কিছু বিভাগ তার সময়ে চালু করা হয়। জানিসারিদের সাথে ইস্তাম্বুলের রাস্তায় একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর জানিসারি সেনা যুগের অবসান ঘটে।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ জানিসারিদের পরিবর্তে ইউরোপীয় সামরিক বাহিনীর আদলে নিজাম-ই-জাদিদ (নতুন পদ্ধতি)-এর প্রচলন করেন। শিক্ষাব্যবস্থায় ইউরোপীয় মডেলে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। স্কুলগুলোতে তুর্কির পাশাপাশি ফরাসি ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়। এমনকি পোশাকেও পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। এতদিন সরকারি কর্মকর্তারা জুব্বা পরে থাকলেও তার আমলে ট্রাউজার, মিলিটারি জ্যাকেট এবং চামড়ার জুতো পড়ার বিধান করা হয়। আলিম ও ধর্মীয় নেতারা অবশ্য সুলতানের এত সব সংস্কারকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তারা ইউরোপের কাছ থেকে সংস্কৃতি ধার নিয়ে এসে নিজেদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতিকে হটিয়ে দেওয়ার বিষয়টাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন। তবে এসব আপত্তি ধোপে টিকেনি। নতুন চালু হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এত বেশি ছিল যে, তারা সর্বত্রই নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি দূরবর্তী প্রদেশগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে স্বায়ত্তশাসন চলে এলেও মাহমুদের সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রাদেশিক প্রশাসকদের সাথে নতুন করে সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

এই সংস্কারের ধারা মাহমুদের সন্তান প্রথম আবদুল মজিদ (১৮৩৯-১৮৬১) এবং দ্বিতীয় সন্তান আবদুল আজিজের (১৮৬১-১৮৭৬) সময়েও অব্যাহত থাকে। আবদুল মজিদের সময় থেকেই নতুন একটি যুগের সূচনা হয়, যার নাম তানজিমাত। এর মাধ্যমে তুর্কিদের আলাদা জাতীয়তাবাদের বিষয়টি সামনে চলে আসে। অটোম্যান শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক জীবনের এমন কোনো খাত ছিল না যাকে তানজিমাত প্রভাবিত করেনি। তানজিমাতের আওতায় ইউরোপের জাতিরাষ্ট্র গঠনের মডেলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পুনর্নির্মাণে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ শুরু করে। তানজিমাত যুগে যে বৈপ্লবিক বিষয়গুলোর সূচনা হয় তার মধ্যে আছে আধুনিক ডাকব্যবস্থা, একটি জাতীয় ব্যাংক, আদমশুমারি, করব্যবস্থা, সংসদের প্রাথমিক কাঠামো ও অটোম্যানদের জাতীয় সংগীত।

শিক্ষাব্যবস্থাকে ফরাসি আদলে ঢেলে সাজানো হয়। পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ধর্মভিত্তিক শিক্ষার তুলনায় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথচ এই ধর্মভিত্তিক শিক্ষাই এতদিন ইসলামি সাম্রাজ্যগুলোর মূল নিয়ামক শক্তি ছিল। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের গবেষণাকে অনেকটা একই সাথে মূল্যায়ন করা হতো। ধারণা করা হতো, বিজ্ঞানের ওপর অধ্যয়ন করলে বা গবেষণা করলে প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় কাজই করা হয়। এমনকি নবিজি γ-ও জ্ঞান অর্জনের ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু অটোম্যানরা ফরাসি শিক্ষা মডেলকে গ্রহণ করার সাথে সাথে ধর্মভিত্তিক জ্ঞান আর বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানকে আলাদা করে ফেলা হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে অটোম্যানদের নতুন প্রজন্ম প্রকৌশল বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে আগ্রহী হয়ে উঠলেও ইসলামবিষয়ক অধ্যয়নকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। কিন্তু যারা সেসময়ে সংস্কার চাইছিলেন, তারা এ ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের মতে, অটোম্যান সাম্রাজ্যকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে গেলে আর কোনো বিকল্প উপায় ছিল না।

অটোম্যান সাম্রাজ্যেই সর্বপ্রথম গুটিবসন্ত রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়। এই প্রতিষেধক পরবর্তী সময়ে একজন কূটনীতিকের স্ত্রীর মাধ্যমে ইংল্যান্ডে পৌঁছায়। সেই মহিলা ইস্তাম্বুলের একটি হাসপাতালে কাজ করার সময় এই প্রতিষেধকটি সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং তা সংগ্রহ করেন।

আরেকটি বড়ো বিষয় হলো, অটোম্যান সাম্রাজ্য যে আইনি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অগ্রসর হয়েছিল, তানজিমাতের কারণে সেখানেও মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। সুলতান সুলায়মান ও প্রধান মুফতি মিলে ১৬শ শতকে যে আইনগুলো প্রণয়ন করেছিলেন, সেগুলো বাতিল করে ফরাসি পদ্ধতির আলোকে নতুন সব আইন প্রণয়ন করা হয়। নতুন আইনে ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের প্রভাবে সৃষ্ট সহজাত অধিকারকে সরকার ও নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে নিরূপণ করা হয়। এর ফলে শরিয়া আর অটোম্যান সাম্রাজ্যের আইনের ভিত্তি হিসেবে কার্যকর থাকল না।

আলিমসমাজ ও ধর্মমনাদের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও এভাবেই অটোম্যান সাম্রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার উপাদানগুলোকে সংযুক্ত করা হয়। অটোম্যান সাম্রাজ্যের শুরু থেকে বিকাশ পর্যন্ত ইসলামের প্রভাব অনেক বেশি ছিল। এর পেছনে কতগুলো কারণও ছিল। যেমন–

১. অটোম্যান শাসনামলের শুরু থেকেই অটোম্যানরা নিজেদের ইসলামের রক্ষক হিসেবে দাবি করেছিল।

২. অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান ইসলামের চেতনার ভিত্তিতেই গাজি নামে বাহিনী গঠন করে বাইজেন্টাইনদের পরাস্ত করেছিলেন।

৩. সুলতান মুহাম্মাদ নবিজি γ-এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে কনস্টান্টিনোপল জয় করেছিলেন।

৪. সুলতান প্রথম সেলিম ইস্তাম্বুলের শাসনব্যবস্থায় খিলাফত পরিভাষা নিয়ে এসেছিলেন।

অথচ উনিশ শতকে এসে অটোম্যান শাসকদের পরবর্তী প্রজন্মের হাত দিয়ে ইসলামকে দূরে সরিয়ে একটি লিবারেল, ধর্মনিরপেক্ষ এবং পশ্চিমা চিন্তা-চেতনাকে সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

ইসলামের ইতিহাসে অটোম্যানদের সংস্কার পর্যন্ত যতগুলো মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল, তাদের প্রত্যেকেরই শাসনপদ্ধতির মূল ভিত্তি ছিল ইসলামি শরিয়া। তারা কে কতটা শরিয়া মেনে চলেছিল, সেটা ভিন্ন বিতর্ক। কিন্তু এর আগে কখনও কোনো মুসলিম সাম্রাজ্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে আইন হিসেবে গ্রহণ করেনি। ১৯ শতকের অটোম্যান সুলতানরা এটাকে সময়ের দাবি হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু যে পরিবর্তন তারা করেছিলেন, তা আসলে সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য নয়; বরং ইউরোপকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

এনলাইটেনমেন্টের হাত দিয়ে যে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার জন্ম হয়, তার ওপর ভিত্তি করে উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদ নতুন একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এত দিন ধরে যে সাম্রাজ্য কাঠামোটি ইউরোপীয়দের মাথায় ছিল, তাকে অস্বীকার করে পৃথক পৃথক জাতিগোষ্ঠীর জন্য পৃথক পৃথক জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ক্রমশ ইউরোপে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। অটোম্যান সাম্রাজ্যে তুর্কি, আরব, কুর্দি, আর্মেনিয়ান, ইহুদি, সার্ব, বসনিয়ান, গ্রিকসহ নানা জাতিগোষ্ঠীর বসবাস থাকায় এখানে জাতীয়তাবাদের ইস্যুটি বেশ বড়ো আকারের সংকট হিসেবে সামনে চলে আসে। যখন ইউরোপের সহযোগিতায় ১৮৩০ সালে গ্রিকরা অটোম্যানদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, তখন থেকে অটোম্যান সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদ একটি কার্যকর হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সাম্রাজ্যের আওতাধীন অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীও একইভাবে স্বাধীনতা দাবি করতে থাকে। ফলে এক সময়ের সুবিশাল অটোম্যান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার আশঙ্কা প্রবলভাবেই দেখা দেয়।

জাতীয়তাবাদের এই উন্মেষ ঠেকাতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভেতর নতুন ধরনের পরিচয়সত্তার বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন ছিল। এরই অংশ হিসেবে পশ্চিমা শিক্ষিত ও জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রভাবিত কিছু কর্মকর্তা নতুন করে অটোম্যান নাগরিকদের 'অটোম্যানীয়' পরিচয় ধারণ করার চেষ্টা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অটোম্যান নাগরিক সমান অধিকার পাবে। তানজিমাত যুগের মাধ্যমে তা অবশ্য এর আগেই নির্ধারিত হয়েছিল। তবে এবার নতুন যা ঘটল তা হলো, সাম্রাজ্যের আওতায় থাকা সকল নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা হলো— যেন অন্য সব পরিচয়ের ওপরে তারা নিজেদের অটোম্যান হিসেবেই বেশি স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। অটোম্যান নামক নতুন এই পরিচিতি সাম্রাজ্যের সব মানুষকে একই সুতোয় বাঁধতে পারেনি।

ইউরোপীয়দের সাথে অটোম্যানরা বারবার অসম চুক্তিতে যাওয়ায় সাম্রাজ্যে মুসলিমদের তুলনায় খ্রিষ্টানরা অনেক বেশি সুবিধা পেতে লাগল। মুসলিমরা তখন নিজেদের ভূখণ্ডে নিজেরা পিছিয়ে পড়া অনুভব করল। ফলে গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়। কারণ, মুসলিমরা ক্রমশ অনুধাবন করছিল যে, তারা খ্রিষ্টানদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। আর খ্রিষ্টানরা ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী হয়ে পড়ছে। ফলে সবাইকে অটোম্যান পরিচয়ে পরিচিত করানোর প্রচেষ্টা বাস্তবে বুমেরাং হয়ে ফিরে এলো। এ চেষ্টা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা ধরনের ঝামেলা আর অস্থিরতাই তৈরি করল।

১৮৭৬ সাল পর্যন্ত এই তানজিমাত যুগ অব্যাহত থাকে। তানজিমাতের নামে যারা অটোম্যান সাম্রাজ্যের সংস্কার করতে চেয়েছিল, তারা শত চেষ্টা করেও অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন ঠেকাতে পারেনি। অটোম্যানদের অর্থনীতি একইভাবে নির্জীব অবস্থায় পড়ে থাকে। সেই সাথে বলকান অঞ্চলের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়। অটোম্যানবাদ এবং প্রদেশগুলোর পুনর্গঠনও জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের শক্ত কোনো ভিত্তি তৈরি করতে পারল না। অন্যদিকে, পশ্চিমা ইউরোপীয় জাতিগুলো ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী হতে থাকে এবং তাদের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশিকতার প্রচলন শুরু হয়। পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু তরুণ তানজিমাত সমর্থক অবশ্য মনে করত যে, তানজিমাত উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার কারণ হলো— এর উদ্যোক্তারা তানজিমাতের প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট উদার হতে পারেনি। সে কারণে তারা আরও বেশি করে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করার এবং সুলতানের ক্ষমতাকে আরও সীমিত করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তাদের আন্দোলনের তীব্রতায় ১৮৭৬ সালে সুলতান আবদুল আজিজ ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তারই ভ্রাতুষ্পুত্র পঞ্চম মুরাদ। নতুন এই সুলতান পূর্ববর্তী সুলতানের চেয়েও অযোগ্য ছিলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়। ফলে তাকেও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে তার ভাই দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে (১৮৭৬-১৯০৯) ক্ষমতায় বসানো হয়। উজির ও মন্ত্রীরা মিলে সুলতান পদের এই পরিবর্তনগুলোর পেছনে কলকাঠি নাড়েন। তাদের চাওয়া ছিল যে, পরবর্তী এই শাসকেরা এসেও তানজিমাত যুগের সংস্কার কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রাখবেন।

১৯০৮ সালে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ বেইজিংয়ে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে চীনের হুই মুসলিমরা সেখান থেকে ইসলামি শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

প্যান-ইসলামিজম

সম্ভবত অটোম্যান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অনেক বছর পর আবদুল হামিদ হলেন সেই সুলতান, যিনি অন্যদের তুলনায় যোগ্য ও পরিণত ছিলেন। অটোম্যান সুলতান প্রথম আহমাদ তার সময়ে শাহজাদাদের জন্য যে রাজকীয় বন্দিদশার প্রচলন শুরু করেছিলেন, ১৯ শতকে এসে শাহজাদা আবদুল হামিদ তার থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। আবদুল হামিদ এরপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গমন করেন। তার কূটনৈতিক জ্ঞান ভালো ছিল এবং তিনি যথেষ্ট শিক্ষিতও ছিলেন। অটোম্যান সুলতানদের মধ্যে দীর্ঘ সময় পর একজন সুলতান এলেন, যিনি ছিলেন ভালোমাপের কবি ও কুস্তিগীর। তিনি নিজেই তার আসবাবপত্রের নকশা প্রণয়ন করতে পারতেন। তার পূর্বসূরিদের মতো তিনি অতটা বিলাসী জীবনযাপনেও অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি বসফরাস প্রণালির নিকটবর্তী জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে না থেকে একটু দূরবর্তী ইলদিজ প্রাসাদে থাকতেন, যা ছিল অনেকটাই সাধাসিধে ও অনাড়ম্বর কাঠামোর একটি স্থাপনা।

এই ধরনের একজন নেতার সেসময়ে খুবই প্রয়োজন ছিল। রুশ-তার্কিশ যুদ্ধের (১৮৭৭-৭৮) পর অটোম্যান সাম্রাজ্য বেশ নাজুক অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধের পরপরই অটোম্যানদের হাত থেকে রোমানিয়া, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও বুলগেরিয়া হাতছাড়া হয়ে যায় এবং এগুলো স্বায়ত্তশাসন নিয়ে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে। এমন একটা কঠিন সময় যে, বলকান অঞ্চলের যতটুকু তখনও অটোম্যানদের হাতে ছিল, তাও ক্রমশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ১৮৭০ সালে রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলা করার জন্য অটোম্যানরা ব্রিটেনের সহযোগিতা নেওয়ায় সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর পরপর ১৮৭৫ সালেই অটোম্যান সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়। সে সময়ে বাজেটের বড়ো অংশই চলে যেত বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর দেনা শোধ করতে। ফলে সাম্রাজ্য এ সময়ে এসে বড়ো আকারের ধ্বসের মুখে পড়ে।

যদিও সুলতান আবদুল হামিদ তার পূর্ববর্তী শাসকদের মতোই তানজিমাত সংস্কারগুলো চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কার্যত তিনি তার সাম্রাজ্যকে নতুন একটি দিকে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তানজিমাতপন্থিরা সুলতানের ক্ষমতা কমিয়ে সংসদকে ক্ষমতাশালী করার লক্ষ্যে যে সংস্কারমূলক কার্যক্রম শুরু করেছিল, আবদুল হামিদ তা স্থগিত করেন। তিনি সুলতানের হাতে পুরোনো অনেক ক্ষমতাই ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তার শাসনামলের শুরুতে ১৮৭৬ সালে সাম্রাজ্যের উজিররা মিলে লিবারেল মানসিকতার যে সংবিধান রচনা করেন, তা ১৮৭৮ সালে এসে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। যদিও এই স্থগিত করার পেছনে রাশিয়ার সাথে তুরস্কের যুদ্ধকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মূলত যে সত্যটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয় তা হলো– ১৬শ শতকের পর এই প্রথম একজন অটোম্যান শাসক ক্ষমতায় এসেছেন, যার হাতে সত্যিকার অর্থেই কিছুটা সক্ষমতা আছে।

সুলতানের ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি আবদুল হামিদ আরেকটি উপাধিকে ফের সামনে নিয়ে আসেন, যা মানুষ অনেকটা ভুলেই গিয়েছিল; তা হলো খলিফা। সুলতান প্রথম সেলিম মিশর জয় করার পরই অটোম্যানরা খলিফা উপাধিটি পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। যদিও তারা কালেভদ্রে এই উপাধিটি ব্যবহার করতেন। কিন্তু আবদুল হামিদ এই খলিফার দায়িত্বকে আবারও প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন। কারণ, তার কাছে খুলাফায়ে রাশেদার এই উপাধি অন্যসব উপাধির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বহ ছিল। এর পেছনে বাস্তবিক কারণও ছিল। বলকান অঞ্চলের বিশাল এলাকা খ্রিষ্টানদের হাতে ছেড়ে দেওয়ায় ততদিনে অটোম্যান সাম্রাজ্য একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। অটোম্যান সাম্রাজ্যে আগে থেকে তুর্কি, আরব, আলবেনিয়ান এবং অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় তো ছিলই, সাথে যোগ হয় খ্রিষ্টান ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বের করে দেওয়া অসংখ্য মুসলিম উদ্বাস্তু। বিশেষ করে ১৮৬০ সাল থেকে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে সারকেশিয়ান সম্প্রদায়ের অগণিত মুসলিমকে হত্যা করা হয়। অবশিষ্ট যারা প্রাণে বেঁচেছিল, তারা স্রোতের মতো অটোম্যান অঞ্চলে আসতে থাকে। নানা মতের, নানা গোত্রের এই বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধিপতির 'খলিফা'র মতো একটি গ্রহণযোগ্য পরিচয় ধারণ করার প্রয়োজন ছিল।

এর পাশাপাশি ইউরোপীয় নানা দেশ তখন ভারত, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এসব অঞ্চলে থাকা বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীকেও মুক্তির আশা দেখানোর জন্য এই খলিফা নামক পরিচিতি জরুরি ছিল। আবদুল হামিদের সময়ে প্যান-ইসলামিজমকে ব্যাপকভাবে প্রচার ও বিকশিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কারণ, তিনি মনে করেছিলেন, এর মাধ্যমে ডুবন্ত অটোম্যান সাম্রাজ্যকে আবারও জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্যান-ইসলামিজমের চিন্তাধারার আলোকে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আবদুল হামিদ একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নেন, যার উদ্দেশ্য ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের ইসলামি সেই পুরোনো বৈশিষ্ট্যাবলিকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা, যেগুলোকে তানজিমাত কার্যক্রমের মাধ্যমে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। তার আমলে সারা সাম্রাজ্য জুড়ে রেললাইনের বিস্তার ঘটানো হয়, তবে এক্ষেত্রে হিজায রেলওয়েকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। হিজায রেলপথটি ইস্তাম্বুল থেকে শুরু করে মদিনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রেললাইন চালু করার উদ্দেশ্য ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের মুসলিমদের জন্য হজযাত্রাকে সহজতর করা। এই রেলপথের মাধ্যমে ইস্তাম্বুলের সাথে ইসলামের প্রথম শহর, রাসূল ﷺ-এর স্মৃতি বিজড়িত মদিনার মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কও গভীরতর হয়। এ ছাড়াও সাহসী একজন মুসলিম নেতা হিসেবে তিনি থিওডর হার্জল এবং জায়নবাদী আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করেন, যারা অটোম্যান সাম্রাজ্যের সামান্য কিছু ঋণ মওকুফের বিনিময়ে গোটা ফিলিস্তিনকেই কিনে নেওয়ার দাবি করতে দুঃসাহস দেখিয়েছিল।

আবদুল হামিদের প্যান-ইসলামিক চিন্তাধারা পূর্ববর্তী তানজিমাত আন্দোলনের ধর্মনিরপেক্ষতামুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একদিক দিয়ে মিলে যায়। তার যাবতীয় সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যকে আরও শক্তিশালী করা। উজিরসহ মন্ত্রিসভাদের এমনভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যেন প্রশাসনিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানো যায়, যাতে করে ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের সাথে অটোম্যানরা পাল্লা দিয়ে যেতে পারে। তার শাসনামলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়ে এবং দুর্নীতির মাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। পাশাপাশি, জার্মান থেকে সামরিক উপদেষ্টাদের এনে অটোম্যান সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অটোম্যান নৌবাহিনীর জন্য নতুন নতুন জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হয়। খ্রিষ্টানরা মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে যেভাবে কাজ করত তার পালটা কৌশল হিসেবে দেশজুড়ে অসংখ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল চালু করা হয়। ১৮৯৫ সালে গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে প্রায় ১০ লাখ ছাত্রছাত্রী পাবলিক স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়। ফলে সাম্রাজ্যে শিক্ষার হারও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়তে থাকে।

ইসলামিক ও সুলতানীয় বৈশিষ্ট্যকে সমুন্নত রাখার মাধ্যমে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তার সাম্রাজ্যকে আধুনিকায়ন করার ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়ার পরও তিনি লিবারেলিজম ও ধর্মনিরপেক্ষবাদের বিস্তৃতি ঠেকাতে পারেননি। ইউরোপ থেকে পড়াশোনা করে আসা নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় কখনও অটোম্যান সাম্রাজ্যকে পশ্চিমা ইউরোপের আদলে গড়ার স্বপ্ন থেকে সরে আসেনি। এরই অংশ হিসেবে ১৯০৯ সালে ইয়াং তুর্ক বা যুব তুর্কি নামক একটি প্লাটফর্ম কৌশলে দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। অটোম্যান সাম্রাজ্যে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের সহযোগিতায় এবং ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে এই গ্রুপটি আবদুল হামিদের ৩৩ বছরের শাসন এবং ইসলামি চেতনায় গড়া প্রশাসনের অবসান ঘটায়। তারা অবশ্য সালতানাতের অবসান ঘটায়নি। পরবর্তী ১৩ বছর আরও দুজন নামকাওয়াস্তে সুলতান অটোম্যান সাম্রাজ্য শাসন করে। কিন্তু তারা ছিলেন পুতুল মাত্র! তাদের হাতে কোনো ক্ষমতাই ছিল না। আবদুল হামিদের শাসনাবসানের পরপরই অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় যুব তুর্কিদের হাতে।

ভারতবর্ষ

আওরঙ্গজেবের সময় মোগল সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃত হওয়ায় একীভূত কেন্দ্রিয় কাঠামোটি যেন দুর্বল হতে শুরু করে। মোগল সাম্রাজ্যের শুরু থেকেই শাসকদের কৌশল এমন ছিল যে, তারা বিভিন্ন এলাকার স্বায়ত্তশাসিত শাসকদের উচ্ছেদ না করে বরং তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন। মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগেও এর কাঠামো এমন ছিল, সাম্রাজ্যের অধীনেই অসংখ্য রাজা ও গভর্নর কর্মরত ছিল। তারা মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিল বলে তাদের কোনোরকমের হেনস্তা করা হয়নি। কিন্তু আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর থেকেই যেন এই আনুগত্যের ধারাবাহিকতায় ভাটা পড়তে শুরু করে। এর পেছনে মূল যে কারণটি ছিল তা হলো, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকেই সাম্রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সংঘাত ও বিবাদ শুরু হয়, যা সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যের কাঠামোকে দুর্বল করে ফেলে। আওরঙ্গজেবের সন্তান আজম শাহ মাত্র ৩ মাস দায়িত্ব পালন করার পর তার সৎ ভাই বাহাদুর শাহ তাকে হত্যা করেন। বাহাদুর শাহ পরবর্তী ৫ বছর মোগল সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে সে মানের আর কোনো কার্যকর নেতা আসেনি। ইতিহাস থেকে জানা যায়, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মাত্র ১২ বছরে ৫ জন মোগল সম্রাটের হাতে ক্ষমতার পালাবদল হয়।

যেহেতু মূল কর্তৃত্ব নিয়েই অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়, তাই সেই সুযোগে স্থানীয় নেতারা নিজেদের মতো করে তাদের এলাকাগুলোকে শাসন করতে শুরু করে। যদিও তখন তারা মোগল সম্রাটের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুগত ছিলেন, কিন্তু বাস্তবতা হলো স্থানীয় বা প্রাদেশিক পর্যায়ে মোগল সম্রাটদের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এমনকি যখন মোগল সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮) প্রায় ৩০ বছর শাসন করে সাম্রাজ্যে স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করলেন, তখনও তিনি স্থানীয় নেতাদের পুরোপুরি আর বাগে আনতে পারেননি। কারণ, তত দিনে মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা বেশ জটিল অবস্থাতেই পৌঁছে গেছে।

অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ভারতবর্ষে যে সম্পদ ছিল, তা গোটা পৃথিবীর মোট সম্পদের ২৫ শতাংশ বলে ধারণা করা হয়।

যেহেতু ১৮শ শতক জুড়েই মোগল সাম্রাজ্যের ভঙ্গুর দশা অব্যাহত থাকে এবং অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাজ্যের জন্ম হয়, তাই গোটা সাম্রাজ্যেই একধরনের অস্থিরতা তখন থেকে বিদ্যমান ছিল। অনেকটা আন্দালুসের তাইফা যুগের মতো অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাজ্য তখন জন্ম নেয়। যেগুলোর কোনোটায় মুসলিমরা আবার কোনোটায় হিন্দুরা শাসন করত। প্রদেশগুলোতে বিশেষত পশতু, বাঙালি, শিখ, হিন্দু, মারাঠা এমনকি উড়ে এসে জুড়ে বসা ব্রিটিশরা পর্যন্ত আওরঙ্গজেব পরবর্তী ভারতবর্ষের ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যায়। ভারতবর্ষের উত্তরে আহমদ শাহ দুররানির নেতৃত্বে পশতুরা স্বাধীন রাজ্যের ঘোষণা দেয়। বর্তমানে এই এলাকাটাই আফগানিস্তান হিসেবে পরিচিত। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সেখানে পশতু এলাকার সাথে সাফাভি সাম্রাজ্য ও মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা এলাকাও যুক্ত হয়েছে। আকবরের মৃত্যুর পরই শিখরা মোগল শাসকদের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা পাঞ্জাব এলাকায় সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এক পর্যায়ে সেখানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, হিন্দু জোটের একসময়কার সদস্য মারাঠারা মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৮শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে মারাঠারা মধ্য ভারতবর্ষ এবং

উত্তরাঞ্চলের বড়ো একটি অংশ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। শুধু উত্তরের সেই এলাকাগুলোতেই তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, যেখানে আফগান ও সাফাভিদের আধিক্য ছিল। এর বাইরে দক্ষিণে মহীশুরেও পৃথক স্বাধীন রাজ্য জারি ছিল।

১৮ শতকে ক্ষমতার লড়াইয়ের অংশ হিসেবে ভারতবর্ষে অসংখ্য নতুন নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। আবার অনেক রাজ্য বিলুপ্তও হয়ে যায়। আর এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭ শতকের শুরু থেকে ভারতবর্ষে ব্যাবসা শুরু করেছিল। কিন্তু ১৮ শতকে এসে ভারতবর্ষের বিভক্তি-বিভাজনের সুযোগে তারা সেখানে রাজনৈতিক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। ১৭৪০-এর দশকে ডেক্কানের যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বপ্রথম সম্পৃক্ত হয়। তারা স্থানীয় রাজাদের যুদ্ধে গোলাবারুদ সরবরাহ করে এবং এর বিনিময়ে রাজাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য সুবিধা আদায় করে নেয়। ব্রিটিশ বণিকদের জন্য এ ধরনের কাজগুলো ছিল অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো। একদিকে যুদ্ধে স্থানীয় রাজাদের সহযোগিতা করে তারা ভারতবর্ষে নিজেদের অর্থনৈতিক পরিধির সম্প্রসারণ করছিল। অন্যদিকে, তারা গোটা দৃশ্যপট থেকে ফরাসি বণিকদের মোটামুটি অকার্যকর করে ফেলেছিল। ফলে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই অন্য সকল ঔপনিবেশিক শক্তিকে হটিয়ে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশরা নিজেদের একক ব্যাবসায়িক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেই সাথে ভারতের একটি বিরাট এলাকা জুড়ে তারা স্থানীয় রাজাদের পরামর্শক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায়। এমনকি রাজাদের সাথে যোগসাজশে তারা সে এলাকাগুলোতে কর আদায় করার দায়িত্বও হাতিয়ে নেয়।

১৭৫৭ সালে বঙ্গের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশরা প্রথম নিজেদের আনুকূল্যে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৮ শতকের শেষ দিকে আরও অনেকগুলো রাজ্যে ব্রিটিশরা ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয়। তারা এসব রাজ্যে নিজেদের স্বাধীন প্রশাসন, সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে এবং পৃথক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এজেন্ডা সামনে রেখে কাজ করতে শুরু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই শাসন গোটা ভারতবর্ষের জন্যই ধ্বংসাত্মক পরিণতি নিয়ে আসে; তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলিমরা। এর বেশ কিছু কারণও ছিল। প্রথমত, কোনো কোম্পানি যখন দেশের শাসনভার নেয়, তখন তারা আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সে দায়িত্ব নেয় না; বরং তারা এ দায়িত্বটি নেয় আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য। তাই ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে শাসনকাল, তা ছিল ভীষণরকম নিপীড়নমূলক। ১৮ শতকে বিশ্বের অন্য অনেক স্থানেই ইউরোপীয়রা আধিপত্য করেছিল, কিন্তু কেউই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো এতটা নিপীড়ক ছিল না।

ব্রিটিশ বণিকরা অবাধে ব্যাবসা করার সুযোগ পাওয়ায় ভারতবর্ষের স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যায়। অধিকাংশ পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাত কার্যক্রমে ব্রিটিশদের একচেটিয়া মনোপলি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি তারা কর আদায়ে ব্যাপক নিপীড়ন চালায়। বিশেষ করে মুসলিমদের প্রতি ব্রিটিশদের আক্রোশ ছিল বেশি। যেহেতু মোগল সাম্রাজ্যের আওতায় মুসলিমরা দীর্ঘ সময় ভারতবর্ষ শাসন করেছে, তাই কোনোভাবেই যেন আবার মুসলিমরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে ব্রিটিশরা সর্বোচ্চ পরিমাণ চেষ্টা করেছিল। তারা মুসলিমদের পিছিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে আসে এবং তাদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। এর ফলে মুসলিমরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়লেও হিন্দুশ্রেণি দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায়। উত্তরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোতে তুলনামূলক বেশি সম্পদ ও প্রাচুর্য ছিল। সে তুলনায় দক্ষিণের হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলো ছিল কম প্রাচুর্যময়। তাই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর ওপরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শকুন দৃষ্টি বেশি পড়েছিল।

১৯ শতকে এসে অটোম্যান সাম্রাজ্যের মতোই ভারতীয় উপমহাদেশও ব্রিটিশ নামক পশ্চিমা পরাশক্তির কাছে ধরাশায়ী হয়ে যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেলে, প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের অধিকাংশ এলাকার ওপরই প্রকৃতার্থে সার্বভৌম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়নি; বরং তারা স্থানীয় শাসকদের কর্তাসুলভ পরামর্শক এবং কর সংগ্রহের ক্ষমতা কবজা করেছিল। কিন্তু সেই বাস্তবতা পালটে যায় ১৮৫৭ সালে, যখন সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল। কেননা, তারা জানতে পেরেছিল যে, তাদের ব্যবহৃত রাইফেলের কার্তুজ কভারে শুকর ও গরুর চর্বি ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষয়টা মুসলিম ও হিন্দু উভয় জনগোষ্ঠীর সেনাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। ফলে সৈন্যদের মনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণা জন্ম নেয়। ফলশ্রুতিতে তা বিদ্রোহে গড়ায়। সেই বিদ্রোহটি কাঙ্ক্ষিত মানে সফলতা পায়নি। আর এরপরপরই ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশদের আনুষ্ঠানিক শাসনকাল শুরু হয়।

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে থাকা সব ভূসম্পত্তি ব্রিটিশ রাজ্যের মালিকানায় বাজেয়াপ্ত করে নেয়। উপমহাদেশের এই পরিণতির জন্য মুসলিমদেরই বেশি দায় দেওয়া হয়, ফলে তারা সামাজিকভাবে হেয় হতে শুরু করে। সিপাহি বিপ্লবের আগপর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের সামান্য ছিটেফোঁটা ব্রিটিশদের দয়ায় কোনো রকমে টিকে ছিল। কিন্তু সিপাহি বিপ্লবের সময় তৎকালীন মোগল শাসক দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ বিদ্রোহে গোপনে সমর্থন দিয়েছেন এই অভিযোগে মোগল সাম্রাজ্যকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। এরপর থেকে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তান জন্ম নেওয়ার আগপর্যন্ত মুসলিমরা কখনও ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনভার আর নিজেদের হাতে নিতে পারেনি।

আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

এভাবেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরব উপদ্বীপ থেকে বেশ দূরে মুসলিমদের অপর দুই বিশাল সাম্রাজ্য ইস্তাম্বুল ও দিল্লিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরপরও বেশ কিছু দিন অটোম্যান ও মোগলরা নিজেদের স্বায়ত্তশাসন জারি রেখেছিল, কিন্তু তা অনেক ক্ষুদ্র কাঠামোতে। এককালের বিশাল সাম্রাজ্য তখন অনেকগুলো ছোটো ছোটো দেশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর ইউরোপীয়দের আক্রমণ বা সাম্রাজ্যবাদ ঠেকানোর মতো কোনো শক্তিই মুসলিমদের হাতে আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে বেশ সহজেই ব্রিটিশ, ফরাসি, রুশ, নেদারল্যান্ড সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম ভূখণ্ড ও জনগণের ওপর নিজেদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা ১৬ শতক থেকেই অটোম্যানদের মাধ্যমে প্রভাবিত ছিল। বলকান, আনাতোলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে যেভাবে অটোম্যানদের প্রভাব ছিল, উত্তর আফ্রিকার অবস্থা ছিল তার তুলনায় পুরোই আলাদা। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তর আফ্রিকার স্থানীয় শাসকরা বরাবরই অটোম্যান সালতানাতের প্রতি অনুরক্ত ছিল। ১৬ শতকে স্প্যানিশরা উত্তর আফ্রিকা দখল করতে গেলে অটোম্যানরা তখন আফ্রিকার শাসকদের সামরিক সহায়তা দিয়েছিল। মূলত সে ঘটনার পর থেকেই অটোম্যানদের প্রতি উত্তর আফ্রিকার শাসকদের সমীহ তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে ভূমধ্যসাগরে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম এবং ক্রমবর্ধমান ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে নৌ-আক্রমণ ও পালটা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। একই সঙ্গে ইউরোপীয়রাও নৌপথে বেশ শক্তি অর্জন করে। ইউরোপীয়রা আগাগোড়াই উত্তর আফ্রিকানদের নেতিবাচকভাবে বিবেচনা করত। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার বন্দরনগরী আলজিয়ার্স, তিউনিস ও ত্রিপলি থেকে যে নৌ-অভিযানগুলো চালানো হতো, সেইসব নৌ-অভিযাত্রীকে ইউরোপীয়রা জলদস্যু হিসেবেই ধারণা করত। ইউরোপীয়রা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত এবং ইউরোপীয় ইতিহাস থেকেও তাই জানা যায় যে, মূলত ইউরোপীয়ানদের জাহাজে লুটপাট চালানোর জন্যই উত্তর আফ্রিকানরা এই নৌ-অভিযানগুলো পরিচালনা করত।

অন্যদিকে, মুসলিমরা মনে করত আফ্রিকার এই বিরাট এলাকায় ইসলামকে সুরক্ষা করতে গেলে এই ধরনের নৌ-অভিযানের কোনো বিকল্প নেই। এসব টানাপোড়েনের মধ্যেই ১৮ শতকে এসে গোটা পরিস্থিতিই ইউরোপের অনুকূলে চলে যায়। নৌপথে ইউরোপীয়দের শক্তি বেড়ে যায়। সেই সাথে নতুন নতুন অনেক জায়গায় ইউরোপীয়রা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করায় তারা সমরশক্তিতে উত্তর আফ্রিকার তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে যায়। ফলে, একসময় ইউরোপীয়রা উত্তর আফ্রিকায় পদার্পণ করার সাহস পায়। তারা আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে বিশেষ করে আলজিয়ার্স ও ত্রিপলিতে ব্যাপক বোমা হামলা চালায়। এমনকি ১৮০৫ সালে ইউরোপের পাশাপাশি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একইভাবে ত্রিপলিতে হামলা চালাতে শুরু করে।

নানা দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ শুরু হওয়ায় উত্তর আফ্রিকা খুব বেশি দিন টিকতে পারেনি। ১৮৩০ সালে ফরাসিরাও আলজিয়ার্স ও আশেপাশের এলাকায় আক্রমণ চালায়। ফরাসিদের হাতে অন্যান্য যেসব উপনিবেশকৃত স্থান ছিল, তার তুলনায় আলজিয়ার্স ছিল অনেক নিকটবর্তী। আলজিয়ার্স ভূমধ্যসাগরে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের মতো থাকায় ফরাসিরা আর সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেনি; বরং আলজিয়ার্সকে তারা নিজেদের একটি অংশ হিসেবেই বিবেচনা করতে শুরু করে। ফ্রান্স থেকে লাখ লাখ মানুষ আলজেরিয়াতে গমন করে। একসময় ফরাসি নাগরিকরাই আলজেরিয়ার অর্থনীতি ও সংস্কৃতির মূল ধারক হয়ে ওঠে। যারা আলজেরিয়ার ভূমিসন্তান ছিল, তারাই সেখানে পরবাসী দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়।

একইভাবে ১৮৮১ সালে তিউনিসিয়াতেও সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটিকে দখল করে নেওয়া হয়। ১৯১১ সালে ইতালি অটোম্যান শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং কালক্রমে তারা অটোম্যানদের হাত থেকে ত্রিপোলিতানিয়া, সাইরেনাইসা ও ফেজ্জান ছিনিয়ে নেয়। এসব এলাকাই তখন ইতালির সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে, উত্তর আফ্রিকার দূরবর্তী অঞ্চল লিবিয়া, মরক্কো তখনও স্বাধীনভাবে টিকে থাকলেও কালক্রমে সেখানেও স্পেন ও ফ্রান্সের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকা আর ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চল যাকে আরবরা মাগরিব বলে অভিহিত করত, সে এলাকায় ৭ম শতাব্দীতে উকবা ইবনে নাফি η-এর মাধ্যমে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, ১৯ শতকে এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। আর তারপর থেকেই ইউরোপীয়রা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নামে এখানে অনেকগুলো পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গড়ে তোলে।

মিশর তার আশপাশের অন্য সব পশ্চিমা প্রতিবেশীর তুলনায় একটু আলাদা অবস্থায় ছিল। মিশরের কৃষিজ সম্ভাবনা ভালো থাকায় ফরাসিরা মিশরের দিকে বহু আগেই নজর দিয়েছিল। এমনকি উত্তর আফ্রিকার অন্য সব এলাকার আগে মিশরের ব্যাপারেই তাদের আগ্রহ বেশি ছিল। নেপোলিয়ন ১৭৯৮ সালে মিশরে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। মিশর তখন অটোম্যানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল– মিশরের ভূমিকে ফরাসিদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া আর মিশরের মাটিতে আরেক পরাশক্তি ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করা। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। ফলে মোটের ওপর মিশরে আবার উলটো ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়ে বড়ো আকারের শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে মুহাম্মাদ আলী নামক অটোম্যানদের এক সেনাপতি মিশরে প্রবেশ করেন এবং নিজেকে মিশরের শাসক ঘোষণা করেন। যদিও তিনি অটোম্যান সালতানাতের প্রতি কিছুটা অনুগত ছিলেন, তারপরও তিনি মিশরকে পৃথক রাজবংশের নামেই শাসন করতে শুরু করেন। অটোম্যানরা তানজিমাত যুগে প্রবেশ করে ইউরোপীয় আদলে সংস্কার শুরু করার বহু আগেই তিনি মিশরকে ইউরোপের স্টাইলে ঢেলে সাজাতে শুরু করেন। তাই মিশরের ওপর সার্বিকভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুহাম্মাদ আলীর পর তার উত্তরসূরিরা এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ফলে ইউরোপীয়রা মিশরে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করেন। এরই অংশ হিসেবে ১৮৬৯ সালে ফরাসি অর্থায়নে সুয়েজ খাল খনন করা হয়।

বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি মিশরকে তাদের নিজেদের সুবিধা মতো পরিবর্তিত করার চেষ্টা করছিল। যার ফলে মিশরের জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সে ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে গোটা মিশর জুড়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৮৮০ সালে তারা মিশরের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় নিজেদের অর্থায়নে নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করার অজুহাতে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা ১৮৮২ সালে মিশরে সামরিক অভিযান শুরু করে। তারা জাতীয়তাবাদীদের দমন করে এবং আলী বংশের শাসনব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে। এরপর থেকে মিশরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দখলদারিত্ব শুরু হয়। যদিও কাগজে-কলমে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মিশর অটোম্যান সালতানাতের আওতায় পরিচালিত হচ্ছিল বলে দাবি করা হয়।

১৮৯৬ সালের ২৭ আগস্ট ব্রিটিশরা ইতিহাসের সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধে জানজিবারকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধটি মাত্র ৪০ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। মূলত একজন সুলতান জানজিবারকে ব্রিটেনের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেই সুলতানকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশরা এই যুদ্ধ শুরু করেছিল বলে জানা যায়।

ইউরোপীয় উপনিবেশ শুধু উত্তর আফ্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বহুদূরের পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলো এবং বাণিজ্যনির্ভর পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকাতেও ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। ততদিনে নিউ ওয়ার্ল্ডে (আমেরিকায়) আফ্রিকা থেকে প্রচুর পরিমাণ ক্রীতদাস পাচার করায় পশ্চিম আফ্রিকার জনসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। তাই ইউরোপীয়রা যখন সেখানে আগ্রাসন চালায়, তখন তা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য স্থানীয় জনগণের ছিল না। তাই এলাকাগুলো উনবিংশ শতকে এসে ইউরোপীয় বণিকদের ওপর অনেকবেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। আর এ এলাকাগুলো থেকেই ফরাসিরা মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। নাইজার নদীর তীরে যে মুসলিম এলাকাগুলো ছিল, তা এতদিন উত্তরের সাহারা মরুভূমি আর দক্ষিণের বনাঞ্চল দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। ইউরোপীয়রা এ ধরনের কোনো হামলা চালাতে পারে এমন কোনো ধারণা না থাকায় এখানকার মুসলিম অধিবাসীদের সে অর্থে কোনো প্রস্তুতিও ছিল না। অনেক বছর ধরে ছোটো ছোটো সংঘাত সংঘর্ষের পর ১৮৯৫ সালে পশ্চিম আফ্রিকার বড়ো অংশেই ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। একসময়কার মুসলিম সমৃদ্ধ শহর তিম্বুকতুসহ অন্য অনেক এলাকাতেই ইউরোপীয়রা প্রবেশ করে। কালক্রমে গোটা পশ্চিম আফ্রিকাতেই ইউরোপীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় মুসলিম মালি আর তার বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধ ইতিহাস ধীরে ধীরে নিছক স্মৃতিতেই পরিণত হয়ে যায়।

অন্যদিকে, ব্রিটিশরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব আফ্রিকায়। তারা যেহেতু মিশরের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ঢোকার চেষ্টায় ছিল তাই সোয়াহিলি উপকূলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া তাদের জন্য খুবই জরুরি ছিল। কিন্তু ১৮ শতক থেকেই আরবের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় এলাকার দেশ ওমান এই পূর্ব আফ্রিকার উপকূলটা নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের মূল ঘাঁটির নাম ছিল জানজিবার, যা বর্তমান সময়ে এসে তানজানিয়া নামে পরিচিত হয়েছে। এই জানজিবার থেকেই ওমানিরা গোটা উপকূলীয় বাণিজ্য পরিচালনা করত। এই সময় পর্যন্ত তখনও ভারতীয় বাণিজ্যপথগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

যাহোক, ব্রিটিশরা সামরিক অভিযান চালানোর পর ওমানকে বাধ্য হয়েই ব্রিটিশদের সাথে চুক্তিতে যেতে হয়। পরবর্তী সময়ে গোটা ১৯ শতক জুড়েই ব্রিটিশরা জানজিবার সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৫৬ সালে জানজিবারের ক্ষমতায় উত্তরাধিকার নিয়ে সমস্যা তৈরি হলে, ব্রিটিশরা সুযোগ বুঝে ওমান ও জানজিবারকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সেইসাথে ব্রিটিশরা জানজিবারে ক্রীতদাস বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে দেয়। সরকারের রাজস্ব আদায়ের বড়ো একটি উৎসই ছিল এই বাণিজ্য। তাই ক্রীতদাস বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরকার যেমন দুর্বল হয়, ঠিক তেমনি পূর্ব আফ্রিকাতে মুসলিমদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণও আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পায়। জানজিবার সরকার যখন এ ভূখণ্ডের ওপর ক্রমাগতভাবে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তখন ব্রিটিশরা আবার সেখানে ভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করে। ইউরোপীয়রা বরাবরই 'ডিভাইড এন্ড কনকুয়ের' অর্থাৎ 'বিভক্তি-বিভাজন এবং জয়' কৌশল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা এই কাজটিতে এত বেশি সফলতা পাচ্ছিল যে, একসময়ের ধনে-মানে সমৃদ্ধ পূর্ব আফ্রিকা কিছুটা সময় লাগলেও শেষমেশ ইউরোপীয়দের পায়ের কাছেই লুটিয়ে পড়ে।

মধ্য এশিয়ার মুসলিম এলাকাগুলোর দিকে চোখ পড়ে রাশিয়ার। ১৬ শতকের শুরুতেই রুশরা ভলগা অঞ্চলের তাতার মুসলিম নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো দখল করে নেয়। এরপর বেশ কয়েক বছর রুশ সিজাররা এ অঞ্চলগুলোকে শোষণ করলেও উনবিংশ শতকে তাতাররা আবার অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই তাতার সম্প্রদায়ই খ্রিষ্টান রাশিয়া আর মধ্য এশিয়ার তুর্কি নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর মধ্যকার ব্যাবসায় মধ্যস্থতা করত। যদিও মধ্য এশিয়ার তুর্কি অধ্যুষিত অঞ্চল এরই মাঝে অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। মধ্য এশিয়ায় সমরখন্দ ও বুখারাসহ মুসলিম সভ্যতার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও জ্ঞানকেন্দ্র আগে থেকেই ছিল। তারপরও মাঝখানে পারস্য থাকায় মধ্য এশিয়া আগাগোড়াই সুন্নি নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য অঞ্চলগুলো থেকে ছিল আলাদা। মধ্য এশিয়া ভৌগোলিকভাবে খুবই স্পর্শকাতর অবস্থানে– যা মূলত পারস্য পরিবেষ্টিত, দক্ষিণে ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশের হাতছানি, পূর্বে ছিল চীন আর উত্তরে রাশিয়া। তাই মধ্য এশিয়ায় থাকা তুর্কিরা কখনও রাশিয়ার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবে থাকেনি।

রুশরা এই অঞ্চলে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশি করে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়। ১৯ শতকে তারা মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু এলাকা নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এই এলাকার সাথে রাশিয়ার রেল সংযোগও এ সময়ই চালু করা হয়।

রাশিয়ানদের এভাবে অগ্রসর হতে দেখে ভারতীয় উপমহাদেশে কর্তৃত্ব করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভয় পেয়ে যায়। তারা রাশিয়ানদের মোকাবিলা করার জন্য আফগানিস্তান পর্যন্ত এগিয়ে আসে। এভাবে মুসলিম অধ্যুষিত মধ্য এশিয়াকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় দুই পরাশক্তি ব্রিটিশ ও রুশদের মধ্যে যে সংঘাত ও ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়, তাকেই ইতিহাসে 'গ্রেট গেম' হিসেবে অভিহিত করা হয়। শতাব্দীর শেষ দিকে এসে রুশরাই সফল হয় এবং তারা মধ্য এশিয়ার তুর্কি নিয়ন্ত্রিত এলাকা বিশেষত খোরাসান পর্যন্ত দখল করে নেয়। তবে পাহাড়ে ঘেরা আফগানিস্তান বরাবরই রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে সক্ষম হয়।

আর ছিল পারস্য। ব্রিটিশ বা রুশ কেউই পারস্যের ওপর নিজেদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তবে পারস্যের ওপর এই দুই পরাশক্তিই নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। ১৮ শতকে সাফাভি রাজবংশের পতনের পর পারস্য পরিচালনার দায়িত্বে আসে কাজার রাজবংশ। কাজাররেরা পুরোপুরি রাশিয়ার প্রভাবে পড়ে যায়। রাশিয়া পারস্যের সাথে এ সুযোগে বেশ কিছু চুক্তি করে, যার ফলে তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বেশ সুবিধাও পেয়ে যায়। কাজাররেরা রুশদের সাথে যে চুক্তিগুলো করে তার ধরনটা ছিল ইউরোপীয়দের সাথে অটোম্যানদের দাসত্ব চুক্তির মতোই। অন্যদিকে, ব্রিটিশরা আরব ও আফ্রিকান উপকূলে নিজেদের প্রভাব থাকার সুযোগ নিয়ে পারস্যের দক্ষিণে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। উনবিংশ শতকের শেষদিকে এসে পারস্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে যায়। কেননা, ততদিনে রাশিয়া ও ব্রিটেন দেশটির দুই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই নিজ নিজ হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে।

দুর্বল কাঠামোর সুযোগ নিয়ে মালয় অঞ্চলেও ইউরোপীয় উপনিবেশ ভালোভাবেই গেড়ে বসে। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে ব্যাবসার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে যেভাবে ক্রমান্বয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে নেয়, ঠিক একইভাবে এ এলাকাতে ডাচরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে নিজেদের ব্যাবসায়িক ঘাঁটি নির্মাণ করে। সেখান থেকেই মূলত আশেপাশের মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোতে তারা মসলার ব্যাবসা পরিচালনা করত। বাণিজ্যিক এই পরাশক্তি নিজেদের ব্যাবসায়িক ফায়দা হাসিল করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করত না। ১৬৪১ সালে ডাচরা অপর ইউরোপীয় পরাশক্তি পর্তুগিজদের মালাক্কা সমুদ্র বন্দর থেকে উচ্ছেদ করে। এর আগে ১৫১১ সাল থেকে এই বন্দরটি পর্তুগিজদেরই হাতে ছিল। ১৬২১ সালে বান্দা দ্বীপের প্রায় ১০ হাজার মানুষকে ডাচরা হত্যা করে শুধু সেখানকার শস্য ও উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীর ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্য।

একই ধরনের বর্বর কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে গোটা উনবিংশ শতক জুড়েই ডাচরা মালয় অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে। জাভা ও সুমাত্রায় স্থানীয় যে মুসলিম সালতানাত ছিল তারা অবশ্য ডাচদের এই কর্মকাণ্ডকে সহজে মেনে নেয়নি। তারা নিজেদের বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছিল। তাই ডাচরা তাদের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিমদের সব সময়ই গলার কাঁটা হিসেবেই বিবেচনা করত। কিন্তু ডাচদের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ও প্রযুক্তি থাকায় এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে মালয় এলাকার মুসলিমরা প্রত্যাশিত সমর্থন ও সহযোগিতা না পাওয়ায় সহজেই ডাচরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত টিকে থাকে।

১৬ শতকে অটোম্যানরা আচেহ প্রদেশে নাবিকদের প্রেরণ করে। এই নৌ-অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ডাচ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধরত স্থানীয় জনগণকে সাহায্য করা।

সার্বিকভাবে বলতে গেলে গোটা উনবিংশ শতক জুড়েই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিমদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামর্থ্য স্তিমিত হতে থাকে। প্রকারান্তরে এ সময়েই ইউরোপের ক্রমবর্ধমান শক্তির ওপর ভর করে ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, রাশিয়াসহ বেশ কিছু পরাশক্তির উত্থান হয়। এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, ইউরোপীয়রাও তাদের এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন, অর্থনৈতিক শক্তি এবং সামরিক সামর্থ্যের ওপর বেশি আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কারণে অনুভব করত– কেবল তারাই বিশ্বকে শাসন করার মতো যোগ্যতা রাখে। আর ইউরোপীয়রা যেখানেই যেত সেখানেই তারা চেষ্টা করত, যাতে স্থানীয় মানুষদের ইউরোপীয় ঢংয়ে পরিবর্তন করা যায়। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিকভাবে ইউরোপ নিজেদের বেশ অগ্রসর মনে করায় উপনিবেশগুলোর স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তারা মোটেও পাত্তা দিত না। তবে এত কিছুর পরও ইসলামের ইতিহাসকে তারা মুছে দিতে পারেনি; বরং ১৯ শতকে প্রাচ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে গিয়ে ইউরোপীয়দের মাঝে ভিন্ন মাত্রার এক চেতনাধারার উত্থান ঘটে। ইউরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহর থেকেই নবিজি ﷺ-এর জীবন কিংবা ইসলামের ইতিহাসের ওপর বেশ কিছু বইও এ সময় প্রকাশিত হয়।

সম্ভবত এই প্রক্রিয়াতে ইসলামের ইতিহাসের ব্যাপক প্রসার ঘটার পরই ইউরোপীয়রা এ সত্য অনুভব করে যে, ইসলামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি অনেক মজবুত। তাই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কখনও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এ উপলব্ধি থেকেই তারা মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভক্তি তৈরির প্রয়াস নেয়। মুসলিম এলাকাগুলোতে তারা নিজেদের পছন্দমতো সীমানা অঙ্কন করে এককালের ক্ষমতাধর একীভূত মুসলিম সাম্রাজ্যকে ভেঙে অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দেয়। আর পরবর্তী সময়ে তারা ধারাবাহিকভাবে এসব ক্ষুদ্র এলাকাগুলোকে নিজেদের জিম্মায় নিতে শুরু করে। তাই ১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়,

তার আগেই অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা বিদেশি আগ্রাসনের অধীনে চলে যায়। এ সময়ে মুসলিমদের মধ্যে বড়ো আকারে যে প্রশ্নগুলো দেখা দেয় তা হলো, আল্লাহ কেন ইসলামের এমন পরিণতি হতে দিলেন? ইসলামের ভবিষ্যৎ তাহলে কোন পথে যাচ্ছে? মুসলিমদের মধ্যে যারা এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন তাদের ভাষ্য হলো, ইসলামের পুনর্জাগরণের মাধ্যমেই মুসলিমদের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কেননা, ইসলামকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই ইউরোপীয়দের আগ্রাসন থামিয়ে দেওয়া যাবে এবং মুসলিম বিশ্বের সোনালি যুগ আবারও ফিরে আসবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পুরোনো ও নতুন চিন্তাধারা

ইসলামের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এর পরিণত বয়ান এবং নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামের ইতিহাসের একবারে প্রথম থেকেই পৌত্তলিক, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিধর্মীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এরপর থেকে একনিষ্ঠভাবে রাসূল γ-কে অনুসরণ করেছে। কারণ, তারা বিশ্বাস করে, রাসূল γ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত ও পরিচালিত হন। তারা আরও বিশ্বাস করে, রাসূল γ-এর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলামকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যার মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে আন্দোলিত করা সম্ভব। ইসলামের প্রথম প্রজন্মের সকলেই ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতা নিয়ে নিশ্চিত ছিল। আর সে প্রাণশক্তির জোরেই রাসূল γ-এর ওফাতের পর প্রথম ১শ বছরের মধ্যে ইসলাম সুদূর ফ্রান্স ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত তার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। যখন মুসলিমরা সামরিক অভিযানে ক্ষান্ত দিলো, তখন থেকে তারা আবার বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রায় নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছিল। ক্রুসেড এবং মোঙ্গলদের আগ্রাসন মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসকে বাধাপ্রাপ্ত করলেও তাতে ইসলামের অগ্রযাত্রা থেমে যায়নি। কারণ, এরপর পুনরায় মুসলিমদের আরও বিশালকায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক মুসলিমই মনে করে, ইসলামের ঐতিহাসিক দলিল এবং অলৌকিক ঘটনাবলিই ইসলামের বস্তুনিষ্ঠতা ও যথার্থতার বড়ো প্রমাণ।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসে যখন একে একে বিভিন্ন মুসলিম সভ্যতার পতন ঘটে এবং ইউরোপের নানা দেশ এসব অঞ্চলগুলো জয় করে নেয়, তখন থেকে শুধু রাজনৈতিক সংকটই নয়; বরং ইসলাম ধর্মের তাত্ত্বিক দিক নিয়েও নানা ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হয়। যদি মুসলিমরা সত্যি সত্যিই সঠিক ধর্ম অনুসরণ করে, তাহলে অন্য ধর্মের চর্চা করেও ইউরোপীয়রা কীভাবে মুসলিম বিশ্বকে এভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারল? গোটা ১৮ শতক থেকে ২০ শতক পর্যন্ত মুসলিম স্কলার ও চিন্তাবিদরা এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা মুসলিমদের বুঝিয়েছেন, ইসলামকে তার স্বরূপে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলে মুসলিমরা তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের সে হারানো গৌরব পুনরায় উপভোগ করতে পারবে। দীর্ঘ এই তিন শতাব্দীতে যত চিন্তাবিদই এসেছেন, তারা যেখানেই জন্ম নেন না কেন, তাদের সকলের চিন্তা ও বক্তব্য ছিল একই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। তারা সবাই দাবি করেছেন, ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার একটাই উপায়, আর তা হলো– সত্যিকারভাবে ইসলামের অনুশীলন। যদি রাসূল γ-এর রেখে যাওয়া আদর্শ এবং সাহাবিদের জীবনাচরণের আলোকে মুসলিমরা আজ ইসলামকে নিজেদের জীবনে চর্চা করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই মুসলিমদের পুনরায় সফলতা দান করবেন।

অন্যদিকে, মুসলিমদের মধ্যে এমনও চিন্তাবিদ আছে, যারা উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে না। এই চিন্তাবিদরা মূলত পশ্চিমা ভাবধারা এবং ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারায় প্রভাবিত। তাদের মতে, মুসলিমদের পশ্চিমা আদলে বিকশিত হতে হবে। যেভাবে ইউরোপীয়রা বিশ্ব জয় করেছে, মুসলিমদেরও একই কৌশলে অগ্রসর হতে হবে। এই চিন্তাবিদরা মনে করে, ইসলাম এতটা পিছিয়ে থাকার কারণ, মুসলিমরা ধর্মের ওপরই বেশি মনোযোগ দিয়েছে। নতুন নতুন চিন্তা ও দর্শনের আলোকে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ না করে, বরং প্রথাগত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে

নিয়েই পড়ে আছে। মুসলিম বিশ্বের যাবতীয় চিন্তাধারা বিগত কয়েক শতকে এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। এই দুই ধারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এমনকি শারীরিকভাবেও অনেক সময় সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। আজও পর্যন্ত মুসলিমদের চিন্তাধারাকে এই দুই ধরনের চিন্তাই প্রভাবিত করে যাচ্ছে।

পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি

পশ্চিমারা যখন মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর ক্রমাগতভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছিল, তখন এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সব মুসলিমই যে ইসলামের মূল ঐতিহ্যের কাছাকাছি ফিরে যেতে চেয়েছিল তা কিন্তু নয়; বরং অনেকেই নিজেদের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পশ্চিমা চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। উনবিংশ ও বিংশ শতকে ইউরোপে যে দর্শনগুলো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক এলাকাও ইউরোপের দেখাদেখি এই দুই দর্শনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তারা মনে করেছিল, এই দুই মতবাদ অনুসরণ করার মাধ্যমে ইউরোপের আদলে মুসলিমরা পুনরায় জেগে উঠতে পারবে।

ইউরোপে নতুন নতুন এসব চিন্তা ও দর্শনের উত্থান হওয়ায় ইউরোপের অধীনে থাকা নানা এলাকার মুসলিমদের সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। কায়রো, দামেস্ক বা বাগদাদের মতো শহরগুলো, যেখানে একসময় মুসলিমদের প্রভাবশালী অবস্থান ও সংখ্যাধিক্য ছিল, বিংশ শতকে এসে সেখানেও ইসলামের প্রথাগত চিন্তার ধারক-বাহকদের সাথে এনলাইটেনমেন্ট পরবর্তী ইউরোপের নানা চিন্তাধারার ও সংস্কৃতির সংযোগ ঘটে। এসব বড়ো বড়ো শহরগুলোতে ইউরোপের অসংখ্য পর্যটক, সরকারি কর্মকর্তা এবং খ্রিষ্টান মিশনারিরা কাজ করার সুযোগ পায়। ফলে স্থানীয় মুসলিমরা ইউরোপীয়দের কর্মতৎপরতায় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

ইউরোপীয় স্থাপত্য থেকে শুরু করে গান-বাজনা পর্যন্ত সবকিছুই তখন মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এর আগের শতাব্দীতে দ্বিতীয় মাহমুদের সময় থেকে মুসলিম দেশগুলোর সরকারি কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবেই পশ্চিমা পোশাক পরিধান করতে শুরু করেছিল। কিন্তু বিংশ শতকে এসে মুসলিমদের কথোপকথন, শব্দ চয়ন এবং সার্বিকভাবে গোটা জীবনযাপনই পশ্চিমা আদলে পরিচালিত হতে শুরু করে। পশ্চিমা সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ মুসলিম প্রভাবিত অঞ্চলগুলোতেও পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমা সিনেমা, ক্লাব এমনকি নৃত্যকেন্দ্র পর্যন্ত মুসলিম শহরগুলোতে স্থাপিত হয়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, পশ্চিমা সংস্কৃতির যে বিষয়গুলো ফ্রান্সে বা লন্ডনে দেখা যেত, ঠিক একই বিষয় কায়রো বা বৈরুতেও দেখা যেতে শুরু করে। এমনকি মুসলিমদের ঘর গৃহস্থালির জীবনযাপনও পালটে যায়। মুসলিমদের মধ্যে তারাই সম্ভ্রান্ত হিসেবে বিবেচিত হতো, যারা নিজেদের ঘরে ফ্রেঞ্চ বা ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারত। এর আগে মুসলিম সমাজে অ্যালকোহলের কথা ভাবাও যেত না। কিন্তু এই সময়ে এসে মদ ও অ্যালকোহলিক উপাদানগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

মজার ব্যাপার হলো, ইউরোপীয়রা মুসলিম ভূখণ্ডে আসায় মুসলিমদের অনেকেই ইউরোপীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিল। অথচ এত বছর এসব মুসলিম এলাকায় ইউরোপীয় নানা দেশের অসংখ্য নাগরিক থাকলেও, তারা কিন্তু ইসলামি সংস্কৃতিতে ধাতস্থ হতে পারেনি। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুসলিমদের শহরগুলো সব সময়ই নানা ধরনের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার মিলনমেলা হিসেবে কাজ করেছে। আব্বাসীয় আমলের বাগদাদ অথবা অটোম্যান আমলের ইস্তাম্বুল সব সময়ই বিভিন্ন বিচিত্র সংস্কৃতির যোগসূত্র হয়েই কাজ করেছে। কিন্তু বিংশ শতকে এসে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক বিনিময় হয়েছিল, তার ধরনটা ছিল একেবারেই ভিন্ন। দুই ভিন্ন ধারা কখনোই সমানভাবে মূল্যায়িত হয়নি; বরং নিজেদের শক্তিমত্তা ও ক্ষমতায় ভর করে পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রাচ্যের ওপর জোর করে চেপে বসার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে, মুসলিমরা ততদিনে পশ্চাৎপদতা আর অজ্ঞতার ভারে বিপর্যস্ত। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও বাস্তবতা মুসলিমদের মন ও মগজ থেকে ইসলামের সোনালি অতীতকে অনেকটাই ম্লান করে দিতে সক্ষম হয়। বরং তাদের আচরণে মনে হতো পশ্চিমাদের সংস্কৃতি অনুসরণ করাই স্বাভাবিক। কারণ, তারাই তখন বিজয়ী হিসেবে অবস্থান করছে। এমনকি মুসলিম ভূখণ্ডের রাজনীতি ও সরকার পরিচালনাতেও পশ্চিমা চিন্তাধারার ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি হয়।

মূলত শুরুতে আরব খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে ইউরোপীয় এসব চিন্তা-দর্শন মুসলিম অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করে। বিগত শতকে অটোম্যানরা ইউরোপীয়দের সাথে যে নতজানু চুক্তি করেছিল, সেই সুযোগে মুসলিম ভূখণ্ডে বসবাস করা খ্রিষ্টানরা সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিল। তা ছাড়া ইউরোপীয় বণিকশ্রেণি, মিশনারি ও কূটনীতিকরা মিলে পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক অনেক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষত লিবারেলিজম, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নানা এলাকায় আমদানি করে।

ঠিক একই সময়ে আরবেও বিশেষত বৈরুত ও কায়রোতে এক ধরনের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ঘটে, যেখানে চিন্তাবিদরা মুসলিমদের পুনরায় তাদের উমাইয়া ও আব্বাসীয় সোনালি যুগের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেন এবং তার আলোকে নতুন করে পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেন। এ সব চিন্তাবিদদের মতে, পুরোনো সেই সব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয়ে টিকে থাকার পেছনের মূল কারণ ছিল, তাদের আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি। তাই আরবে বিংশ শতকে যে জাগরণ হলো, সেখানেও বলা হলো, যদি আরবের সব মানুষকে কোনো ধর্ম পরিচয়ে

নয়, বরং আরবের পরিচয়ে লালন করা যায়, তাহলে গোটা আরবকে আবারও একত্রিত করা সম্ভব। এই আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আরবের খ্রিষ্টানরাও সম্পৃক্ত হয়। তাদের স্বার্থ ছিল ভিন্ন। তারা চেয়েছিল, আরব জাতীয়তাবাদের আড়ালে যদি ইসলামি পরিচয়টা বিলীন করে দেওয়া যায় এবং তার জায়গায় যদি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে আরব সমাজে আরব খ্রিষ্টানদের যেমন মর্যাদা বাড়বে, ঠিক তেমনি খ্রিষ্টান আর মুসলিমদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে আর কোনো ভেদরেখা থাকবে না।

১৯ শতকের শেষ দিকে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ যখন প্যান-ইসলামিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েন, তখন আরব জাতীয়তাবাদ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। খ্রিষ্টান আরবরা এতদিন স্থানীয় আরবদের আরব জাতীয়তাবাদ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলেও এবার তারা বিপদে পড়ে গেল। কারণ, খলিফা নিজেই ইসলামের আলোকে মুসলিমদের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখালে মুসলিমরা জাতীয়তাবাদের শ্লোগানের চেয়ে খিলাফতের ঘোষণার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৯০৯ সালে দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে উৎখাত করার পর অটোম্যান সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় যুব তুর্কিদের হাতে। তখন আবার নতুন করে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যেহেতু আবদুল হামিদের প্যান-ইসলামিজমকে হটিয়ে দিয়ে তুর্কি জাতীয়তাবাদের বিস্তার ঘটে। তাই অটোম্যান সাম্রাজ্যে বসবাসরত আরব ও তুর্কিদের মধ্যে মর্মান্তিকভাবে বিভাজন ঘটতে শুরু করে। এর আগে অনেকদিন থেকেই তুর্কিদের অধীনে আরবরা নানা ধরনের সংকট মোকাবিলা করছিল। যুব তুর্কিদের আকস্মিক উত্থানে আরবরা তখন আরও বেশি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। এতদিন ধরে খ্রিষ্টান আরবরা যে জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলেছিল, এবার আরবের মুসলিমরাই তুর্কিদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে সেই জাতীয়তাবাদী দর্শনকে আপন করে নেয়। অটোম্যানদের নিয়ন্ত্রিত সিরিয়া আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূতিকাগারে পরিণত হয়। দামেস্কে গোপনে অনেকগুলো জাতীয়তাবাদী ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল– আরবদের নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৯১০ সালে এই গোপন ফোরামগুলো ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলোর সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের সহযোগিতা নিয়ে অটোম্যান সাম্রাজ্যের কফিনে চূড়ান্ত পেরেক মেরে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

চিরায়ত পন্থায় ইসলামের পুনর্জাগরণ

এই সময়টিতে প্রথম যে মানুষটির কাছ থেকে ঐতিহ্যিক প্রক্রিয়ায় ইসলামের পুনর্জাগরণের কথা শোনা যায়, তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২)। আরবের একটি সাধারণ গোত্র থেকে জন্ম নিলেও তিনি ১১শ বছর আগের (সেই সময়ের হিসেবে) নবিজি γ পরবর্তী সোনালি মানুষদের মতোই জীবনযাপন করার চেষ্টা করতেন। তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর হাম্বলী মাযহাব এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর চিন্তাধারাকে লালন করতেন। ইমাম ইবনে হাম্বল ও ইবনে তাইমিয়া রহ. অন্য সবকিছুর ওপর ইসলামের মৌলিক ঐতিহ্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করতেন। যদিও ইবনে আবদুল ওয়াহাব অটোম্যান সাম্রাজ্যের স্বীকৃত সীমানার বাইরে বসবাস করতেন। তারপরও তিনি অটোম্যান সাম্রাজ্যের ধারাবাহিক পতন এবং পশ্চিমাদের উত্থান সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত ছিলেন। তার মতে, মুসলিমদের এই বিপর্যয়ের কারণ একটাই, আর তা হলো– মুসলিমরা ক্রমাগতভাবে রাসূল γ ও তাঁর সাহাবিদের জীবন-দর্শন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি সুফি, শিয়া, আধুনিকপন্থিসহ সকল ধারার মুসলিমদের সমালোচনা করেন। কারণ, তার মতে– এরা সবাই নিজেদের চিন্তাধারার আলোকে মূলধারার মুসলিমদের জীবনে নানা ধরনের অনৈসলামিক উপাদানকে আমদানি করেছে। ইবনে আবদুল ওয়াহাব ও তার অনুসারীরা দাবি করেন, অধিকাংশ মুসলিমই অবিশ্বাসের মধ্যে ডুবে আছে। আর এখান থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে মুসলিমদের সামনে একেবারে প্রাথমিক যুগের ইসলামের আদলে নিজেদের গড়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। তিনি এই অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে অন্যতম দায়িত্ব বলে বিবেচনা করতেন। তার মতে, গভীর এই সমস্যা থেকে উত্তরণ পেতে হলে প্রথম যুগের মুসলিমদেরই (সালাফ) অনুসরণ করা সব দিক থেকে উত্তম। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নতুন এই আন্দোলনটি 'সালাফি' আন্দোলন নামে পরিচিত হয়।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের অনেক অনুসারীর মধ্যে একজন ছিলেন মুহাম্মাদ বিন সৌদ। তিনিও আরবের ছোটো একটি গোত্র থেকে উঠে আসা মানুষ। ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুহাম্মাদ বিন সৌদ গোটা আরব ভূখণ্ডে ওয়াহাবি চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাদের দুজনের মধ্যকার এই সম্পর্ক তাদের মৃত্যুর পর প্রজন্মান্তরেও অব্যাহত থাকে। সৌদিতে নতুন যে রাজ্যের অবকাঠামো সূচিত হয়, সেখানে ধর্মীয় নির্দেশনা আসত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে। আর রাজনৈতিক দিকটি দেখভাল করতেন মুহাম্মাদ ইবনে সৌদের উত্তরাধিকারীরা। সালাফি আন্দোলনটি সৌদি রাজ্যের উত্থানে ব্যাপক ভূমিকা রাখলেও আরব ভূখণ্ডের বাইরে এর তেমন একটা আবেদন সৃষ্টি হয়নি।

১৯ শতকের শুরুর দিকে এই সৌদরা মক্কা ও মদিনাসহ আরব ভূখণ্ডের বড়ো অংশের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। যদিও মাত্র ২০ বছরের মাথায় মক্কা ও মদিনা থেকে সালাফিদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। তারপরও এই দুই পবিত্র ভূমি দীর্ঘদিন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় এখানে আগত বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে তারা কাজ করার সুযোগ পায়। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সালাফি দর্শনের বার্তা পৌঁছে যায়। এভাবে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব তার আন্দোলন শুরু করার পর ১শ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিক সৌদি আরবের জন্ম হয়। যদিও সালাফি দর্শনটি অনেকেই হয়তো সেভাবে মানতে পারেনি; তবে শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমেই যে

ইসলামের পুনর্জাগরণ সম্ভব, তা বিশ্বজুড়ে বহু ইসলামি চিন্তাবিদরাই বিশ্বাস করতেন এবং প্রচার করতেন। বিশেষ করে পরবর্তী সময়ে পশ্চিমাদের ব্যাপক আগ্রাসনের মুখে এ সত্যটা অনেকেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

ঠিক একই সময়ে, প্রাচ্যের দিকে অর্থাৎ ভারতবর্ষে তখন ভিন্ন এক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। আওরঙ্গজেব পরবর্তী সময়ে ভারতেও একজন প্রভাবশালী দার্শনিক আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি মানুষকে ইসলামের হারানো ঐতিহ্যের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এই মহান দার্শনিকের নাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (১৭০৩-১৭৬২)। তিনি ভারতবর্ষের মুসলিমদের মধ্যকার বিভক্তি-বিভাজন নিয়ে খুবই পেরেশান ছিলেন। এর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়গুলোর আকস্মিক উত্থান মুসলিমদের জন্য পরিস্থিতিকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তিনি শরিয়াহর সামাজিক প্রয়োগ নিয়ে কাজ করেছিলেন। তার মতে, শরিয়াহ অনুসরণ করা ছাড়া ভারতবর্ষে মুসলিমদের পতন ঠেকানোর আর কোনো সুযোগ নেই। একজন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি অনুধাবন করেছিলেন, যদি এত বেশি বিভেদ-বিভাজনের ভেতর দিয়ে মোগল সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়, তাহলে এই সাম্রাজ্য টিকবে না এবং তদস্থলে অন্য কেউ এসে জায়গা নিয়ে নেবে। তিনিও ইবনে আবদুল ওয়াহাবের মতো ইসলামের শিকড়ের চর্চার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পার্থক্য হলো, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব যেমন তার মতের বাইরের সব মুসলিমদের অবিশ্বাসী বলে মনে করতেন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ তেমনটা মনে করতেন না। তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি বলতেন, ভারতবর্ষে মুসলিমরা এমনিতেই সংখ্যালঘু। এই অল্পসংখ্যক মুসলিমরাও যদি আবার নানাভাগে বিভক্ত হয়, তাহলে এখানকার মুসলিমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; ঠিক যেমনটা ২০০ বছর আগে আন্দালুসে হয়েছিল। সেই উপলব্ধি থেকে তিনি সকল চিন্তার, সকল মতের ও পথের মুসলিমকে ইসলামের একই প্লাটফর্মের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। ফলে পরবর্তী শতকে এসে যখন মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, তখনও বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন হিসেবে ভারতবর্ষে শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারা যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থায় টিকেছিল। তার আন্দোলন থেকেই সমাজের অভিজাতদের পশ্চিমাকরণ কর্মসূচি এবং রাজনৈতিকভাবে হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগের প্রবল বিরোধিতা করা হয়।

তৎকালীন সকল মুসলিম দার্শনিকই যে পশ্চিমা চিন্তাধারাগুলোকে খারিজ করে দিয়েছিলেন তা-ও কিন্তু নয়। কেউ কেউ আবার পশ্চিমাদের সাথে সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে ফায়দা হাসিলে আগ্রহী ছিলেন। উনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত ব্রিটেনের অধীনে থাকা অবস্থায় মিশর ইসলামের সনাতন ধারা এবং পশ্চিমা চিন্তাধারার মাঝামাঝি ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। সালাহউদ্দিন আইয়ুবি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়কে সুন্নি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার পর থেকে এটি ইসলামি চিন্তা-চেতনা বিকাশের অন্যতম সূতিকাগার হিসেবে কাজ করছিল। কিন্তু ব্রিটিশ দখলদারিত্বের মুখে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিও পশ্চিমা নানা চিন্তাধারার প্রভাবে পড়ে যায়। ফলে এই প্রতিষ্ঠান থেকে মিশরের রাজনীতি ও সমাজে এমন অনেক কিছুই ছড়িয়ে পড়ে, যাতে ব্যাপক পশ্চিমা প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মুহাম্মাদ আলী ও তার পরবর্তীদের সংস্কারের কারণে পরিবর্তনের সেই পালে যেন আরও বেশি হাওয়া লাগে।

এমতাবস্থায় মিশরের একজন শিক্ষক হাসানুল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯) একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হাসানুল বান্না প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ব্রাদারহুড পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে যুক্ত হয়। মুসলিম ব্রাদারহুড মিশরের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ এবং সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান চালু করে, যার মাধ্যমে তারা সমাজের সকল স্তরে পৌঁছে যায়। তারা মানুষকে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামের আলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের আহ্বান জানায়। ব্রাদারহুড পশ্চিমাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নানান পদ্ধতিগত দিক গ্রহণ করলেও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে পুরোপুরিভাবে অগ্রাহ্য করে। বাদ্রারহুডের এই মধ্যমপন্থি অবস্থান মিশরীয় সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। পরবর্তী সময়ে আরব বিশ্বে বিশেষত মিশরে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটলে ব্রাদারহুডের ওপর প্রচণ্ড মাত্রায় নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হয়।

পার্টিশন বা বিভক্তি

ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো, মধ্যপ্রাচ্যে শেষমেশ যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয় তার জন্য কিন্তু আরব বা তুর্কি জাতীয়তাবাদীদের কেউ-ই দায়ী ছিল না; বরং ঘটনা অন্যভাবেই ঘটেছিল। ১৯১৪ সালে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দকে সারায়েভোতে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউরোপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অটোম্যান সরকার তখন তিনজন যুব তুর্কি নেতা পরিচালনা করছিলেন। তারা হলেন ইসমাইল এনভির, মুহাম্মাদ তালাত ও আহমেদ জামিল। এদের তিন পাশা হিসেবে অভিহিত করা হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই তিন পাশা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিপক্ষে এবং জার্মানির পক্ষে অবস্থান নেয়। জার্মানরা অনেকদিন থেকেই অটোম্যানদের সামরিক পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করছিল, তাই অটোম্যানরা তাদের পক্ষে অবস্থান নেওয়াটাই সমীচীন মনে করে। মিশরসহ আরও বেশ কিছু হারানো জমি পুনরুদ্ধার করে বিদেশি শক্তিদের কাছে থাকা বিপুল পরিমাণ দেনাকে কিছুটা হলেও হ্রাস করার উদ্দেশ্যে অটোম্যানরা এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

অটোম্যানদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, যা-ই ঘটুক তাতে তাদের কোনো লাভবান হওয়ার সুযোগ ছিল না। তাদের সামরিক বাহিনী ছিল অকর্মন্য, নেতৃত্বও ছিল দুর্বল। সেই সাথে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বসবাসরত নানা ধরনের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ তো ছিলই। বিশেষত তুর্কি ও আর্মেনিয়ানদের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন থাকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি জনগণের তেমন কোনো অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। তারপরও ১৯১৪ সালের অক্টোবরে যখন অটোম্যানরা যুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়, তত দিনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, যুদ্ধে জার্মানির জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পরিশেষে, নেপথ্যের নানা খেলা ও চক্রান্তের কারণে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিদ্রোহকে

নিয়ন্ত্রণ করতে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মূলত ব্রিটিশরাই এই খেলাগুলো খেলে। সব মিলিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোম্যানরা ন্যাক্কারজনকভাবে পরাজিত হয়, যার খেসারত মুসলিম বিশ্বকে আজও দিয়ে যেতে হচ্ছে।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভেতরে জাতিগত বিভেদ এবং জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত প্রভাবের ব্যাপারে ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলো ভালোভাবেই অবগত ছিল। তাই তারা অটোম্যানদের এ সংকট নিয়ে নতুনভাবে চক্রান্ত শুরু করে। ১৯১৫ সালের শুরুতে ব্রিটিশরা অটোম্যান কর্তৃক নিযুক্ত মক্কার গভর্নর শরিফ হুসাইনের সাথে যোগাযোগ করল। ব্রিটিশরা অটোম্যানদের বিরুদ্ধে নতুন করে একটি আরব বিদ্রোহ শুরু করার জন্য শরিফ হুসাইনকে প্ররোচিত করল। ব্রিটিশরা প্রতিশ্রুতি দেয়, শরিফ বিদ্রোহ করলে তারা পর্যাপ্ত সামরিক সহযোগিতা দেবে এবং আরব ভূখণ্ড নিয়ে পৃথক একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। শরিফ এই আকর্ষণীয় প্রস্তাব লুফে নেয়। কারণ, শরিফ বা হিজাযের অন্যান্য আরবরা বরাবরই তুর্কি জাতীয়তাবাদী কিংবা তুর্কি সেনাবাহিনীকে শত্রু বিবেচনা করত। যাহোক, ব্রিটিশদের কাছ থেকে ব্যাপক পরিমাণ সোনা ও অস্ত্র পেয়ে শরিফ বিদ্রোহ শুরু করল, যা ক্রমান্বয়ে গোটা আরব উপদ্বীপের পশ্চিমাংশে ছড়িয়ে পড়ল। তার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা প্রথমে মদিনা এবং তারও পরে আম্মান ও দামেস্ক অটোম্যানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। শরিফ হুসাইনের বাহিনী ব্রিটিশদের সুযোগ করে দিলো, যাতে তারা মিশরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে এবং পরবর্তীকালে জেরুসালেমের দিকেও অগ্রসর হতে পারে। ফলে ক্রুসেডের কয়েক শতাব্দী পর আবারও জেরুসালেম অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৯১০ সালে এসে দৃশ্যত আরব জাতীয়তাবাদ অটোম্যানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হয়। ফলে আরবদের মনে পৃথক ভূমি এবং আরবদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে আসার যে অভিলাষ ছিল, তা শরিফ হুসাইনের হাত দিয়েই বাস্তব রূপ লাভ করল।

কিন্তু ব্রিটিশরা প্রকৃতপক্ষে মারাত্মক একটি খেলা খেলেছিল। তারা কখনোই মুসলিমদের হাতে ক্ষমতা দিতে চায়নি। তাই একদিকে তারা যেমন শরিফ হুসাইনের সাথে চুক্তি করল, অন্যদিকে তারা গোপনে ফরাসি মিত্রদের সাথেও একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করল। তারা মূলত ফরাসিদের সহযোগিতা নিয়ে অটোম্যান পরবর্তী যুগে মধ্যপ্রাচ্যের পরিণতি নির্ধারণ করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ শরিফকে ব্রিটিশরা যে ভূখণ্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তলে তলে তারা সেই ভূখণ্ডটি ফরাসিদের সাথে মিলে ভাগ করে নেওয়ার খেলায় মত্ত ছিল। ফ্রান্সকে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল এবং খ্রিষ্টান অধ্যুষিত লেবাননের নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ব্রিটিশরা নিজেদের জন্য নেয় গোটা মেসোপটামিয়া অঞ্চল এবং ফিলিস্তিন। ফ্রান্স আর ব্রিটিশদের মধ্যে অবশেষে যে চুক্তিটি হয় তার নাম সাইকস-পিকো চুক্তি। এই চুক্তিতে শরিফ হুসাইনের জন্য আলাদা করে কিছুই বরাদ্দ ছিল না। অন্যদিকে, আরবরাও এমন কোনো শক্তির অধিকারী ছিল না যে, তারা প্রতাপশালী ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলোর থেকে জোর করে কিছু চেয়ে নিতে পারবে। তবে ইউরোপীয়দের নোংরা ও অসম চুক্তির খেলা এখানেই শেষ হয়নি।

ব্রিটিশরা আরব বিদ্রোহীদের জন্য পতাকা নকশা করে দেয়। পতাকাগুলোতে তিনটি অনুভূমিক সরু রেখা এবং বামের দিকে একটি ত্রিভুজ আঁকা ছিল। পরবর্তী সময়ে অসংখ্য জাতির পতাকার নকশার ভিত্তি হিসেবে এই নকশাটাই ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে মিশর, জর্ডান, সিরিয়া এবং ফিলিস্তিনের পতাকায় এখনও সেই নকশার প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।

১৯১৭ সালে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর তৎকালীন প্রখ্যাত ইহুদি ব্যাংকার ব্যারন রথশিল্ডের কাছে একটি চিঠি পাঠান। বেলফোর সেই চিঠিতে ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদিদের জন্য পৃথক একটি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই চিঠিটি পরবর্তী সময়ে জায়নবাদী আন্দোলনকারীদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। ১৯ শতকের শেষ দিকে এসে গোটা ইউরোপ জুড়ে ইহুদিবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে এবং সেই সূত্রে ইউরোপ থেকে অসংখ্য ইহুদি পালিয়ে নিজেদের ঠিকানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূখণ্ড ছিল ফিলিস্তিন। কারণ, ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের মাধ্যমে বহিষ্কৃত হওয়ার আগে ইহুদিরা সেখানেই ছিল। বেলফোরের ঘোষণা তাদের সেই সুপ্ত বাসনায় যেন বারুদ ঢেলে দেয়। যদিও ফিলিস্তিন যেমন আরবকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তেমনি ব্রিটিশরা নিজেদের হাতে ফিলিস্তিন রেখেও দিয়েছিল। এই টানাপোড়েনের ভেতর আবার ইহুদিদের সেখানে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়, যার ফলে পরবর্তী সময়ে ইজরাইলের জন্ম হয়। আরবরা শুরু থেকেই এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা দাবি করে, ব্রিটিশরা আগেই তাদের এই ভূখণ্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেন বিংশ শতকে এই ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে গোটা মধ্যপ্রাচ্যেই একটি অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যার জন্য আজও গোটা অঞ্চলজুড়ে অসংখ্য মানুষকে চোখের পানি ফেলতে হচ্ছে।

জাতিরাষ্ট্রের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই মুসলিমদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরিভাবে হারিয়ে যায়। যুদ্ধে অটোম্যানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। অটোম্যানদের হাতে থাকা অধিকাংশ ভূখণ্ড বিজয়ীপক্ষ হিসেবে ব্রিটিশ, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইতালি দখলে নিয়ে নেয়। আরবরা এতদিন নিজেদের পৃথক ভূমির যে স্বপ্নে বিভোর ছিল, তা চরম হতাশায় পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেড বা মোঙ্গলীয় আগ্রাসনের পর মুসলিমরা যে বাজে অবস্থায় পড়েছিল, এবার তার তুলনায় আরও বেশি বিপর্যয় নেসে আসে। সামরিকভাবে তো ইউরোপীয়রা জয়লাভ করেই, সেই সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনেও তারা মুসলিমদের বহু পেছনে ফেলে দিতে সক্ষম হয়। ইউরোপীয়রা আগেই মুসলিম সাম্রাজ্যে নানা ধরনের

সীমান্তরেখা টেনে একটা হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। কিন্তু এবার এর সাথে আরব ও তুর্কি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটায় এককালের বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য ছোটো ছোটো অনেকগুলো জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো ইউরোপ থেকে আমদানি হওয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হওয়ায় এর নেতিবাচক প্রভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। মদিনায় রাসূল γ সকল মুসলিমদের একতার কথা বলেছিলেন। জাতি, বর্ণ, গোত্রভেদে তিনি কোনো বিভাজন করেননি। এমনকি তিনি মক্কা ও মদিনার লোকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে তাদের মাঝে ঐক্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অনুসারীরাও অন্য সব পরিচয়ের চেয়ে মুসলিম পরিচয়টিই ধারণ করতে পছন্দ করতেন। এখন বিংশ শতকে এসে সেই মুসলিম বিশ্ব, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য আর মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ রাসূল γ-এর চেতনা থেকে সরে এসে নিজেদের পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে পরিচিত করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে শুরু করে।

জাতিরাষ্ট্রের উত্থানের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রভাব পড়ে অটোম্যানদের মূল কেন্দ্রস্থলে, যেখানে মূলত তুর্কিদেরই আধিপত্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ, ফরাসি, ইতালীয় ও গ্রিকরা মিলে আনাতোলিয়া দখল করে নেয়। ইস্তাম্বুলে অটোম্যান সালতানাত অক্ষত থাকলেও তা পরিণত হয় দন্তহীন বাঘে। মূলত সামরিক বাহিনীই তখন সালতানাত নিয়ন্ত্রণ করত। বিদেশি শক্তির আগ্রাসন থেকে তুরস্ককে রক্ষা করার জন্য মোস্তফা কামাল নামের এক অটোম্যান সেনা কর্মকর্তা তার সহযোদ্ধা তুর্কিদের নিয়ে বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তারা ১৯১৯-১৯২২ সময়ের মধ্যে তুরস্ক থেকে বিদেশি শক্তিকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। এটাকে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এই যুদ্ধের পরপরই মোস্তফা কামাল অটোম্যান সাম্রাজ্যের স্থলে তুরস্ক নামক নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এভাবেই উসমানের হাতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ৬২৩ বছর পর চূড়ান্তভাবে অটোম্যান সালতানাতের অবসান ঘটে। তুরস্ক নামক এই দেশটিকে মোস্তফা কামাল একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও পশ্চিমামনা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন– যেখানে তার ভাষ্যনুযায়ী বিলুপ্ত হওয়া অটোম্যান সাম্রাজ্যের কোনো দৈন্যতা, দুর্নীতির স্থান হবে না।

তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা এবং দেশটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মোস্তফা কামালকে আতাতুর্ক বা তুর্কিদের পিতা শীর্ষক উপাধি দেওয়া হয়। মোস্তফা কামালের কাছে অন্য যেকোনো পরিচয়ের তুলনায় তুর্কি পরিচয়টিই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। তার মতে, তুর্কিরা আগে থেকেই শক্তিশালী ছিল, এমনকি এই ভূখণ্ডে ইসলাম আসার আগেও তুর্কিরা শক্তিমান ছিল। বরং দশম শতকে ইসলামের আগমনের পর তুর্কি সাম্রাজ্যে আরব, পারসিয়ানসহ নানা দেশের নাগরিকরা আসার সুযোগ পায়। ফলে তুর্কিদের স্বতন্ত্র সামর্থ্য ও শক্তিমত্তা হ্রাস পায়। তাই নতুন তুরস্ককে তিনি এসব দুর্বলতা থেকে মুক্ত রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মোস্তফা কামাল ক্ষমতায় বসে প্রথমেই খিলাফত প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এর আগে ১৫২৭ সাল থেকেই তুর্কিদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব থাকলেও তিনি তা আর বহন করতে চাননি। খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে জোর করে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে ইউরোপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মোস্তফা কামাল তারপর হিজাব ও টুপি নিষিদ্ধ করেন। সুফি বিধিবিধানকে অকার্যকর করেন, শরিয়াকে বয়কট করেন এবং আরবিতে আজান নিষিদ্ধ করেন। আতাতুর্ক এটা পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়ে দেন যে, তার প্রতিষ্ঠিত তুরস্কের সাথে মুসলিম বিশ্বের কোনো ধরনের সম্পর্ক থাকবে না। তিনি ভাষার সংস্কার করেন। তুর্কি বর্ণমালা থেকে আরবি সব হরফকে বাদ দেওয়া হয়। এর আগে তুর্কিরা কয়েক শতাব্দী ধরে আরবি হরফেই লেখালিখি করত। আরবির পরিবর্তে তিনি ল্যাটিন বর্ণমালার সংযোজন করেন। এমনকি তুর্কিদের প্রচলিত শব্দভান্ডারেও তিনি পরিবর্তন সাধন করেন। তুর্কি শব্দভান্ডার থেকে সকল ধরনের আরবি ও ফারসি শব্দকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ দশকের মধ্যে কামাল আতাতুর্কের তুরস্কে শব্দ ও ভাষায় যে পরিবর্তন আনা হয়, তার মাধ্যমে তুরস্ককে সেই ভূখণ্ডের চিরায়ত ইসলামি ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। ফলে তুর্কিরা ধারাবাহিকভাবে আরবিতে বই পড়ার বা আরবি চিত্রকলাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আরব ও পারস্যের সাথে তুর্কিদের বাণিজ্য নিরুৎসাহিত করার জন্য, ব্যাবসায়িক প্রক্রিয়াকেও জটিলতর করে ফেলা হয়। মোস্তফা কামালের তুরস্কে মুসলিম, ইসলাম এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের ন্যূনতম সব সুযোগ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। শুধু ইসলামই নয়, তুরস্কের সীমানায় বসবাসরত অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী বিশেষত গ্রিক, আরব, কুর্দি ও আর্মেনিয়ানদের ওপরও বর্বরতম নিপীড়ন চালানো হয়। আতাতুর্কের খায়েশ ছিল এমন একটি দেশ গড়া, যেখানে সকল নাগরিকের একটি পরিচয়ই হবে, তা হলো– তুর্কি। তাই অন্য যেসব নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী ছিল, তাদের সব সময় হুমকি দেওয়া হতো। তারা কখনোই তুর্কিদের মতো একই ধরনের স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করার সুযোগ পেত না। তুরস্কে এই ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা পরবর্তী কয়েক দশক ধরেই অব্যাহত থাকে। বলা যায়, গোটা বিংশ শতক জুড়ে তুরস্ক এমন একটা সময় পার করেছে, যখন কেউ ইসলামকে নিয়ে জনসম্মুখে কাজ করতে গেলেই তাকে নির্মমভাবে দমন করা হতো। সেই সাথে সামরিক বাহিনীতেও বেশ অস্থিরতা দেখা যায়। বিংশ শতক জুড়ে তুর্কি সেনাবাহিনীতে বেশ কয়েকটি অভ্যুত্থানের ঘটনাও ঘটে।

আরও দক্ষিণে উর্বর ক্রিসেন্টে এতদিন আরব জনগোষ্ঠীর আধিপত্য থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তা ভেঙে অনেকগুলো রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ব্রিটিশ ও ফরাসিরা ইতোপূর্বে যে তিনটি সাংঘর্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা সাইকস-পিকো চুক্তির আওতায় গোটা অঞ্চলকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে। অটোম্যানদের হাতে এত দিন যে সিরিয়া ও মেসোটমিয়া ছিল, তা ভেঙে সেখান থেকে সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের জন্ম হয়। এগুলোর সীমানা নিয়েও কোনো যথাযথ নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়নি।

পরাশক্তিগুলো যেভাবে সীমানারেখা টেনে দিয়েছে, দেশগুলো সেভাবেই বিভক্ত হয়েছে। বেলফোর ঘোষণা অনুযায়ী ইহুদিদের ফিলিস্তিনে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। যদিও আগে থেকে সেখানে যারা বসবাস করছিল তারা ইহুদিদের এভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসাকে মোটেও গ্রহণ করেনি।

শরিফ হুসাইন ও তার উত্তরাধিকারীদের ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় সিরিয়া, জর্ডান ও ইরাকের শাসনক্ষমতা দেওয়া হয়। যদিও তারা জর্ডান ছাড়া আর কোনো অংশই বেশিদিন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। ইউরোপ নিয়ন্ত্রিত আরব ভূখণ্ড থেকে যেসব রাজনৈতিক সমস্যা ও সংকটের সূত্রপাত হয়, তা আজও বিদ্যমান রয়েছে। ইরাকের সীমানা এমনভাবে আঁকা হয়, যাতে জনসংখ্যার একভাগ হয় সুন্নি আরব, আরেক ভাগ সুন্নি কুর্দি এবং সর্বশেষ অংশটি শিয়া আরবদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। কেউই সেখানে আধিপত্য পায়নি। ইরাকের বিংশ শতকের ইতিহাস ছিল জাতিগত ও ধর্মীয় সংঘাতে নিমজ্জিত থাকার সময়। একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় লেবাননেও। সেখানেও প্রাকৃতিকভাবে কোনো সীমানা ছিল না। তাই ১৯ শতকে ফরাসিরা লেবাননকে খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দেশ বানানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছিল, তাও কখনও কার্যকর হয়নি। ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের এলাকার এই ধর্মীয় সংঘাতগুলো গোটা অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। যদিও আরব জাহানের মধ্যে বৈরুত সব সময়ই বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে এগিয়ে ছিল। তারপরও সংকটের কালো ছায়া তাকেও গ্রাস করে।

ব্রিটিশদের সৃষ্ট ভয়াবহ বিপর্যয়ের সবচেয়ে মর্মান্তিক পরিণতির নাম হলো ফিলিস্তিন। ব্রিটিশদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় গোটা ম্যান্ডেটকালীন সময়ে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে অবলীলায় বসত গড়ার সুযোগ পায়। ১৯১৮ সালে ফিলিস্তিনে যখন দুই রাষ্ট্রভিত্তিক ধারণার জন্ম দেওয়া হয়, তখন সেখানে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। ১৯৩৯ সালে ইউরোপ থেকে ইহুদিদের অভিবাসনের কারণে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৪ লাখ ৬০ হাজার। এই সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেন হঠাৎ করে আরও বাড়তে থাকে। কারণ, নাৎসীদের নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য ইহুদিরা তখন ইউরোপ থেকে পালাতে থাকে এবং নিজেদের স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের খোঁজে ফিলিস্তিনে বসত গড়ে। বিপুল সংখ্যক ইহুদিদের এই অভিবাসনকে স্বাভাবিকভাবেই ফিলিস্তিনি নাগরিক আরবরা মেনে নিতে পারেনি। ১৯৩০-এর দশকের পর থেকেই ফিলিস্তিনে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ শুরু হয়। আরবরা তখন ব্রিটিশ ও ইহুদিদেরই তাদের এক নম্বর শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। অন্যদিকে, ইহুদিদের কাছে এ সংঘাত ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা এতটাই বেড়ে যায় যে, তারা ব্রিটিশদের প্ররোচনায় ইজরাইল নামক স্বতন্ত্র ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সাহস করে ফেলে। আরবরা কয়েকটি দেশ মিলে এ উদ্যোগের বিরুদ্ধে একটি জোট করলেও তারা ইজরাইলকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়। উলটো ইজরাইলিরা দখলকৃত ভূখণ্ডের সাথে আরও কিছু ভূমি দখল করে নেয়। অপরদিকে এই যুদ্ধকে ওসিলা বানিয়ে ইজরাইল নিজেদের তথাকথিত ইহুদিরাষ্ট্র থেকে লক্ষ লক্ষ আরব নাগরিককে বিতাড়িত করে। ১৯৪৮-৪৯ অর্থাৎ মাত্র এক বছরের মধ্যে প্রায় ৭ লাখ আরব মুসলিম ও খ্রিষ্টানকে ইহুদিরা বিতাড়িত করে। যারা পরবর্তী সময়ে পার্শ্ববর্তী জর্ডান, মিশর, সিরিয়া ও লেবাননের নানা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

একটি ইহুদিরাষ্ট্র হিসেবে ইজরাইল বরাবরই তার ভৌগোলিক সীমানাকে এমনভাবে নিরূপণ করতে চেয়েছিল, যাতে নিজেদের আনুকূল্য ভালোভাবেই বজায় থাকে। আর এটা করার একমাত্র উপায় ছিল আরবদের নির্বাসনে পাঠানো। এই বিতাড়ন বা নির্বাসনে পাঠানোর ঘটনাকে নাকবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। নাকবা আরবি শব্দ, যার অর্থ ভয়াবহ বিপর্যয়। নাকবার পরই আরবদের মধ্যে কিছুটা বোধোদয় ঘটে। তারা বুঝতে পারে, অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে তাদের ভূখণ্ডে ইউরোপীয়দের আগ্রাসনই শুধু হয়নি; বরং বিষফোড়া হিসেবে একটি বিদেশি দখলদার রাষ্ট্র নিজেদের সীমানায় গেড়ে বসেছে। বিংশ শতকে ইজরাইল আর আরবের মধ্যে যে সংঘাত হয়, তাই গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য আরও আপদ নিয়ে আসে।

ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর ভারতীয় উপমহাদেশেও একাধিক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পর ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ শক্তভাবেই প্রতিষ্ঠা করে। এরপরই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সে অর্থে আর সামরিক বিদ্রোহ হয়নি। অধিকাংশ প্রতিরোধই হয় রাজনৈতিক ও অহিংস কর্মসূচির মাধ্যমে। ১৯ শতকের শেষে অল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস নামক একটি ফোরামের জন্ম হয়, যারা ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিপরীতে বড়ো একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। কংগ্রেসে হিন্দুদেরই আধিপত্য ছিল, আর মুসলিমরা ছিল সংখ্যালঘু। এ কারণেই ২০ শতকের শুরুতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন মুসলিমদের জন্য বাড়তি কিছু সংকটের সৃষ্টি করে। কারণ, তারা বুঝতে পারে, যদি ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের শাসন থেকে মুক্ত করে নতুন কোনো রাষ্ট্র গঠন করা হয় তাহলে সেটা হবে হিন্দু অধ্যুষিত। এর আগে কয়েক শতক ভারতীয় উপমহাদেশকে মুসলিমরাই শাসন করেছে। দিল্লি সালতানাতের সময় মুসলিমদেরই বেশি আনুকূল্য দেওয়া হয়েছে। কারণ, তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মুসলিমদের ওপরই অধিকতর ভরসা রাখত। কিন্তু ১৯ শতকের শেষে এসে যখন ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং ভৌগোলিক বাস্তবতাও যখন তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন মুসলিমদের ব্রিটিশ যুগ পরবর্তী ভারতবর্ষ নিয়ে বাধ্য হয়েই বিকল্প চিন্তা শুরু করতে হয়।

পাকিস্তান নামটি নির্ধারিত হয় অনেকগুলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের নামের আদ্যাক্ষর সমন্বয় করে। যেমন : পাঞ্জাব, আফগানিয়া, কাশ্মীর, সিন্ধ, বেলুচিস্তান।

অষ্টাদশ শতকে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন এবং ১৯ শতকে তদস্থলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ঘটায়, বিংশ শতকে এসে বিশ্বের অনেক স্থানে অসংখ্য স্বাধীন মুসলিম জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৫২ সালের মিশর বিপ্লব সেই দেশে ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসান ঘটায়। দেশটি ১৮৮২ সাল থেকে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হয়ে আসছিল। স্বাধীন হওয়ার পর মিশরের দায়িত্ব নেয় দেশটির সেনাবাহিনী। অপরদিকে ১৯ শতক থেকে আলজেরিয়াতে ফরাসিদের দখলদারিত্ব থাকলেও, ১৯৬২'র দিকে একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পর আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬০ সালে বেশ কয়েকটি সাব-সাহারা রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নাইজেরিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, কেনিয়া ও তানজানিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, ব্রিটিশ ও ডাচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে, ১৯৪৯ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। আরও উত্তর-পূর্ব দিকের মালয় অঞ্চলে, যেখানে এতদিন ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, সেই মালয় উপদ্বীপ এবং বর্নিও মিলে ১৯৬৩ সালে মালয়েশিয়ার জন্ম হয়। একই ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম হওয়ার পরও মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া– দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। কারণ, ব্রিটিশ ও ডাচ ঔপনিবেশিকরা এভাবেই তাদের সীমানা নির্ধারণ করে গিয়েছিল। ২০ শতকে এসে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুসলিম অঞ্চলগুলো মুক্ত হয়। কিন্তু সেই ঔপনিবেশিকদের রেখে যাওয়া সীমান্তরেখা আর ঔপনিবেশিক উপাদান থেকে আজও তারা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা

এই পর্যন্ত বিংশ শতকের যে চিত্র তুলে ধরা হলো, তা পড়ে মনে হতে পারে, এতগুলো মুসলিম রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তাহলে মুসলিমদের হাতে বোধ হয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পুনরায় ফিরে আসতে পারে। আজ পর্যন্ত ইসলামের যে চক্রাকার ইতিহাস, তাতে দেখা যায় প্রতিটি দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু শাসনের পর আবার একটি শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল। যেমন, আল আন্দালুসে খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর উত্থানের পর গোটা আইবেরিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় একাদশ ও দ্বাদশ শতকে মুরাবিতুন ও মুয়াহিদুন আন্দোলন জেগে উঠেছিল। একইভাবে ১২ শতকে ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের পর সালাহউদ্দিন আইয়ুবি পুনরায় জেরুসালেমকে মুক্ত করেন এবং তারই উত্তরাধিকারী হিসেবে মামলুকরা গোটা মিশর, সিরিয়া ও হিজায অঞ্চলে নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৩ শতকে যখন মুসলিম সাম্রাজ্যে মোঙ্গলদের আগ্রাসন হয়, তারপর পুনরায় অটোম্যান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর তিনটি বৃহৎ অঞ্চল নিয়ে মুসলিমদের তিনটি সাম্রাজ্য একই সময়ে কার্যকর থাকে। তবে বিংশ শতকে এসে ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদ যখন তার থাবা বিস্তার করতে শুরু করল, তখন তার পরিণতি আর অতীতের মতো হলো না।

ফজলুর রহমান খান নামের এক বাংলাদেশি স্থপতি শিকাগোতে সিয়ার্স টাওয়ারের নকশা করেন। ১৯৭৩ সালে যখন এই ভবনটি চালু হয়, তখন তা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু দালান।

এবার ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে মুসলিম সাম্রাজ্য আর ঘুরে দাঁড়াতে পারল না। এলোপাথাড়ি সীমান্তরেখার ওপর ভর করে বিশ্ব মানচিত্রে অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে এই অঞ্চলগুলোতে একটি অদ্ভুত ধরনের অস্থিরতা তৈরি হলো। মধ্যপ্রাচ্যে মিশর, জর্ডান, সিরিয়া এবং লেবানন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় উড়ে এসে জুড়ে বসা ইহুদিরা ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে দুবার সামরিকভাবে তাদের পরাজিত করে এবং এর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তোলে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তান আলাদা হয়ে যায় এবং বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফলে ভারতের সম্ভাব্য হুমকি প্রতিরোধে অখণ্ড হয়ে থাকার জন্য পাকিস্তান নামক যে দেশটি টিকে থাকার কথা ছিল, তা-ও আর সফলভাবে টিকে থাকতে পারল না। অন্যদিকে, পশ্চিম আফ্রিকায় অনেকগুলো দেশের জন্ম হলো, যাদের নিজেদের মধ্যে কোনো একতা নেই। এই দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ায় স্বাধীনতা পাওয়ার পরও তারা ফরাসিদের ওপরই নির্ভর করে থাকল। একতা না থাকায় স্বাধীন হওয়ার পরও মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষমতা আর তাদের হাতে থাকেনি। ছোটো ছোটো মুসলিম দেশের জন্ম এবং তাদের নিজেদের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আন্দালুসের তাইফা যুগের কথাই যেন মনে করিয়ে দেয় শুধু।

মুসলিম রাজনীতির আদর্শ স্থানান্তর হওয়ায় মুসলিমরা এভাবে রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। ইসলামের ইতিহাস জুড়ে যখনই কোনো শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তারা ইসলামকেই নিজেদের শাসনের মূল ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এমনকি যে সাম্রাজ্যের কার্যক্রম ইসলামের আদলে পরিচালিত হয়নি, সেখানেও ইসলামই গণ-একতার মূল নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। তবে বিংশ শতকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে যে রাষ্ট্রগুলোর আবির্ভাব হয়, তারা ইসলামের সোনালি অতীতের ব্যাপারে ততটা মনোযোগী ছিল না; বরং নতুন এ রাষ্ট্রগুলো ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী চেহারা লালন করতেই বেশি আগ্রহী ছিল। এ ধরনের দর্শন বা রাজনৈতিক মতবাদকে ইসলামের বিগত ১২শ বছরের ইতিহাসে (বিংশ শতকের আগপর্যন্ত) বিদেশি মতবাদ হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। কিন্তু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের কারণে এ ধরনের চিন্তাধারা মুসলিম সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। আর এ শ্রেণির মানুষেরাই দেশগুলোর স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমা চিন্তাধারার আলোকে নতুন দেশগুলোর প্রাথমিক দর্শন নির্মিত হয়। ইউরোপে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের উত্থান এবং তার পরিণতিতে ধর্মকে অবজ্ঞা করার যে প্রবণতা চালু হয়, তা পরবর্তী সময়ে সকল

মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর জলজ্যান্ত উদাহরণ হলো তুরস্ক, যেখানে শরিয়াহকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়, খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটানো হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে রাষ্ট্রের মূল দর্শন হিসেবে প্রচলন করা হয়। অন্যদিকে, মিশরের নেতৃত্বে আরবের অন্যান্য দেশগুলো সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে নিজেদের মডেল হিসেবে গ্রহণ করে। অপরদিকে শিয়া রাষ্ট্র হওয়ার পরেও পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর সাথে হাত মিলিয়ে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ইরানকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র সৌদি আরব– যেখানে পুরোপুরিভাবে রাজতন্ত্রের চর্চা করা হয়। সৌদি আরব তার শাসন কার্যক্রমের মূল ধারণাটি নেয় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সালাফি চেতনা থেকে। সব মিলিয়ে বলা যায় বিংশ শতকে এসে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো ইসলামের রাজনৈতিক চেতনাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পশ্চিমা ভাবধারার ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনকেই আপন হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

"যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ইসলামকে ভালোভাবে অনুধাবন করা। কারণ, শুধু ইসলাম দিয়েই সমাজ থেকে সব ধরনের জাতি ও গোত্রগত বৈষম্য দূর করা সম্ভব।"

– ম্যালকম এক্স

তবে বাস্তবতা হলো, মুসলিম বিশ্ব তার ইসলামি অতীত আর ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভাবিত বর্তমানের মধ্যে খাপ খাওয়াতে পারছে না। এই দুটো আঙ্গিককে একসাথে বাঁধতেও পারছে না। এখনও অনেক মুসলিম আছে, যারা সেই সোনালি দিনে ফিরে যেতে চায়, যেখানে ইসলাম ও রাজনীতি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। আবার অনেকেই ইসলামি আইন পুনরায় প্রবর্তন করতে চায়। কেউ কেউ আবার একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোতে চায়। তারা মনে করে, শিক্ষাখাতে কাজ করে কিংবা বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতরেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করে গেলে আবারও ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এসব ধারণার বাইরে আবার এমন কিছু লোক আছে, যারা মনে করে রাজনৈতিক ঘরানায় ইসলামের নামে ফিরে আসার আর কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে ইসলামের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। সে কারণে এই ধারার লোকেরা চিরায়ত ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে, পশ্চিমা জগতে তৈরি হওয়া দর্শনগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। এবং সেই সাথে পশ্চিমা এসব দর্শনের আলোকেই সরকার, সমাজ এবং রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে সুপারিশ করে।

ইসলামের ভূমিকা নিয়ে মুসলিম সমাজ আজ বহুভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। অতি সম্প্রতি আরব বসন্ত এবং তার পরবর্তী সময়ে মিশর, তিউনিশিয়া ও সিরিয়াতে যে উত্থান-পতন ঘটল, তাতে ইসলাম ও পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বন্দ্ব নতুন করে সামনে এসেছে। তুরস্কেও আবার এই টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। সেখানকার ইসলাম ভাবাপন্ন সরকার বহু দশক থেকে চলে আসা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে উলটে দেওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই টানাপোড়েন মুসলিম বিশ্বের সব জায়গাতেই কম-বেশি বিদ্যমান। কীভাবে আগামী দিনগুলোতে মুসলিমরা এগিয়ে যাবে? তারা কি ইসলামের ভিত্তিতেই এগোবে নাকি জাতীয়তাবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদগুলোর ওপর ভরসা রাখবে? নাকি তারা ইসলামের সাথে পশ্চিমা দর্শনের মধ্যে ভারসাম্য করে অগ্রসর হবে– তা সময়ই বলে দেবে। যারা এই প্রশ্নগুলোর সঠিক ও যথাযথ উত্তর দিতে পারবে, তারাই আগামী দিনে মুসলিম বিশ্বের নতুন অধ্যায় রচনা করবে। তবে ১৪শ বছর আগে যে ইসলাম পৃথিবীতে এসেছিল এবং পরবর্তী সময়ে সর্বজনীন ধর্ম ও রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে সফলতা লাভ করেছিল, সেই ইসলাম থেকে চাইলেই বর্তমান ও আগামী সময়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে না– এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

***

গ্রন্থপঞ্জি

1. Ajram, K. (1992), *The Miracle of Islamic Science,* Cedar Rapids, IA: Knolwedge House.
2. Al-Azami, Muhammad Mustafa (2003), *The History of the Quranic Text: From Revelation to Compilation,* Leicester: UK Islamic Academy.
3. Al-Hassani, Salim T.S (2012), *1001 Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization,* Washington, D.C.: National Geographic Museum.
4. Armstrong, Karen (1996), *Jerusalem: One City, Three Faiths*, New York:
5. Alfred A. Knopf (2000), *Islam: A Short History,* New York: Modern Library
6. Carr, Matthew (2009), *Blood and Faith: The Purging of Muslim Spain,* New York, NY: New Press
7. Diouf Sylviane A. (1998), *Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas,* New York: New York University Press.
8. Dirks, Jerald (2006), *Muslims in American History: A Forgotten Legacy,* Beltsville, MD: Amana Publications
9. Eaton, Richard (2000), 'Temple Desecration and Indo-Muslim States, '*Journal of Islamic Studies* 11 (3), pp. 283-319
10. El-Asjker, Ahmed Abdel-Fattah and Rodney Wilson (2006), *Islamic Economics: A Short History,* Leiden: Brill
11. Esposito, John L. (1999), *The Oxford History of Islam,* New York, NY: Oxford University Press.
12. Finkel, Caroline (2006), *Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923,* New York, NY: Basic Books
13. Freely, John (1998), *Istanbul: The Imperial City*, London: Penguin. (2009),
14. *The Grand Turk: Sultan Mehmet II- Conqueror of Constantinople, Master of an Empire,* London: I B Tauris & Co Ltd.
15. Gross, Jo-Ann (1992), *Muslims in Central Asia: Expressions of Identity and Change,* Durham, NC: Duke University Press.
16. Hamdun, Said and Noel King (1994), *Ibn Battuta in Black Africa,* Princeton, NJ: Marcus Wiener
17. Hawting G. R. (2000), *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750,* London: Routledge
18. Hodgson, Marshall G. S (1974), *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization,* Chicago, IL: University of Chicago Press.
19. Holt, P. M, Ann K. S. Lambton and Bernard Lewis (1970), *The Cambridge History of Islam,* Cambridge: Cambridge University Press.
20. Hourani, Albert (1991), *A History of the Arab Pe‡ovples,* Cambridge, MA: Belknap of Harvard University Press.
21. Inalcik, Halil (1973), *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600,* London: Phoenix Press.
22. Itzkowitz, Norman (1980), *Ottoman Empire and Islamic Tradition.* Chicago, IL: University of Chicago Press.
23. Kennedy, Hugh (1986), *The Prophet and the Age of the Caliphates; The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century,* London: Longman (1996)
24. *Muslim Spain and Portugal: A Political History of Al-Andalus,* Harlow: Pearson Education Limited (2005),
25. *When Baghdad Ruled the Muslim World: The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty,* Cambridge, MA: Da Capo Press (2008)
26. *The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live IN,* Cambridge, MA: Da Capo Press
27. Khaldun, Ibn (1969), *The Muqaddimah, an Introduction to History,* Translated from the Arabic by Franz Rosenthal and N. J. Dawood (ed.), Princeton, NJ: Princeton University Press.
28. Levzton, Nehemia and Randall L. Pouwels (2000), *The History of Islam in Africa,* Athens, OH: Ohio University Press
29. Lewis, Bernard (1984), *The Jews of Islam,* Princeton, NJ: Princeton University Press.
30. Lewis, David L. (2008), *God's Crucible: Islam and the Making of Europe, 570 to 1215,* New York, NY: W.W. Norton
31. Lindsay, James E. (2005), *Daily Life in the Medieval Islamic World,* Westport, CN: Greenwood

32. Lings, Martin (1983), *Muhammad: His life Based on the Earliest Sources,* New York, NY: Inner Traditions International
33. Maalouf, Amin (1985), *The Crusades through Arab Eyes,* New York, NY: Schocken.
34. Masood, Ehsan. *Science and Islam: A History*. London: Icon, 2009
35. Marwardi, Abul-Hasan (1996), *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*, Translated from the Arabic by Asadullah Yate, London: Ta-Ha
36. McNeill, William Hardy and Marilyn Robinson Waldman (1983), *The Islamic World,* Chicago, IL: University of Chicago Press
37. Montefiore, Simon Sebag (2011), *Jerusalem: The Biography,* New York, NY: Random House Inc.
38. Morgan, Michael Hamilton (2007), *Lost History: The Enduring Legacy of Muslim Scientists, Thinkers and Artists,* Washington, D.C.: National Geographic
39. Oshsenwald, William and Sydney Fisher (2003), *The Middle East: A History,* 6th edition, New York, NY: MCcGraw-Hill
40. Peters, F. E. (1994), *A Reader on Classical Islam*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
41. Ramadan, Tariq (2007), *In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad*, New York, NY: Oxford University Press
42. Saunders, John Joseph (1965), *A History of Medieval Islam,* London: Routledge
43. Schroeder, Eric (2002), *Muhammad's People: An Anthology of Muslim Civilization,* Mineola, NY: Dover Publications.
44. Siddiqi, Muhammad Zubair(1993), *Hadith Literature: Its Origin, Development and Special Features*, Cambridge: Islamic Texts Society.

***

১২.	অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের ভূমিকা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান
১৩.	ফ্রম এমটিভি টু মক্কা	ক্রিস্টিয়ানা বেকার অনুবাদ : রোকন উদ্দিন খান
১৪.	ইসলামে শাসনব্যবস্থার মূলনীতি	আল্লামা মুহাম্মাদ আসাদ অনুবাদ : অধ্যাপক শাহেদ আলী
১৫.	সেনাপতি	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
১৬.	এইম ফর দ্য স্টারস	তারিক রমাদান, ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
১৭.	মুসলিম ম্যানারস	শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
১৮.	খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
১৯.	ইসলামিক ম্যানারস	শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
২০.	উম্মুল মুমিনিন (অখণ্ড)	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
২১.	প্রিয় নবি প্রিয় প্রতিচ্ছবি	খুররম মুরাদ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
২২.	মানুষ : মর্যাদা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
২৩.	ইসলাম ও শিল্পকলা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান
২৪.	কারবালা ইমাম মাহদি দাজ্জাল গজওয়ায়ে হিন্দ	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
২৫.	লাভ এন্ড রেসপেক্ট দাম্পত্য সুখের অজানা রহস্য	ড. এমারসন এগারিচেস অনুবাদ : রোকন উদ্দিন খান
২৬.	হোয়াট আই বিলিভ	তারিক রমাদান অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
২৭.	ছোটদের মহানবি	মীর মশাররফ হোসেন
২৮.	মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান	ফাহমিদ-উর-রহমান
২৯.	আল্লামা ইকবাল মননে সমুজ্জ্বল	সংকলন : আবু সুফিয়ান
৩০.	দ্য ব্যালট অর দ্য বুলেট	ম্যালকম এক্সের বক্তৃতা সংকলন ও জীবনী